নববর্ষ ১৪২৬

সানন্দা



সানন্দা সূচিপত্র

নববর্ষ ১৪২৬











সূচিপত্র

নববর্ষ ১৪২৬







সূচিপত্র
নববর্ষ ১৪২৬



মডেল: তৃণা
মেক-আপ: বাবুসোনা
ফোন: ৯৯৩৩০১৪৬০৬
হেয়ারস্টাইল: গণেশ
ফোন: ৭০৪৪৭১৫৪৯৭
শাড়ি: কমলা
ফোন: ২২৮২০৭৬৩
ব্লাউজ়: অরণ্য, দক্ষিণাপণ
ফোন: ০৩৩ ২৪২৩ ৬০১১
গয়না: করিশমা, নিউ মার্কেট
ফোন: ৯০৩৮৭৪৫৭৪৮
ছবি: সোমনাথ রায়

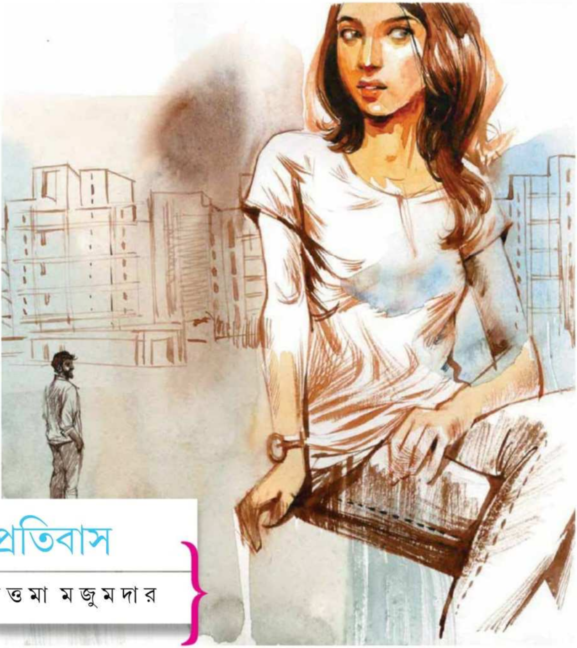
সম্পাদক: পায়েল সেনগুপ্ত

এবিপি প্রা: লিমিটেডের পক্ষে প্রদীপ্ত বিশ্বাস কর্তৃক ৬, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০০১ থেকে প্রকাশিত এবং আনন্দ অফসেট প্রা: লিমিটেড, ২১১/২০৭, উপেন ব্যানার্জি রোড, কলকাতা-৭০০ ০৬০ থেকে মুদ্রিত।

RNI NO. 44046/86

15 April 2019, Nababarsha 2019

বিমান মাশুল: আন্দামান, মণিপুর ২০.০০ টাকা



প্রতিবাস

তিলোত্তমা মজুমদার

খেজুর বাগান। খুব সুন্দর নাম। হয়তো কখনও বাগান ছিল। এখন একটি খেজুর গাছও খুঁজে পাওয়া যাবে না। নারকেল গাছ অবশ্য প্রচুর। বাগান সমেত দোতলা-তিনতলা বাড়ি যাদের, তাদের আছে আম-কাঁঠালের গাছ। মিষ্টির ভাল লাগে পাশের খোলা জমি। অনেকখানি জায়গা। আধভাঙা দোতলা বাড়িটা না থাকলে অনায়াসে মাঠ বলা যেত। তাদের পাঁচতলা বাসস্থান থেকে ওই মাঠের জন্যই অনেক দূর অবধি দেখা যায়। এমনকী সূর্যোদয়ের কিছু পরে কমলা রঙের সূর্যও।

অর্কর এক বন্ধুর মাসতুতো দাদার বন্ধুর ফ্ল্যাট আসলে। তারা ভাড়া নিয়েছে। দু'জনেই চাকরি করে, তাই এমন একটা জায়গায় থাকতে চাইছিল যেখান থেকে কলকাতায় যাওয়া-আসাটা সহজ হবে। আবার প্রয়োজন হলে অর্কর বাবা-মায়ের টালিগঞ্জের বাড়িতেও চলে যেতে পারবে। সেদিক থেকে বোড়ালের খেজুর বাগান বেশ সুবিধাজনক। অটোয় চেপে সরকারি বাসগুমটি চলে গেলে কলকাতাগামী গাড়ি প্রচুর পাওয়া যায়। আবার স্টেশন থেকে ট্রেনও ধরা যায়। কিন্তু মিষ্টি লোকাল ট্রেনে অভ্যস্ত নয়। সে তাই বাসে চেপেই অফিস যায়। কখনও ট্যাক্সিতে।

ফ্ল্যাটটা ছোট। সাড়ে পাঁচশো স্কোয়ার ফুট। শোবার ঘর। ছোট ঝুল বারান্দা। দু'টি টয়লেট। রান্নাঘর। শৌচালয়ের একটি এতই ছোট যে মিষ্টির মনে হয় তার মামা যদি এ বাড়ি আসেন, ওখানে ঢুকতেই পারবেন না। তিনি মোটা মানুষ। তাদের নতুন সংসার। জিনিসপত্রের বাহুল্য নেই। তাই স্বল্প পরিসরে অসুবিধেও নেই। মিষ্টিরা ফ্ল্যাটটা একেবারে আনকোরা পেয়েছে। পাঁচ হাজার টাকা ভাড়া। ছ'মাসের ভাড়া জমা রাখতে হয়েছে। চেনাজানার মধ্যে বলে ফ্ল্যাটের মালিক দেবদত্ত রায় কোনও আইনি চুক্তিপত্রে গেলেন না। খোশমেজাজেই অর্ককে বললেন, "আরে, তুমি একেবারে আমার ছোট ভাইয়ের বয়সি। থাকো না যদ্দিন খুশি। বিজয়গড়ের বাড়ি ছেড়ে এই পাখির খাঁচায় থাকতেই পারব না।"

"কিনলেন কেন তা হলে?"
"ভাল দাম পেলে বেচেও দিতে পারি! শোনো ভাই, একটি কথা কিন্তু রাখতেই হবে। গৃহপ্রবেশের দিন নারায়ণ পূজা করবে।"
"পুজো! আমি বা মিষ্টু পুজোর কিছুই তো জানি না। এখানে চেনাও হয়নি কিছু।"
মিষ্টু বলল, "বাড়ি যার পুজো সে করে।"
"ম্যাডাম, বাড়ি এখন আপনাদের। দয়া করে কথাটা রাখবেন। আমি অতনুদার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিচ্ছি। ওই আপনার পাশের ফ্ল্যাট। কমিটির সেক্রেটারি। লোকাল ছেলে। সবার বিপদে-আপদে আছে। আপনাকে কিচ্ছু ভাবতে হবে না।"
সত্যিই ভাবতে হল না তাদের। দেবদত্ত রায়ের সঙ্গে সস্ত্রীক অতনু এলেন আলাপ করতে। গাঁক-গাঁক করে কথা বলা অতনুর স্বভাব। যাই বলবেন, এই 'শান্তির বাড়ি' ফ্ল্যাটে সবাই শুনতে পাবেন। পরিচয়ের পাঁচ মিনিটের মধ্যে তিনি অর্কর গলা জড়িয়ে বলে উঠলেন, "কবে আসবেন শুধু বলে যান ভাই। আমার বউ স্বপ্না পূজা-পার্বণ, রান্না-বান্না, মানে মেয়েলি কাজে একেবারে পাকা!"
অর্ক শুধু হাসল। এমন গলাজড়ানো স্বভাব তার নয়। সে চোখ নিচু করে রইল পাছে অস্বস্তি ধরা পড়ে যায়! কিন্তু অন্যের আসক্ত অনাসক্ত বিষণ্ণতা অনুভব করার মানুষই অতনু নন। অর্ক যেন তাঁর কোন কালের চেনা বন্ধু, অথবা বন্ধুবৎ ক্লাবতুতো ভাই, এমন আবেগে তার গালের কাছে গাল এনে একটু স্বর নামিয়ে বললেন, "নতুন বিয়ে তো? শুনেছি। আরে আমারও নতুন বিয়ে। হা হা হা! জমে যাবে! এই ফ্লোরের তিন নম্বর ফ্ল্যাটে একজন গোলমেলে লোক থাকে। খুব সাবধান।"
অর্ক স্পষ্টতই অপ্রতিভ। এমন ভাষা, যে মানুষটিকে এখনও দেখলই না, তার সম্পর্কে এমন আপত্তিকর উক্তি তার পক্ষে মেনে নেওয়া মুশকিল। তার মুখ-কান রক্তিম হয়ে উঠল।
দেবদত্ত রায় অতনু ঘোষালের তুলনায় খানিক বেশি সতর্ক। তিনি বলে উঠলেন, "আরে ছাড়ুন না অতনুদা। কে কেমন সবাই বুঝতে পারবে। আমি বলছিলাম, আপনি আছেন, অর্কদের কোনও ব্যাপারেই ভাবতে হবে না! ঠিক বলেছি তো?"
অতনু বিনীত বিগলিত হয়ে উঠলেন। তবু সর্বজন শ্রুতিগোচর স্বরে বললেন, "আমি আর কী বলব? তুমিই তো বললে, কে কেমন সবাই বুঝতে পারবে। বুঝলে ভাই অর্ক, তোমাকে তুমিই বলছি, অনেক ছোট আমার চেয়ে, চার ভাই আমরা। এ পাড়ারই ছেলে। ভাইদের সব দাঁড় করিয়ে বিয়েটা করলাম। কেউ বলতে পারবে না অতনু ঘোষাল স্বার্থপর।রঘুপতি মার্কেটে শঙ্করী বস্ত্রালয়, সব্বাই চেনে। ওটাই আমার সব।"
অতনুর স্ত্রী স্বপ্না এতক্ষণ মিষ্টুর হাত ধরে শুধু নামটুকুই আদানপ্রদান করতে পেরেছে। এবার বেশ জোরের সঙ্গে বলল, "তোমার গল্প বলার টাইম কি পালিয়ে যাচ্ছে? ঘরে নিয়ে চলো। চা-টা খেয়ে যাক। এ কী!"
অর্ক ও মিষ্টুর আপত্তি উড়িয়ে দেওয়া হল। তারা অতনু ও স্বপ্নার ফ্ল্যাটে ঢুকল।
একই ধরনের বাসস্থান। একই আয়তন। চড়া কমলা দেওয়াল। এখানে-ওখানে বিবিধ দেবদেবীর বাঁধানো ছবি। কারও মুকুটে লাগানো অভ্র কুচি আলো পড়ে ঝিকমিক করছে। একটা ঢাউস সোফা। তার সঙ্গে দুটো একক কাউচ থাকার কথা। কিন্তু কাচ ঢাকা চৌকো টেবিলের একপাশে একটিই। আর একপাশে লাল টকটকে প্লাস্টিকের চেয়ার চারখানা। টেবিলের ফুলদানিতে নকল ফুলের ঝাড়। এক দেওয়ালে কাচের পাল্লা দেওয়া পুরনো আলমারি। তাতে শাড়ি, পাঞ্জাবি শোভমান। ভাঁজ করা পরিপাটি হলে পাঞ্জাবি কিনা বোঝা সম্ভব ছিল না। কিন্তু একটা টেনে বের করলে আর-একটা যেমন কেতরে যায়, তাকে আর ঠিকঠাক করা হয়নি বলে পাঞ্জাবির বুকের অংশ, হাঁ-মুখ ঘুমন্ত বুড়োর লোলজিহ্বার মতো হয়ে আছে। আলমারির মাথায় একখানা বিশাল টেডি ভালুক।
পাশেই একটি ফ্রিজ। তারও মাথায় নকল ফুলের ঝাড়।
দরজা-জানলায় লাল টকটকে ভেলভেট পর্দা। সিলিং ফ্যানের ব্লেডগুলোয় লাল আলো ও সোনালি ফুলের কারুকাজ। তার অল্প দূরেই ঝুলছে ঝাড়বাতি। ঘরে একটু ধুলোবালি নেই। মেঝে পরিষ্কার। মিষ্টু লক্ষ করেছে, এই ফ্ল্যাটগুলোর যে মোজেইক কর্ম, তা অতি নিম্নমানের। কিছুতেই রূপ খোলে না। বিমর্ষ প্রৌঢ়ার মতো অনুজ্জ্বল।
অতনু হৈ-হৈ করে সদলবলে সোফায় বসলেন। "আরে ফ্যানটা চালাও।" আদেশ করলেন স্ত্রীকে। ফ্যান ঘুরতে শুরু করল। আর বিজলি পাখার সেই ঘূর্ণনের সঙ্গে সঙ্গে তার লাল আলো সোনালি কারুকাজে পড়ে ঝিলিক দিল। একটু পরেই লাল হয়ে গেল নীল, নীল হয়ে গেল সবুজ। বাড়িটা যেন রং কোম্পানির বিজ্ঞাপন! মিষ্টু একটা প্লাস্টিকের চেয়ারে বসে হাঁ করে বিজলিপাখার শোভা দেখছিল। অতনু তা লক্ষ করে সোৎসাহে বলে উঠলেন, "কী, সংঘমিত্রা? ভাল এটা? পছন্দ? হা হা হা! পছন্দ হবেই। তোমাদের জন্যও এইরকম পাখা এনে দেব। ক'টা লাগবে শুধু বলো। আমার চেনা দোকান। এখানে তো সব আমার ন্যাংটো-পোঁদের বন্ধু! ফ্রিজ, টিভি, ফার্নিচার যা লাগবে সব ইন্সটলমেন্টে করে দেব।"
"থ্যাঙ্ক ইউ!"
"থ্যাঙ্ক ইউ আবার কী! দাদাকে কেউ থ্যাঙ্ক ইউ বলে? ওগো শুনছ, চা বসিয়েছ? আমি যাব নাকি? গরম গরম পকোড়া দিও কিন্তু!"
উপস্থিত সবাই পকোড়ার বিরুদ্ধে সরব হল। অর্ক বেশ জোরের সঙ্গেই বলে উঠল, "অতনুদা, এখন তো পাশেই থাকব। পরে এসে খেয়ে যাব একদিন। আজ শুধু চা।"
স্বপ্না রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে হাসিতে ফেটে পড়ল একেবারে। "পাঁচ কাপ চা, তার জন্য আবার তুমি সাহায্য করবে? রান্নাঘর যা নোংরা করবে, তা পরিষ্কার করতে আমার ডাবল পরিশ্রম।" এবার সে সরাসরি মিষ্টুর দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, "আমি জানেন তো, সংঘো ইয়ে দিদি, নোংরা একেবারে দেখতে পারি না। কাজের লোক ঘর মুছে যায়, তারপর আমি আবার মুছি। আপনার দাদা বকাবকি করে।"
অতনু বললেন, "শুচিবাই, বুঝলে, শুচিবাই।"
"তুমি চুপ করো। ব্যাটাছেলে মানুষ। তুমি কী বুঝবে?"
অতনুকে মুখঝামটা দিয়ে স্বপ্না মিষ্টুর দিকে ফিরল। হেসে বলল, "ভাবছেন বউটা ঝগড়াটি, না? ছিলাম না জানেন তো। বাপের বাড়িতে সবাই বলত স্বপ্না ঘরে আছে কি নেই বোঝা যায় না। শ্বশুরবাড়িতে এসে মুখ হয়েছে। মেয়েরা যদি শ্বশুরবাড়ি এসেও মুখচাপা হয়, বুঝলেন তো, সবাই একেবারে গমপেষাই করবে!"
অতনু বললেন, "ওঃ! কথা শুরু করলে আর থামতে পারো না। চায়ের জল তো শুকিয়ে গেল।"
"এই যাই। কথা বলার তো লোকই পাই না। ও দিদি, আপনার ওই নামটা খুব খটোমটো! ডাকনামটা বলেন না!"
"মিষ্টু।"
"বাহ্! যেমন আপনাকে মিষ্টি দেখতে, তেমনি নাম। চলেন না আমার সঙ্গে রান্নাঘরে। এই ব্যাটাছেলেদের সঙ্গে থাকলে শুধু মাংসের দাম আর রাজনীতি শুনতে হবে!"
মিষ্টু বলল, "থ্যাঙ্ক ইউ স্বপ্না। আপনাকেও খুব মিষ্টি দেখতে।"

হাসিতে উছলে উঠল স্বপ্না। অতনু ঘোষালের মুখ গর্বে চকচক করে উঠল। মিষ্টু স্বপ্নার সঙ্গে পাকশালে গেল। ছোট্ট ঘর। কিন্তু পরিপাটি গুছোনো। দেওয়ালে বাসনের স্টিলর‍্যাক। তিন তাকওয়ালা প্লাস্টিকের ধারকে আলাদা চুবড়িতে আলু-পেঁয়াজ-আদা। এরই মধ্যে পেঁয়াজ-লঙ্কা কুচিয়ে বেসনে মেখে রেখেছে স্বপ্না। গ্যাসের একদিকে চায়ের জল, অন্য দিকে ছোট কড়ায় সাদা তেল। জ্বাল বাড়িয়ে নিপুণ হাতে পেঁয়াজি ভাজতে লাগল স্বপ্না।

বড়ই ছোটখাটো মেয়েটি। গোলগাল। শ্যামলা রং। কোঁকড়ানো চুলের গোছা খোঁপা বাঁধা। কানে, গলায়, হাতে মোটা মোটা সোনার গয়না। টিয়া সবুজ আর লাল মেশানো শাড়ি পরে আছে। মিষ্টুর একেবারে বিপরীত। সে রোগা, লম্বা, ফর্সা। কাঁধ অবধি থাক থাক করে কাটা চুল। শাড়ি সে খুবই কম পড়ে। আজ জিন্সের ওপর কুর্তি পরেছে। ডান হাতে ঘড়ি। বাঁ হাতে রুপোর বালা। কানে তামার আবরণ দেওয়া ঝোলা দুল। সে সিঁদুর পরে না। স্বপ্নার কপালে লাল টিপ। লম্বা সিঁথি সিঁদুরে ঢাকা। হাতে সোনার অলঙ্কারের সঙ্গে শাঁখা, পলা, নোয়া সমস্তই। মিষ্টুর চোখে পড়ল, স্বপ্নার আলতাপরা পায়ে রুপোর নূপুর।

প্লাস্টিকের টুল এনে, তার ওপর দাঁড়িয়ে ঝুলন্ত র‍্যাক থেকে সুদৃশ্য পেয়ালা, পিরিচ, থালি নামাতে লাগল স্বপ্না। মেঝেয় দাঁড়িয়ে হাত পৌঁছয় না। এমনকী গ্যাসের চুল্লিতে হাঁড়ি চাপাতেও টুল লাগে তার। আপাতত মিষ্টু তাকে সাহায্য করল। সে বলল, "একে বেঁটে মানুষ তায় আবার এক্সপেকটেশন।"

মিষ্টু ঠিক বুঝতে পারল না। কিছু জিজ্ঞেসও করল না। সে এক ঘোরের মধ্যে আছে। সংসার পাতা যাকে বলে তাই করছে সে। দেখছে আর একজনের সংসার। সদ্য পরিচিত এই পরিবারের একেবারে রান্নাঘরে পৌঁছে তার কীরকম অবাস্তব লাগছে। সে দেখার আগেই অর্ক এই বাসস্থান ঠিক করে ফেলেছিল। তাদের তাড়াতাড়িই প্রয়োজন ছিল। দু'জনের কারও প্রতুল সময় ছিল না যে অনেক খুঁজে সেরা বেছে নেয়। বেশি খরচ করার সাধ্য নেই। নতুন চাকরি। মিষ্টুর একবছর হল, অর্কর মাত্র পাঁচ মাস।

অর্ক, অতনু ও দেবদত্তর চা-পকোড়া বসার ঘরে পৌঁছে দিল স্বপ্না। রান্নাঘর থেকে বেরলেই একফালি জায়গায় হাত ধোয়ার বেসিন, তার উল্টোদিকে একটি স্নানাগার। সেখান থেকে একেবারে কোনাকুনি শয়নকক্ষের কাছাকাছি সোফার সঙ্গে মানানসই বিশাল খাবার টেবিল। সুন্দর কাঠের কাঠামোয় কাচের পুরু আচ্ছাদন। বর্ণহীন কাচের ওপর হলুদ-সবুজ কাচের নকশা। ছ'টি গদি আঁটা চেয়ার। টেবিল-চেয়ার সমেত এতখানি জায়গা নিয়েছে যে শোবার ঘরে যাবার জন্য চিলতে ফাঁক রয়েছে।

কাচ ঢাকা টেবিলে স্বপ্না তাড়াতাড়ি সবুজ পলিথিনের চাদর পেতে দিল। সবাইকে টেবিলে এসে চা-টা খেতে হল। দেবদত্ত বললেন, "আপনার এই খাবার টেবিলটা কিন্তু দুর্দান্ত।" উৎসাহে টগবগিয়ে উঠলেন অতনু। বললেন, "আরে ভায়া, এত লোক আসে বাড়িতে, ছ'টা চেয়ারেও হয় না। মাটিতে পাত পাড়তে হয়।"

মিষ্টু ঠিক বুঝতে পারল না। কিছু জিজ্ঞেসও করল না। সে এক ঘোরের মধ্যে আছে। সংসার পাতা যাকে বলে তাই করছে সে।



"চলুন আমরা ওঘরে যাই," মিষ্টুর হাত ধরে বলল স্বপ্না। "ব্যাটাছেলেদের মধ্যে বসে আরাম করে খাওয়া যায় না!" ওঘর মানে শয়নকক্ষ। সেখানে বিশাল খাট। কাঠের কারুকাজ করা। পুরু গদি। বড় বড় বালিশ। রঙিন চাদরে ঢাকা। খাটখানাই আস্ত ঘর গিলে ফেলেছে। একফালি জায়গা যা বেঁচেছিল, তাতে বিশাল দু"খানা স্টিলের আলমারি, সেই একক কাউচ যা বসার ঘরে থাকার কথা। আর সাজের সরঞ্জাম। তারই সামনে একখানি হাতে বোনা আসন পেতে দিল স্বপ্না। দ্রুত পায়ে চা-পকোড়ার থালি এনে বলল, "বসেন। আপনার নীচে বসতে তো অসুবিধে নেই। আমার উঠতে একটু কষ্ট হয়। কিন্তু আমি সোফায়, বিছানায় খাওয়া একদম পছন্দ করি না। এঁটো পড়ে, পিঁপড়ে হয়, বুঝলেন তো!"

চটজলদি বানালেও পকোড়াটা বড়ই সুস্বাদু হয়েছে। মিষ্টু প্রাণ খুলে তারিফ করল। স্বপ্নার মুখ খুশির হাসিতে ভরে উঠল। হাসলে তাকে বড়ই ভাল লাগে। সে বলল, "নানারকম খাবার বানাতে আমি ভালবাসি বুঝলেন তো? বাপের বাড়িতে খুব বই কিনতাম। রান্নার বই। আপনার দাদা কিনে দেয় না। বলে, অনেক শিখেছ। বই মানেই জঞ্জাল। উইয়ের বাসা। কতদিন হল আপনাদের বিয়ে?"

চায়ে চুমুক দিয়ে মিষ্টু বলল, "ছ'মাস।"

"আমাদের ন'মাস হল। এরই মধ্যে প্রেগনেন্ট হয়ে গেলাম। না হানিমুন, না কিছু। হি হি হি! তিন মাস চলছে বুঝলেন তো! তিন মাস মাসিক বন্ধ, মানে চার মাসের পোয়াতি, বুঝলেন তো?"

এতক্ষণে মিষ্টু বুঝল, স্বপ্না ইজ্ এক্সপেক্টিং। শি ইজ্ প্রেগন্যান্ট! সে হেসে বলল, "কনগ্র্যাচুলেশনস! আমি কিন্তু দেখে কিছুই বুঝিনি!"

আবার হেসে গড়িয়ে পড়ল স্বপ্না। বলল, "আপনি না সত্যি! তা আপনাদের লাভ ম্যারেজের বিয়ে নাকি সম্বন্ধ করে?"

"লাভ!"

"হি হি হি! ঠিক ভেবেছি! দেখলে বোঝা যায়। আমারও তাই বুঝলেন তো! আমার তো তিন দাদা, এ হল বড়দার বন্ধু। ওই যেত আমাদের বাড়ি। সেই থেকে হয়ে গেল। আমার চেয়ে চোদ্দ বছরের বড়, বুঝলেন তো! দাদাদের ইচ্ছা ছিল না। মা বলল, ভাল ছেলে, ভাল পরিবার, স্বাস্থ্য-টাস্থ্য ঠিক আছে, বয়সটা কিছুই না। আগে তো এরকমই বিয়ে হত। আসলে বুঝলেন তো, আমারও আর ভাল্লাগছিল না। এইট অব্দি পড়েছি। আর ইচ্ছে করল না। বাড়িতে সবার আদরের। কেউ কিছু বলেনি। এদিকে বয়স তো থেমে থাকে না। আপনারা যেমন, লেখাপড়া নিয়ে ছিলেন, বয়স ভাবতে হয়নি। আমার তো সতেরো হতে না হতেই সম্বন্ধ আসে। কেউ পছন্দ করত না, বুঝলেন তো! এখানকার কোনও স্টুডিও আর বাকি নেই যেখানে গিয়ে ছবি তুলিনি। ছবি দেখে পছন্দ করে, দেখতে এসে গান্ডে-পিন্ডে খায়, তারপর যে কতরকম বায়নাক্কা। আমি যে কত কারণে বাতিল হয়েছি দিদি, কী বলব! তারপর দেখলাম এর বেশ প্রেম প্রেম ভাব। আমিও বয়স-টয়স নিয়ে আর ভাবিনি। আসলে সবই কপাল, বুঝলেন তো! বয়স কমে বিয়ে হলেই কি সুখী হয়? তা হলে আর এত ডিভোর্স হচ্ছে কেন?"

"তা তো ঠিকই।"

"আপনিও কি চাকরি করেন দিদি?"
"হ্যাঁ।"
"তা হলে তো আপনাদের রান্নার লোক লাগবে গো। দেখব নাকি?"
"অর্কর সঙ্গে একবার কথা বলে নিই।"
"লাগলে বলবেন। ঠিকে ঝি তো লাগবেই। আর রান্নার লোকও লাগবে। আমার মেজবউদির বোন, বুঝলেন তো, রাইটার না কী বিল্ডিং আছে — সেখানে চাকরি করে। সে তো বলে, চাকরি আর রান্না দুটো হয় না। কবে আসবেন আপনারা?"
"পাঁচ তারিখ। শনিবার। দেবদত্তবাবুই পঞ্জিকা ঘেঁটে দিনক্ষণ ঠিক করেছেন। পুজো করতে হবে কিনা। আমরা তো পুজোর কিছুই জানি না।"
"আমরা আছি কী করতে? আপনারা জিনিসপত্র নিয়ে এসে বসুন শুধু। আমি সব করে রাখব। জিনিস সব কোথায় এখন? শ্বশুরবাড়িতে? কোথায় আপনার শ্বশুরবাড়ি?"
"শ্বশুরবাড়ি টালিগঞ্জে। জিনিসপত্র কিছুই নেই। হস্টেলে আমার একটা স্টিল আলমারি আর বিছানা আছে। কিছু বইপত্র, ল্যাপটপ আর জামাকাপড়। অর্কও বাড়ি থেকে বইপত্র, জামাকাপড়, ল্যাপটপ এসব নিয়ে আসবে। এখন তো পুরু ম্যাট্রেস পাওয়া যায়। ওরম একটা কিনে নেব। বাসনপত্র আমার কিছু আছে। কিছু কিনতে হবে। গ্যাস, ফ্রিজ আর পানীয় জলের মেশিন এখানে এসে ব্যবস্থা করব।"
"গ্যাস নিয়ে ভাবতে হবে না। ও করে দেবে তাড়াতাড়ি। এই এলাকায় ওর লাইনবাট্টা আছে। তো আপনি হস্টেলে থাকেন? আর দাদা?"
"ও টালিগঞ্জে।"
"একসঙ্গে থাকেন না?"
"মাঝে মাঝে বাইরে চলে যাই।"
"এমন কেন দিদি?"
"সে অনেক কথা স্বপ্না। পরে তো গল্প হবেই। থ্যাঙ্কস ফর ইয়োর ডিলিশাস পকোড়া অ্যান্ড টি। খুব শীঘ্রই দেখা হচ্ছে।"
"ভালই হল দিদি, আমায় একটু একটু ইংলিশ শেখাবেন তো। ইচ্ছে আছে ছেলে হলে ইংলিশ মিডিয়ামে দেব।"
"আর মেয়ে হলে?"
"ছেলেই হবে দিদি। আমি স্বপ্ন দেখেছি। আমার স্বপ্ন মিথ্যে হয় না বলেই তো আমি স্বপ্না। এই দেখুন, আপনাকে আমার ঠাকুরই দেখানো হয়নি।"
ছোট ঝুলবারান্দার খানিকটা ঘিরে স্বপ্নার ঠাকুরঘর। সাদা পাথরের সিংহাসনে বিবিধ দেবদেবীর ফোটো!
স্বপ্না বলল, "আমি কিন্তু দীক্ষিত। আমাকে কুমারী পূজা করেছিল জানেন। তারপরই দীক্ষা হয়ে যায়। আপনার দীক্ষা হয়েছে?"
"দীক্ষা? না না!"

২

গৃহপ্রবেশজনিত নারায়ণপুজোয় সমস্ত আয়োজন করে ফেললেন অতনু ঘোষাল ও স্বপ্না। মিষ্টু আর অর্কর সামান্য জিনিস একদিনেই গোছানো হয়ে গেল। এমনকী ম্যাট্রেসও কিনে ফেলল অর্ক অতনুর সহায়তায়।
দেবদত্ত সস্ত্রীক নারায়ণ পুজোয় নিমন্ত্রিত হয়ে এলেন।
মিষ্টু স্বপ্নাকে বলল, "এত কাজ করতে আপনার কষ্ট হচ্ছে না তো স্বপ্না? দিন না আমিও কিছু করি।"
স্বপ্না যথারীতি হেসে গড়িয়ে পড়ল। বলে উঠল, "আমাকে আপনি-আজ্ঞে করবেন না তো। আমি সব দিক দিয়ে আপনার চেয়ে ছোট। বিদ্যা-বুদ্ধি, রূপ-গুণ সব দিকে। আর কাজ বলছেন? এটা কি কাজ হল? ওই তো ক'টা ফল কাটা। সিন্নি মাখাও হয়ে গিয়েছে। আমার বাপের বাড়িতে খুব পুজো-আচ্চা বুঝলেন তো? মেয়েমানুষ হয়ে জন্মেছি। রান্না আর পুজো তো শিখতেই হবে। তার ওপর আমি দীক্ষিত। আমি বরং প্রসাদ বেড়ে দিচ্ছি, আপনি সবাইকে দিয়ে দিন গিয়ে।"
তাদের খাওয়ার টেবিল এখনও কেনা হয়নি। সবাই স্বপ্নার টেবিলে বসেই প্রসাদ খেল। অতনু সিন্নি খেতে খেতে বললেন, "কী মেখেছে স্বপ্না! ওর হাতের স্বাদই আলাদা। লোকে তো জানেই না কী করে সিন্নি মাখতে হয়। নারকেল কোরা আর সুজি না দিলে জমে নাকি?"
একথা সেকথার পর দেবদত্তর স্ত্রী মালবিকা বলে উঠলেন, "এই পুচকে ফ্ল্যাটে আপনাদের কি বেশিদিন ভাল লাগবে অর্ক? কতদিন থাকবেন ভাবছেন?"
দেবদত্ত বলে উঠলেন, "দাঁড়াও এখনও তো রাত্রিবাসও করেনি।"
"না, আমরা তো রং করিয়ে দিলাম। নতুন ফ্ল্যাট।"
অতনু উদাত্ত কণ্ঠে বললেন, "যা বলতে চান খুলে বলুন বউদি। এগ্রিমেন্ট হয়নি বলে টেনশন নাকি? তো করে নিলেই হয়। দেবদত্ত নিজেই তো বলল, লাগবে না ওসব।"
"না না, আমি তো বলিনি। আসলে এখানে তো মেট্রো চালু হল বলে। আর বড় জোর এক-দেড় বছর। তখন ভাড়া অনেক বেড়ে যাবে এই অঞ্চলে।"
"কত বাড়বে? কিছু মনে করবেন না বউদি। এই ফ্ল্যাটের স্ট্যান্ডার্ড ভাড়া এখন সাড়ে তিন হাজার!"
দেবদত্ত তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, "মালা, আজ এই পুজোর মধ্যে এসব প্রসঙ্গ টানছ কেন! তোমার মাথা ঘামাবার দরকারই বা কী! প্রতি মাসে পাঁচ তারিখের মধ্যে ভাড়া পেলেই হল!"
অতনু বললেন, "আর কোনও শর্ত থাকলে বলে নাও। কল ভাঙলে কে লাগাবে! ছাত ফুঁড়ে জল পড়লে কে সারাবে। মেইনটেন্যান্স তো তুমি দিচ্ছ, ধরো এই পুজোর চাঁদার টাকা কে দেবে!"
"দেখুন বাড়ির ছোটখাটো সারাই তো নিজেদেরই করে নিতে হবে। আর চাঁদা যদি বলেন তো, এই পাড়ায় অর্কভাই-ই তো থাকবে, ওরই দেওয়া উচিত। এতদিন কেউ ছিল না বলে তুমি আমার কাছে চেয়েছ, দিয়েছি।"
"তো কথাগুলো পরিষ্কার করে নিতে হবে তো। আপাতত দু'বছর ভাড়া বাড়াবার কথাই তুলবে না। এরা ছেলেমানুষ, কিছুই জানে না। কোনও অসুবিধে হলে আমি আছি। সমস্যা বুঝে তোমায় কল দেব।"
দেবদত্ত আর মালবিকা বিদায় নিলেন। এবার অতনু পড়লেন অর্ককে নিয়ে।
"বলো, কী কী কিনবে। কাল রবিবার আমার দোকান বন্ধ। তোমাদেরও ছুটি। আমার বন্ধুর দোকানে যাব। একদম একবছরের ইন্সটলমেন্ট করিয়ে দেব। ফ্রিজ নেবে। আর, ডাইনিং টেবিল। আর? সোফাসেট। ড্রেসিং টেবিল। টিভি। কী টিভি নেবে বলো। ভাল দেখে একটা নাও। একবার কিনবে, দশবছর যাবে।"
অর্ক বলল, "ফ্রিজই শুধু নেব অতনুদা। দামও একেবারেই দিয়ে দেব। ইন্সটলমেন্ট চাই না। আর খাবার টেবিলটা, ইয়ে, আজকাল তো প্লাস্টিক টেবিল পাওয়া যায়, ওই একটা। আপনি বরং গ্যাসের জন্য কোথায় যেতে হবে বলুন। আর কিছু বাসনকোসন, তার জন্য মিষ্টুর সঙ্গে কথা বলতে হবে।"
"শুধু ফ্রিজ? আরে স্বপ্না, কী বলে দেখো, কিস্তিতে কিস্তিতে

পেয়েও নেবে না! এ'রম সুযোগ কেউ ছাড়ে? ঠিক আছে। আচ্ছা! গ্যাস আসতে কম করে দশদিন লাগবে ভাই। ততদিন খাবে কী! রান্না হবে কোথায়? আমার বাড়িতেই খেয়ে নাও। এর মধ্যে একটা রান্নার লোক-টোক দেখি!"

"অতনুদা, আপনাকে ধন্যবাদ জানাবার ভাষা নেই আমার। মিষ্টুর একটা হিটার আছে। কভারড হিটার। খুব ভাল রান্না করা যায়। ও তো বলে ইলেকট্রিকও খুব পোড়ে না।"

"আমাদের বাড়িতে কোনও অসুবিধে নেই কিন্তু। দু'জনেই কাজে যাও, তাই বলছি।"

"অসুবিধে যদি হয় কোনও দিন, খাব এখানে! আপনার লিস্টে তিনটে সিলিং ফ্যান লিখুন এবার। তিনটে একজস্ট! একদম সাধারণ ফ্যান, কেমন?"

মিষ্টু আর অর্ক কিছু ভেবে দেখার আগেই স্বপ্না ও অতনু অত্যুৎসাহে মেতে উঠলেন। একটা টিভি অন্তত কেনার জন্য বেশ জোর করছিলেন তাঁরা।

"আরে খেলা দেখতে তো টিভি লাগে। ফুটবল বিশ্বকাপ আসছে, দেখবে না?"

অর্ক বলল, "সময় নেই অতনুদা। বাড়ি ফিরেও অফিসের কাজ নিয়ে বসতে হয়। টিভি দেখার কথা ভুলেই গিয়েছি।"

"তোমরা কে কোথায় চাকরি করো ভাই?"

"মিষ্টু ক্রিসেনবিতে আছে, আমি জেকব জেরিপুলে। আমরা দু'জনেই ইলেক্ট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং করেছি।"

"এসব কী কোম্পানি? নামই শুনিনি তো।"

"ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানি। সফটওয়্যার বানায়। খুব বড় বড় ইঞ্জিনিয়ারিং প্রোজেক্ট করে। নানাবিধ কাজ! ক্রিসেনবি, মানে মিষ্টু যেখানে কাজ করে, তার হেড অফিস ওসলো, মানে নরওয়েতে। আমারটা আমেরিকায়।"

"মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি?"

"হ্যাঁ।"

"বাপরে! তোমাদের দেখলে তো বোঝাই যায় না।"

"কাউকেই কি দেখে কিছু বোঝা যায়?"

"কলেজে ফার্স্ট ইয়ারটা গিয়েছিলাম, বুঝলে। শুধু ফুটবল খেলতাম। তারপর তো ঘাড়ে দায়িত্ব পড়ল, কাপড়ের দোকান দিলাম। ইলেকট্রনিক্স-ফিক্স কিছুই বুঝি না। তোমাদের মাইনেপত্র কেমন, তা-ও জানি না।"

অতনু ও স্বপ্না আনন্দের সঙ্গেই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। দৈনন্দিন জীবন সুবিধেজনক করে তোলা সহজ নয়। পর্দা থেকে পাপোশ, শিলনোরা থেকে মিক্সি, ভিজে কাপড় শুকনোর দড়ি, ক্লিপ থেকে পিঁপড়ে ও মশা তাড়াবার ওষুধ...সমস্তই লাগে। প্রায়ই বিদ্যুৎ চলে যায়। বিকল্প সরবরাহ হিসেবে কেউ উচ্চশক্তির জেনারেটর চালায়। তার সংযোগ করা আছে ঘরে ঘরে। এই খেজুর বাগানে অতনু ঘোষালের মেজ ভাই এই ব্যবসা করেন। অতনুর নির্দেশে একদিনেই অর্কদের বিকল্প বিদ্যুতের ব্যবস্থা হয়ে গেল। স্বপ্না সংগ্রহ করল রান্নার লোক ও ঘর সাফাইয়ের সহায়িকা। মিষ্টুদের নতুন পেয়ে চড়া দাম হাঁকতে চাইছিল তারা। স্বপ্না ও অতনু কড়া হাতে তাদের শাসন করলেন।

এত কিছুর মধ্যে যে প্রসঙ্গ উত্থাপিত হবে বলে দু'জনেই প্রস্তুত ছিল, স্বপ্নাই তা সাধন করল একদিন।

মিষ্টুর ছুটি একটু অন্যরকম। রবি ও সোমবার। অর্কর ছুটি শনি-রবি। দু'জনকে একান্তে সময় কাটাতে দেওয়া উচিত ভেবে স্বপ্না রবিবার আসে না। অতনু মাঝে মাঝে চলে আসেন। পাড়ার নানান গল্প তাঁর কাছে শুনতে পাওয়া যায়। এছাড়া খেলা আর রাজনীতি তো আছেই। ভাল খেলা থাকলে অর্ককে জোর করে ধরে নিয়ে যান নিজের বাড়িতে টিভি দেখাতে। সোফা-কাউচের বিপরীত দেওয়ালে দরজার পাশে একটি বড়-সড়ো টিভি! অর্ক কখনও স্বেচ্ছায় যায়, কখনও অনিচ্ছায়। "যাব না" বললে জড়িয়ে-জাপটে টানাটানি শুরু করেন অতনু। অর্ক ও মিষ্টুর বিষয়টিই এমন যে তাদের অফিসের কাজ ছাড়াও নিরন্তর পড়াশুনো করতে হয়। বৈদ্যুতিন প্রযুক্তি ও বিজ্ঞান যেন প্রতিদিন নিত্য-নতুন আবিষ্কার ও অগ্রগতি সম্ভব করে তুলেছে। এই বিশ্বকে কোনদিকে নিয়ে চলেছে এই বিজ্ঞান, বলা সম্ভব নয়। তাই প্রতিনিয়ত জ্ঞানচর্চা না করে তাদের উপায় নেই। তা ছাড়া দু'জনেই কাজের বিষয়ে দায়িত্বশীল, উচ্চাকাঙ্ক্ষী। আত্মপ্রতিষ্ঠার এই তো সময়!

অতনু ও স্বপ্নার কাছে এই জ্ঞানচর্চা পরম বিস্ময়! তাঁদের বক্তব্য, সারাক্ষণ কম্পিউটারের সামনে বসে থাকা— নববিবাহিত দম্পতির এই কি জীবন? সাধ-আহ্লাদ বলেও তো কিছু আছে। এখনও পর্যন্ত স্বপ্না ও অতনু ছাড়া পাড়ার বা 'শান্তির বাড়ি' বাসস্থানের কারও সঙ্গে তাদের পরিচয় হয়নি। প্রয়োজনও বোধ করে না তারা। সময় কোথায়? সকাল আটটায় দু'জনে বেরিয়ে পড়ে, ফিরতে সেই রাত্রি সাড়ে আটটা বা ন'টা। মিষ্টুর অফিস ক্যামাক স্ট্রিটে। অর্ক যায় সল্টলেক পাঁচ নম্বর সেক্টরে।

সোমবারের জন্য উন্মুখ হয়ে থাকে স্বপ্না। একটি-দু'টি পদ রান্না করে বাটি হাতে দরজাঘণ্টি বাজায়। মিষ্টু দরজা খুলে দিলেই চমৎকার হাসে। বলে, "ব্যস্ত আছেন? পরে আসব?" কাজের মধ্যে থাকলেও মিষ্টু তাকে ফেরাতে পারে না। স্বপ্না একেবারে গুছিয়ে বসে। সম্পূর্ণ ভিন্ন জগতের দুই নারী একটু একটু করে ফুলের পাপড়ির মতো খুলে যাচ্ছে পরস্পরের কাছে। স্বপ্না যতই কম পড়াশনা করুক, তার সহবতশিক্ষা প্রশংসনীয়। ছোট থেকে হস্টেলে দিন কাটানো সঙ্ঘমিত্রা সরকার অনেক মেয়ে দেখেছে এ পর্যন্ত। অনেক রকম মেয়ে। কে নির্ভরযোগ্য, কে নয়, এই বোধ তার তীব্র বটে। আর স্বপ্না প্রতিবাসের অধিকার কায়েম করেছে পুরোপুরি। স্বতঃস্ফূর্তভাবেই।

তাই প্রশ্ন সে-ই করল। করতই একদিন। মিষ্টু জানে। তার লুকোবার কিছু নেই। সকলকে জানিয়ে বেড়াবারও কিছু নেই। তাদের পুরু নরম বিছানা, যা কিনা আধুনিক বাংলায় ম্যাট্রেস, তার ওপর গুছিয়ে বসে স্বপ্না। বসল। মাথায় দেবার বালিশ আর ছোট ছোট তাকিয়ার আরামপ্রদ ঠেসান আয়োজন করে রেখেছে মিষ্টু। সবেতে পরিয়েছে সুন্দর ঢাকনা। বিছানায় জয়পুরি চাদর। দরজা জানলায় কোটকি পরদা। তাদের সস্তা প্লাস্টিকের খাবার টেবিল ধবধবে সাদা চাদরে ঢাকা। তার ওপর সুদৃশ্য টেবিলম্যাট। মাঝখানে চিমনির আকারের কাচের ফুলদানিতে টাটকা ফুল। অফিস ফেরত নিয়ে আসে মিষ্টু। সারা বাড়ি ঝকঝকে, পরিপাটি। প্লাস্টিকের চেয়ারগুলোয়, ছোট ছোট টুকরো কাপড় জুড়ে হাতে বোনা গোল ঢাকনা।

স্বপ্না বলল, "আপনার বাড়িতে জিনিসপত্র প্রায় কিছুই নেই, তবু কী সুন্দর! ঘর সাজাতে খুব ভালবাসেন আপনি, না?"

মিষ্টু হাসল। সে হাসে নিঃশব্দে। প্রবল হাসি পেলে শরীর কেঁপে ওঠে, তির তির করে নাকের ডগা। স্বপ্নার মতো খিলখিল হাসি তার নেই। ঢলে পড়া হি হি হাসিও কেউ হাসতে দেখেনি তাকে। স্বপ্না বলছে, "প্রতিটি জিনিস যেন রঙে, নকশায় মানানসই। কোথা থেকে বাজার করেন গো দিদি?"

"এগুলো দক্ষিণাপণে পাওয়া যায়।"

"সবাই বলে ওখানে জিনিসের অতিরিক্ত দাম।"

"আমার তো ভালই লাগে। কতসব শিল্পসম্মত জিনিস।"

"আমি গড়িয়াহাটে যাই অবশ্য। আপনার দাদার পছন্দ না। বলে গড়িয়ার বাজার খারাপ কী! আসলে রঘুপতি বাজারে নিজের

দোকান তো। হি হি হি!"
"উনি কি শুধুই শাড়ি বিক্রি করেন?"
"আগে তাই করত। এখন কি আর শাড়ি চলে? তাই সবই রাখে। ভাল চলছে না, বুঝলেন তো? অনেক কম্পিটিশন দোকান। সে অনেক কথা। বলব একদিন। সময় করেন, দোকানেও নিয়ে যাব।"
"হ্যাঁ। যাব। অতনুদাও বলছিলেন।"
"আচ্ছা দিদি, আপনার বিয়ের জিনিসপত্র সব কোথায়?"
"বিয়ের জিনিস নেই।"
"দাদা কিছু নেননি?"
"না।"
"কী ভাল, না? আমার বিয়েতে যা খরচ হয়েছে! বাড়িতে যা যা



অতনু ও স্বপ্নার কাছে এই জ্ঞানচর্চা পরম বিস্ময়! তাঁদের বক্তব্য, সারাক্ষণ কম্পিউটারের সামনে বসে থাকা— নববিবাহিত দম্পতির এই কি জীবন?

দেখেছেন, সব তো আমার বাপের বাড়ির দেওয়া। নামেই প্রেমের বিয়ে, বুঝলেন তো? কী আর বলব ঘরের কথা। দু'লক্ষ টাকা নগদ নিয়েছে, বুঝলেন তো? আমার বাপের বাড়ির অবস্থা এদের চেয়ে অনেক ভাল আসলে। বরযাত্রী এসেছিল ক'জন জানেন? আড়াইশো। সে আর কী বলব! এদের দেশের বাড়ি মজিলপুরের দিকে। সব এক্কেবারে গাঁইয়া। ফটোকে বলে ফটক! হি হি হি! পোলাওকে বলে পোলোয়া। ও দিদি, আপনাদের বিয়ের অ্যালবাম দেখান না। আপনাকে নিশ্চয়ই খুব সুন্দর লাগছিল। দাদাও তো সুন্দর মানুষ।"
"আমাদের শুধু রেজিস্ট্রেশন হয়েছে স্বপ্না। কোনও আচার-অনুষ্ঠান হয়নি।"
"ওমা! তাই! কেন গো দিদি?"
"অর্কর বাড়িতে আমাকে গ্রহণ করেনি।"
"ওমা! কেন? আপনি এত সুন্দর, এত শিক্ষিত, এত ভাল চাকরি করেন! আপনার দাদা বলছিল, খুব কম মেয়েই আপনার জায়গায় পৌঁছতে পারে।"
"না না। তা কেন? আসলে কী জানো স্বপ্না, প্রত্যেক পরিবারের নিজস্ব চাহিদা থাকে। আমি দাস, ওরা চট্টোপাধ্যায়। অর্কর ঠাকুমা খুবই রক্ষণশীল। ওদের বাড়িতে নারায়ণশিলা আছে। গোবিন্দর নিত্যভোগ হয়। সেখানে অব্রাহ্মণ প্রবেশ পায় না"
"আর আপনার বাপের বাড়ি?"
"আমার বয়স যখন ছয়, আমার মা ক্যান্সারে মারা যান। বাবা আমাকে মামার বাড়িতে রেখে এসেছিলেন। ঠিক একবছর পর, মায়ের মৃত্যুদিনে বাবা আত্মহত্যা করেছিলেন। তারিখটা ছিল একুশে মার্চ।"
"ইশশশ! আহা রে! কী পোড়াকপাল! আপনার শ্বশুরবাড়ি কোথায় আপনাকে বুকে করে রাখবে, তা না, ছিঃ ছিঃ! লোকে মুখেই বলে জাত-পাত উঠে গিয়েছে। আসলে সব আছে। বুঝলেন তো! আপনি কি মামার বাড়িতেই মানুষ দিদি? কোথায় বাড়ি?"
"আমার মামার বাড়ি জলপাইগুড়িতে। মামা ডাক্তার। বাবা-মা দু"জনেই আলিপুরদুয়ার কলেজে পড়াতেন। বছর তিনেকে মামার বাড়িতে ছিলাম। তারপর মামা আমায় হস্টেলে দিলেন। জলপাইগুড়ি গভর্নমেন্ট গার্লস হাইস্কুল!"
"তাই গৃহপ্রবেশে বাড়ির লোক কাউকে দেখলাম না। মামাতো-খুড়তুতো ভাইবোন নেই?"
"মামাতো ভাই আছে। পিসি থাকেন অসমের তিনসুকিয়া। যোগাযোগ নেই তেমন।"
"আপনার মামা-মামি? তাঁদেরও কি বিয়েতে মত ছিল না?"
"তাঁরা মেনে নিয়েছেন। বিয়ের সময় মামা উপস্থিত ছিলেন। জলপাইগুড়িতে অনুষ্ঠান করতে চেয়েছিলেন। আমরাই রাজি হইনি।"
"কেন দিদি? কত আশা-আকাঙ্ক্ষার দিন! সব মেয়েই তো চায় কনেবউ সাজবে। ছেলেরাও চায় টোপর পরে বিয়ে করতে যাবে।"
"না স্বপ্না। আমার এরকম কোনও আকাঙ্ক্ষা ছিল না। আমার মনে হয় বিয়ে খুব ব্যক্তিগত সম্পর্কের সামাজিক স্বীকৃতি। তার জন্য অত জাঁকজমক কীসের? অত দেনা-পাওনা, হিসেব-নিকেশ! বরং, সম্পর্ক টিকে গেলে, সাড়ম্বরে রজতজয়ন্তী পালন করা যায়!"
মিষ্টু হাসল। স্বপ্না ব্যথাকাতর মুখে তার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, "তা অবশ্য ঠিক দিদি। আজকাল কিছুরই ভরসা নেই। তাও দেখুন, আমার মতো মেয়ের স্বামীই বর, স্বামীই ঘর। বিয়ে ভাঙার কথা কল্পনাও করতে পারি না।"
সে হাতের শাঁখা-নোয়া মাথায় ঠেকিয়ে বলল, "আপনারও তো আপন বলতে ওই একজন দিদি। অর্কদা। তাঁর নামে একটু লোহা অন্তত পরবেন। এতে স্বামীর আয়ু বাড়ে।" মিষ্টু তর্কে গেল না। মৃদু হাসল। স্বপ্না বলল, "আর আমাকে যদি ছোট বোন মনে করেন দিদি, সারা জীবন তাই থাকব।"
মিষ্টুর কোনও আবেগসঞ্জাত কথা এল না। সে খুবই অপ্রতিভ বোধ করল মনে মনে। স্বপ্না হয়তো কোনও জবাব আশাও করেনি। বলল, "ওবাড়ি কোনওদিন গিয়েছেন?"
"না।"
"কেউ দেখেইনি আপনাকে?"
"অর্কর খুড়তুতো ভাই এসেছিল।"
"আমি তো ভাবতেই পারছি না। দাদার সঙ্গে কোথায় দেখা আপনার দিদি?"
"খড়গপুরে। ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে গিয়ে।"
"দেখবেন, একদিন সবাই সবকিছু মেনে নেবেন। দাদা তো একমাত্র সন্তান। তাকে ছেড়ে কোনও বাপ-মা থাকতে পারে?"

"ছেড়ে থাকবেন কেন? ও যাতে সহজে টালিগঞ্জের বাড়িতে যেতে পারে, তার জন্যই তো এদিকে থাকতে এলাম।"
"কিন্তু আপনারও মাঝে-মধ্যে যাবার কোনও জায়গা চাই।"
"বরাবর হস্টেলে ছিলাম তো, আমার অনেক বন্ধু।"
"আপনাকে আমার বাপের বাড়িতে নিয়ে যাব। দেখবেন খুব ভাল লাগবে। যেমন ভাল আমার বউদিরা, তেমন ভাল মা।"
মিষ্টু বলল না, তার কোনও একাকীত্ব নেই। যারা একলাই বড় হয়ে ওঠে, সমবয়সিদের সঙ্গে, বাগানের পপি, প্যানজি, গাঁদা, দোপাটির মতো, তারা নিজের ভিতর নিজেই সঙ্গী হয়ে ওঠে। বন্ধুরা পরমাত্মীয় হয়ে যায়। বই হয়ে যায় পরম বন্ধু। আর এখন তো অর্ক আছেই।
স্বপ্নাকে এতসব বললেও কি বুঝবে সে? তার অন্তর পারিবারিকতা দিয়ে গড়া। এই ফ্ল্যাটের সংসারে সে-ই বরং একাকী। অন্য পরিবারগুলির সঙ্গে তার সেরকম ভাব হয়নি। সে বলে, "কেউ বুঝলেন তো, গল্প করবে না। কারও ঘরে গেলে মুখখানা এমন করে রাখে যেন কী এক আপদ এসেছে! আচ্ছা, ঘরে লোক এসেছে, টি ভি তো বন্ধ করতে হয়। করবে না। এই আপনার কাছে আসি, খানিক শান্তি লাগে।"
এভাবেই কেটে যাচ্ছে দিন। স্বপ্নার উদরে সন্তান বেড়ে উঠছে। মাসের পাঁচ তারিখের সবচেয়ে কাছাকাছি রবিবার দেবদত্ত এসে ভাড়া নিয়ে যান। প্রতি শনিবার অর্ক টালিগঞ্জের পরিবারের সঙ্গে কাটিয়ে আসে। বাঁধা ছাঁদে দিন কাটছিল। এক সোমবারের আড্ডায় স্বপ্না বলল, "আপনার দাদার সঙ্গে আমার তিনদিন কথা নেই, জানেন তো!"
স্বপ্নার শরীর বিশাল হয়ে উঠেছে। মিষ্টুর বিছানায় বসে যখন, ওঠার সময় মিষ্টুকে সাহায্য করতে হয়। আর এক-দেড় মাসের মধ্যেই সে সন্তানের জন্ম দেবে।
মিষ্টু জিজ্ঞেস করল, "কেন? ঝগড়া করেছ?"
স্বপ্না বলল, "ঝগড়া? সে আমার ধাতে নেই দিদি। তবে হ্যাঁ, পষ্ট কথা বলি, সেই আমার দোষ। দেখেন, বাচ্চা হবে, মা বলেই রেখেছে, প্রথম বাচ্চা, সব খরচ বাপের বাড়ির। ওখানে শুধু একটাই অসুবিধা। কী বলুন তো? দাদাদের ফ্যামিলি হয়ে গিয়েছে তো। বাড়িতে কাচ্চা-বাচ্চা ভরতি। আতুর তোলা খুব অসুবিধা। আমাদের একুশ দিন আতুর মানে। তাই মা বলেছে, নার্সিং হোম থেকে এখানেই আমাকে নিয়ে আসবে। মা থাকবে। আয়া রাখবে।"
"ভালই তো। মাসিমা থাকলে আর ভাবনা কী।"
"এখন ওর বক্তব্য হল, দাদাদের কাছে চেয়ে ওকে সাত লক্ষ টাকা দিতে হবে। বুঝলেন তো? কাপড়ের দোকান ভাল চলছে না। এ পাড়ায় যে নতুন ফ্ল্যাটবাড়ি হচ্ছে, তার তলায় একটা দোকানঘর বুক করেছে। সে টাকাও আমার সোনার চূড় বাঁধা দিয়ে নিয়েছে। এই আপনাকে ছাড়া কাউকে বলিনি। এখানে এবার মুদি দোকান দেবে। খুব নাকি চলবে। তার জন্য টাকা চাই। আমি বললাম, এই বাচ্চা হওয়ার সব খরচ, এমনকী আয়ার খরচও মা দেবে। বিয়েতে এত জিনিসপত্তর, নগদ সব নিয়েছ। বছর ঘুরতেই আবার সাত লাখ? আমি পষ্ট বলেছি, পারব না। সে কী অশান্তি যদি দেখতেন। ভাতের থালা ছুড়ে ফেলল। জল ভরতি বালতি লাথি মেরে মেঝেয় থই থই করে দিল। আলমারি থেকে টেনে টেনে আমার শাড়িগুলো ফেলল। আমি বললাম, "কী ভেবেছ? স্বপ্নার শুচিবায়ু, এসব পরিষ্কার করতে বসবে? তারপর পা পিছলে পড়ে মরবে? আমিও মরব না, আমার বাচ্চাকেও মরতে দেব না। এই আমি শুলাম। মেঝে শুকোবে, তারপর উঠব। এটাও বলেছি, বুঝলেন তো? আমার যদি কিছু হয়, আমার দাদারা তোমাকে জেলের ঘানি টানাবে।"
"উনি কি খুব রাগ?"
"রাগী? সব নাটক! চাপ, বুঝলেন, চাপ। কিন্তু আমিও মাথা নোয়াব না। আমি তো বলিনি তোমায় বিয়ে করো। উনিই হামলে পড়েছিলেন।"
এর সপ্তাহ তিনেক পর একটি পুত্রসন্তান প্রসব করল স্বপ্না। অশৌচের কড়া বিধি-নিষেধের মধ্যে দিয়ে একুশ দিন পার হল। অতনু ছেলে পেয়ে একেবারে গদ গদ। হাকুলিবিকুলি কুলিকুলি হালুমডালুম ডুমডুম আমাল তনতনিতনতনিতনি এবম্বিধ নানান ধ্বনি সৃষ্টি করে কম্বুকণ্ঠে ছেলে আদর করেন তিনি। তাঁর আদরের চোটে পাখি পালায়। কুকুর ঘেউরব করতে থাকে। পাশের মাঠে বাচ্চারা খেলতে খেলতে থমকে দাঁড়ায়। কী ঘটছে বোঝার চেষ্টা করে। স্বপ্না আর অতনুকে আগের মতোই সুখী দম্পতি মনে হয়। মিতবাক অর্ক পর্যন্ত একদিন বলে ফেলল, "ভাগ্যিস বউদির জন্য অতনুদার আবেগ এমন যোজনশ্রুত হয়ে ওঠে না।"

৩

কিছুদিন ধরেই খবরটা অস্থির করে রাখছিল তাদের। অর্কর সংস্থা জেকব জেরিপুল তাকে আমেরিকা পাঠানোর কথা ভাবছে। তিন বছর তাকে থাকতে হবে ক্যালিফোর্নিয়ায়। যাওয়ার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত ভাবে স্থির হল যেদিন, অর্কর হাতে মাত্র একুশ দিন বাকি। সে ভারী দ্বিধা ও দুশ্চিন্তায় বলল, "কী করি বলো তো? যাব?"
মিষ্টু নির্দ্বিধায় বলল, "নিশ্চয়ই যাবে। এত বড় সুযোগ হারাবে নাকি?"
"তুমি?"
"তোমায় যে শর্ত দেওয়া হয়েছে তাতে তুমি একবার দেশে আসতে পারো। স্ত্রীকে সঙ্গে নিলে ওদের আপত্তি নেই। তো, ধরো, মাস ছয়েক পর আমি চলে গেলাম তোমার কাছে। ক'দিন থাকলাম। আবার সুবিধে বুঝে তুমি এলে।"
"এখানে? এবাড়িতে তুমি একা থাকবে?"
"হস্টেলে থাকা মেয়ে আমি অর্ক। আমায় নিয়ে ভেবো না।"
"হস্টেল আর ফ্ল্যাট তো এক নয় গো মিষ্টু। হস্টেলে নিরাপত্তা অনেক বেশি।"
"তাই বলে আমি হস্টেলে থাকতে যাব না। হস্টেল লাইফকে আমি গুড বাই ফর এভার বলে এসেছি। এখানে শান্ত পাড়া। অতনুদা, স্বপ্না প্রতিবেশী হিসেবে খুবই ভাল। এসব নিয়ে ভেবো না।"
"আমার বাড়িতে কি একবার..."
"অর্ক, আমি দুর্বল নই। তুমিও হয়ো না প্লিজ়। সুযোগ পেয়েছ, যাও। আমি পেলে আমিও চলে যাব। তোমার থালায় কে ভাত বেড়ে দেবে এসব তুচ্ছ বিষয় ভাবব না।"
কিন্তু বিষয়টি তাদের ভাবিয়ে তুলল যখন দেবদত্ত বলে উঠলেন, "ভাই অর্ক, একলা মেয়েমানুষ ফ্ল্যাটে থাকবে এ তো মানতে পারব না। তোমরা ভাই অন্য কোথাও উঠে যাও।"
অর্কর মুখ লাল টকটকে হয়ে উঠল। অপমানে কান ঝাঁ ঝাঁ করে উঠল মিষ্টুর। সে বলল, "আমি নিজের দায়িত্ব নিতে জানি দেবদত্তদা।"
"সে আপনি জানেন ম্যাডাম। কিন্তু ফ্ল্যাট আমার। ভালমন্দ কিছু ঘটে গেলে ফালতু কেসে জড়িয়ে পড়ব। না না অর্ক। তোমরা দু'সপ্তাহের মধ্যে মানে তোমার আমেরিকা যাবার আগে আমার ফ্ল্যাট ছেড়ে দাও।"
অর্ক বলল, "আমরা যখন এলাম, আপনি বললেন, যতদিন খুশি থাকো।"
"তখন পরিস্থিতি এরকম ছিল না।"

"কিন্তু দু'সপ্তাহের মধ্যে চলে যেতে বলা তো জুলুম। এত অল্প সময়ে আমরা বাইরে যাবার প্রস্তুতি নেব, না থাকার জায়গা খুঁজব আপনি বলুন তো!"

"ম্যাডাম অন্য কোথাও থাকুন। সময় নিয়ে বাসা খুঁজে নিন। দেখো ভাই, মুখে কী বলেছি তার কোনও মূল্য নেই। তোমাদের সঙ্গে আমার কোনও এগ্রিমেন্ট নেই। যে কোনও সময় আমি তোমাদের চলে যেতে বলতে পারি।"

"দেবদত্তদা, এগ্রিমেন্ট হোক আর না-ই হোক, মানবিকতা ও ভদ্রতার কিছু নিজস্ব শর্ত থাকে। আপনি যা বলছেন তা অন্যায়। এভাবে আপনি জবরদস্তি করতে পারেন না। ঠিক আছে, আপনি চাইছেন না, আমরা অন্যত্র চলে যাব। জোর করে আপনার ফ্ল্যাট দখলের কোনও ইচ্ছেই আমাদের নেই। কিন্তু একটা সুবিধেজনক সময় তো আপনাকে দিতেই হবে।"

"আমার যা কথা তাই কথা। ভাড়া নেবার সময় তো বলোনি তুমি বউ ফেলে বিদেশে চলে যাবে ভাই! এখন তোমার ম্যাও তুমি সামলাও।"

"বেশ। সামলাব। আমার প্রস্তাব শুনুন তবে।"

"কী প্রস্তাব?"

"আপনি তো ফ্ল্যাটটা বিক্রি করতে পারেন বলছিলেন। আমায় দিন। আমি কিনে নেব।"

"ভাই, মেট্রো রেল চালু না হওয়া পর্যন্ত ফ্ল্যাট তো বেচব না। শুধু শুধু লস করব কেন বলো!"

দেবদত্তর অনমনীয় মানসিকতা তাদের অপমান করল যতখানি, ততটাই অসহায়। আর অতনু সব শুনে একেবারে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন।

"ওর বাপের নাম ভুলিয়ে ছাড়ব। এটা আমার পাড়া। একটা আওয়াজ দিলে দশটা লোক এসে পড়বে। চিটিংবাজি! ওঠাক তো দেখি ওর কী সাধ্য!"

মিষ্টি বলল, "অতনুদা, এই ব্যবহারের পর এই ফ্ল্যাটে থাকার আগ্রহ আর নেই আমার। আপনি কথা বলে দু-তিন মাস আমার থাকার ব্যবস্থা করে দিন। তার মধ্যে ব্যবস্থা করে ফেলব।"

তেমনটাই হল। ভারী দুশ্চিন্তা ও বউকে ছেড়ে যাবার কষ্ট নিয়ে, অর্ক আমেরিকায় পাড়ি দিল। দেবদত্ত রায় কিংবা অর্কর আপনজনেরা অনমনীয় হয়ে রইলেন। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অর্ক যাবার সিদ্ধান্ত বাতিল করতে চাইছিল, কিন্তু মিষ্টি অবিচল থেকে অর্ককে যাবার জন্য অনুপ্রাণিত করেছে। সে তো একাই বড় হয়েছে। কিন্তু সে কখনও অভিভাবকহীন, নির্বান্ধব ছিল না। এই মুহূর্তে সে সম্পূর্ণ একলা নিজের অবস্থান বুঝে নিতে চাইছে। সে যুদ্ধটা জিততে চায়। তার জিজীবিষা প্রবল হয়ে উঠল। মিষ্টি তার ছুটির দিনগুলোয় ফ্ল্যাট ভাড়ার সন্ধানে যায়, সেখানে কয়েকটি প্রশ্ন তাকে তাড়া করে। পোষা কুকুর দ্বারা আক্রান্ত অনাহূত অতিথির মতো দংশিত, অপমানিত হয়ে ফেরে সে। দীর্ঘ হস্টেল বসবাসকালে সে বুঝতেও পারেনি, এই কলকাতা শহরে একাকী একটি মেয়ের আশ্রয় পাওয়া এমন কঠিন ও অপমানকর।

কেউ বলল, "আপনি একা থাকবেন? না না। একা মেয়েকে ফ্ল্যাট দেব না।"

"কেন বলুন তো?"

"কেন? আপনাকে চিনি না, জানি না, আপনি কী করেন না করেন...!"

"আমার সংস্থার সচিত্র পরিচয়পত্র আছে। পাসপোর্ট আছে।"

"না। দেব না। আপনি আসুন।"

এর সপ্তাহ তিনেক পর একটি পুত্রসন্তান প্রসব করল স্বপ্না। অশৌচের কড়া বিধি-নিষেধের মধ্যে দিয়ে একুশ দিন পার হল।



কেউ বলল, "স্বামী আছেন?"

"তিনি বিদেশে।"

"ও! শাঁখা সিঁদুর পরেননি তো! আচ্ছা আপনার শ্বশুরমশাই আছেন? আর কোনও অভিভাবক? তাঁকে নিয়ে আসবেন।"

ঘুরতে ঘুরতে দেখতে দেখতে তার মনে হল, এই শহর, নাকি এই দেশটাই, আজও, একলা একটি মেয়েকে পেলেই বেশ্যার চেয়ে অন্যতর কিছু ভাবতেই জানে না। সম্পূর্ণ স্বনির্ভর নারীরও অভিভাবক খোঁজে।

সে ক্লান্ত ও হতমান হয়ে পড়ল। মাসের শেষে তার কাছ থেকে ভাড়া নিতে এল দেবদত্তর স্ত্রী মালবিকা। জিজ্ঞেস করল, "নতুন বাড়ি পেলেন?"

মিষ্টি ভারী অপ্রতিভ হয়ে বলল, "খুঁজছি। পেয়ে যাব।"

"আপনি তো হস্টেলে থাকতেন শুনেছি। সেখানেই কেন চলে যাচ্ছেন না? শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে পায়ে পড়ুন। আপনি তো ও বাড়ির বউ। আপনার অধিকার আছে।"

"আপনি বিচলিত হবেন না। আমি বাড়ি পেয়ে যাব।"

"না, আপনি ফ্ল্যাটটা ছাড়লে মাঝে মাঝে এসে থাকব ভাবছি। কী সুন্দর পুব-দক্ষিণ খোলা বলুন তো।"

তার সমস্যা নিয়ে মিষ্টি তার প্রতিবেশী ছাড়া অন্য কারও সঙ্গে এখনও আলোচনা করেনি। অর্কর সঙ্গে সামান্যই কথা হয়। দু"জনের ঘুম ও জাগরণের সময় সম্পূর্ণ আলাদা। একেবারে বিপরীত। দু"জনেই ব্যস্ত। মিষ্টির রান্না বা অন্যান্য কাজের সাহায্যকারিণী আছে, ও দেশে অর্ককে সমস্তই নিজেকে করতে হয়। নতুন দেশ, নতুন আবহাওয়া, নতুন মানুষ ও পৃথক জীবনযাপনের ধরন আয়ত্ত করতে অর্কর নাজেহাল দশা। তারই মধ্যে সে মিষ্টিকে নিয়ে ভারী উদ্বিগ্ন। বাসা খুঁজতে গিয়ে কতখানি নাকাল হতে হচ্ছে, তা সবিস্তারে বলেনি অর্ককে। কী হবে তার কষ্ট বাড়িয়ে! সে ক্রমাগত ভাবছে, কাকে বললে দ্রুত সমস্যার সমাধান হবে। আরও তিন চারজনের সঙ্গে ভাড়াটে অতিথি হিসেবে থাকা যায়, যাকে বলে পেয়িং গেস্ট, তাতেও মন সায় দেয় না। যত ছোটই হোক, এখানে তার ও অর্কর সংসার গড়ে উঠেছে তো। জীবনে প্রথম, তার নিজস্ব একটি ঠিকানা হয়েছে। হোক ভাড়াবাড়ি। তবু, এইসব বস্তু, এই ফ্রিজ, পাখা, পানীয় জলের যন্ত্র, এই চেয়ার-টেবিল -- এসব কী করবে সে! কোন প্রাণে বিক্রি করবে? তারা যে বড় ভালবেসে সংসার পেতেছে!

স্বপ্না তার কচি সন্তান বুকে করে চলে আসে মিষ্টির কাছে। বলে, নিন না, কোলে নিন। মিষ্টি ভয় পায়। কী ছোট্ট! লগবগে ঘাড়। পুটপুটে ঠোঁট। স্বপ্না হেসে বলে, "নিজের যখন হবে!"

বাড়ি খুঁজতে গিয়ে নিজের অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতা স্বপ্নাকে শুনিয়েছে মিষ্টি। দু'জনের চিন্তার মান, বোধের ব্যাপ্তি, শিক্ষার গভীরতা, ভাষা, জগৎ— সমস্তই বহু যোজন দূরত্বের! তবু , এই মেয়েটির সরল আন্তরিকতা, সহজ মন মিষ্টিকে ঘনিষ্ঠ করে তুলেছে। গভীর যন্ত্রণার কথা স্বপ্না তাকে বলে। এবার সে-ও বলছে!

"জানো, একলা মেয়েকে কেউ সম্মান দেয় না! এ আমরা কোথায় পড়ে আছি!"

স্বপ্না স্বভাবমতো হেসে গড়িয়ে পড়ে বলল, "আপনার সাহস আছে দিদি। দাদাকে চলে যেতে দিয়ে এখন নিজে বিচ্ছিরি সব কথা শুনছেন। আপনার থাকার ব্যবস্থা করা তো দাদার দায়িত্ব!

আপনি বলে তাই। আমি তো একা থাকার কথা ভাবতেই পারি না। আপনার দাদাও খুব চিন্তা করে আপনার জন্য। ওর যে ছোট ভাই, মানে আমার দেওর, একদম মেট্রোর কাছে বাড়ি তুলছে। একতলা কমপ্লিট, বুঝলেন তো? এই ব্যাপারে আপনার দাদা কথা বলবে। ওখানে যদি আপনি থাকতে পারেন। মেট্রো তো চালু হল বলে!" প্রস্তাব দিলেন অতনু।

"তুমি আট লাখ টাকা দাও। ওরা দোতলা তুলে একেবারে অ্যাটাচড বাথ করে তোমার থাকার ব্যবস্থা করে দেবে। মেট্রোর গায়ে। ওই এলাকায়, কম করে, আট হাজার দশ হাজার ভাড়া হবে। তুমি থাকো, যতদিন খুশি থাকো। সাত বছরে তোমার টাকা উসুল।"

"ভেবে দেখি।" মিষ্টু বলল, "অর্কর সঙ্গে কথা বলি!"

কথা বলবে কী! সে নিজেই ভাবতে বসল। আপাতত দশ ঘণ্টার আগে সে অর্কর সঙ্গে কথাই বলতে পারবে না। আর সেসময় অর্কর নানা কাজের তাড়া থাকবে। অতনুর প্রস্তাব মিষ্টুর ভাল লাগেনি। দেবদত্ত রায়ের আচরণ ও মনোভঙ্গি, কাগজের বিজ্ঞাপন দেখে ফ্ল্যাট খুঁজতে যাওয়ার অভিজ্ঞতা তাকে সন্দিহান ও সতর্ক করে তুলেছে! অপমানবোধে তার বুক জ্বলে। বিশ্বাস ভাঙলে কেবল খোলামকুচিই পড়ে থাকে তা নয়। বিশ্বাসের বোতলে বন্দি অবিশ্বাসের বিষাক্ত বাষ্প ক্রমেই চতুর্দিকে ছড়িয়ে যায়! কে বলতে পারে, কোনও অজুহাতে সে পুনরায় উৎখাত হবে না? সে কি তার কাজকর্ম ফেলে অধিকার আদায়ের জন্য কোর্টকাছাড়ি করবে তখন? কে জানে, কী ঘোর অসম্মানজনক অপবাদ তাকে দিয়ে বসবেন অতনুর ছোটভাই! তা ছাড়া অত টাকাও তার নেই। বাবা-মায়ের জমানো অর্থ মায়ের চিকিৎসায় শেষ হয়ে গিয়েছিল। কুড়িয়ে বাড়িয়ে যা পাওয়া গিয়েছিল, তার সঙ্গে মামার নিজস্ব অবদানে সে লেখাপড়া করেছে! সে যে অত্যন্ত মেধাবী, খড়গপুর আই আই টি থেকে পাশ করা বৈদ্যুতিন প্রযুক্তিবিদ, সে যে একটি নামী বহুজাতিক সংস্থায় নিজ যোগ্যতায় কাজের সুযোগ পেয়েছে এই কৃতিত্ব, এই পরিচয় কিছু নয়, কিছুই নয়! ভারতবর্ষ আজও এত নিম্নগামী?

মধ্যরাতে তার মাথা গরম হয়ে উঠল। ঘুম এল না। সে পায়চারি করতে লাগল। ইচ্ছে হল কারও সঙ্গে কথা বলে। কার সঙ্গে বলবে? এত রাতে একমাত্র কোনও বন্ধুকেই ফোন করা যায়। কাকে করবে? অর্ককে? সে অফিসে ফোন ধরে না। অত কাজে তাকে বিব্রত করবে না মিষ্টু। তা হলে কাকে?

পায়চারি করতে করতে খাবার টেবিলে খবরের কাগজের সঙ্গে পড়ে থাকা ছোট্ট বইখানি হাতে তুলে নিল সে। নানান তথ্যসমৃদ্ধ পুস্তিকাটি বিনামূল্যে কাগজের সঙ্গে দেওয়া হয়েছে। সে পাতা ওল্টাতে লাগল। কতরকম যোগাযোগ। হাসপাতাল, সাঁতারের ক্লাব, রেস্তোরাঁ, বিজ্ঞাপন সংস্থা, এস্টেট এজেন্ট, ডেভেলপার। এস্টেট এজেন্ট?

চেয়ারে বসে পড়ল মিষ্টু। অখণ্ড মনোযোগে পাতার পর পাতা ওল্টাতে লাগল। সহজ কিস্তি। ব্যাঙ্ক সংযোগ। থ্রি বেডরুম। টু বেডরুম। স্কোয়ার ফিট। সাউথ ফেসিং। মেট্রোর কাছাকাছি, জিম। সুইমিংপুল! পড়ুয়া মেয়েটা, কর্মক্ষেত্রে উন্নতির শিখরে পৌঁছতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মেয়েটা, বিষয়-আশয় নিয়ে এই প্রথম ভাবতে শুরু করল। তার মুখে স্বস্তি ও তৃপ্তির হাসি ফুটে উঠল শুক্লা চতুর্দশীর চাঁদের মতো পূর্ণ।

বড় করে শ্বাস নিল সে। রান্নাঘরে গিয়ে কফির জল বসাল। বেশ বড় ও কড়া কফি করল। কফি মাগ হাতে নিয়ে ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল তার ছোট্ট বাসা। তার সংসার। তাদের ভালবাসার নীড়। এই নীড় সে বুকে আগলে রাখবে আজীবন। অর্ককে নিশ্চিন্ত করবে। সে পথ পেয়ে গিয়েছে।

সে কফি পান করতে করতে পূর্বদিকের জানালায় দাঁড়াল। সূর্যোদয়ের আভা ফুটলেই হাঁটতে বেরিয়ে পড়বে। আজ আর ঘুম হবে না। তাতে কিছু না। রাত্রিজাগরণ জীবনের স্বাভাবিক প্রয়োজনীয়তা। এর পরের কাজগুলো তাকে করতে হবে দ্রুত। ঠান্ডা মাথায়। আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে। কী আশ্চর্য! একটা সামান্য পুস্তিকা তার বুদ্ধির ব্যাপ্তি ঘটাল! সে কেন আগেই ভাবেনি, ব্যাঙ্ক থেকে গৃহঋণ নিয়ে নিজস্ব— একেবারে নিজস্ব বাসস্থান সে ক্রয় করতে পারে!

দেবদত্ত রায়কে অর্ক এরকম একটি প্রস্তাব দিয়েছিল। কী ভেবে দিয়েছিল, কোথায় অত টাকা পেত, মিষ্টু জানে না। হয়তো টাকার জোগান নিয়ে পরে ভাবত। সেই অর্কর মনে এল না, মিষ্টু ভাড়াবাড়ির জন্য দোরে দোরে না ঘুরে নিজেই একটা ফ্ল্যাট কিনতে পারে!

ঠিক পনেরো দিন পর মিষ্টির বাক্স নিয়ে 'শান্তির বাড়ি'-তে এল সঙ্ঘমিত্রা দাস। স্বপ্নার হাতে মিষ্টি দিয়ে বলল, "ফ্ল্যাট বুক করে এলাম।"

"ফ্ল্যাট! মানে কিনলে!" চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল অতনু ঘোষালের। হাঁ করে তাকিয়ে আছেন মিষ্টুর দিকে। আস্তে আস্তে বিবর্ণ হয়ে উঠলেন তিনি। বলতে লাগলেন, "কোথায়? কবে? কার সঙ্গে গিয়ে কিনলে? আমাকে না জানিয়েই কিনে ফেললে?"

স্বপ্না বলল, "আরে আগে বসতে দাও। তারপর ধীরে সুস্থে শোনো। বসুন না দিদি। চা বানাই?"

অতনু বললেন,"কোথায় কিনলে? ফ্ল্যাট কিনবে আমাদের একবার বললে না? আমার কত বন্ধু কত ভাল ভাল প্রোমোটিং করছে। দারুণ ফ্ল্যাট পাইয়ে দিতাম। ব্রোকারের হিসেবে আমারও দু'পয়সা আসত। তোমার থেকে নিতাম না! একা মেয়েছেলে! নিশ্চয়ই ঠকিয়ে ছেড়েছে।"

স্বপ্না বলল, "স্বামী না থাকলে একা মেয়েছেলে ফ্ল্যাট কিনতে পারে?"

"পারে স্বপ্না।"

"কোথায়? কোথায় কিনলে?"

"এই তো, ব্লু স্কাই প্রজেক্ট।"

"কোথায়? কোথায়?"

"ইস্টার্ন মেট্রোপলিটন বাইপাসের ধারে, বাঘাযতীন ব্রিজ পার করেই ব্লু স্কাই প্রজেক্ট।"

"সে তো বিশাল প্রজেক্ট। প্রচুর দাম। আর এইসব বড় ডেভেলপাররা সব ডাকাত। আমাকে একবার বলতে পারতে। একে বলে সেধে দেয় হাঁড়িকাঠে গলা, পাঁঠার আপন ভাই ভোঁদাই বগলা!"

মিষ্টু উঠে দাঁড়াল। এখানে আসার পর থেকে অতনু তাদের নানাভাবে সাহায্য করে এসেছেন। সেই ঋণ অপরিশোধ্য। কিন্তু ছোটভাইয়ের বাড়িতে দোতলা তোলার প্রস্তাবের মধ্যে একজন সুযোগ সন্ধানী মানুষকে মিষ্টু চিহ্নিত করেছিল। আজ নিশ্চিত হল। সে একাকী থাকবে বলে যারা তাকে বাড়ি ভাড়া দেয়নি, অতনু তাদের থেকে কিছুমাত্র আলাদা নন। মিষ্টু বাড়ি খুঁজতে যাবার সময় অতনুর সঙ্গ বা সহায়তা চায়নি, শুধু তিক্ত অভিজ্ঞতা স্বপ্নাকে বলত। তৎসত্ত্বেও অতনু আশা করছেন, ফ্ল্যাট কেনার আগে তাঁকে বলতে হত কারণ একলা 'মেয়েমানুষ' মাত্রই নির্বুদ্ধি। আর তিনি বুদ্ধিধর পুরুষ অভিভাবক, যিনি মহিলাদের দুঃসময়ে সহায়, তাদের রূপ ও রান্নার তারিফকারী, এবং সেই সঙ্গে চোখা হিসেবের অধীশ্বর! মিষ্টু দু'বার তাঁর দাঁও মারার পরিকল্পনা নস্যাৎ করেছে, অতনুর পৌরুষ সম্পর্কে নিজস্ব দর্প তা সহ্য করতে পারছে না। কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে আপত্তিকর বুলি আউরে বসেছেন! কথাগুলো এই প্রথম শুনল মিষ্টু। "সেধে দেয় হাঁড়িকাঠে গলা / পাঁঠার আপন

ভাই ভোঁদাই বগলা!"

দুঃখ নয়, রাগ নয়, নির্দয় করুণা বোধ করল মিষ্টু! কেটে কেটে বলল, "ব্যাঙ্ক লোন নিয়েছি। একেবারে তৈরি প্রজেক্ট। সাতদিন পর পজেশন পেয়ে যাব। আমি শিফট করব তার পরের রবিবার। তেইশ তারিখ পড়ছে। ব্যাঙ্ক থেকে প্রজেক্ট ইন্সপেক্ট করেছে। লয়ার কাগজপত্র দেখে দিয়েছেন। জিনিসপত্র বাঁধা-ছাঁদা, পরিবহণ, এমনকী নতুন ফ্ল্যাটে সব খুলে গুছিয়ে দেবার লোক ও ব্যবস্থা আছে ওখানে। যাকে বলে প্যাকারস অ্যান্ড মুভারস। আলাদা দাম দিতে হয় যদিও। আমি সে ব্যবস্থাই করেছি। কোনও হ্যাপা রইল না। ভাবলাম আপনারা খুশি হবেন, তাই জানাতে এসেছিলাম।"

স্বপ্না বলল, "আমি খুবই খুশি দিদি। মেয়ে হয়ে আপনি যা



চেয়ারে বসে পড়ল মিষ্টু। অখণ্ড মনোযোগে পাতার পর পাতা ওল্টাতে লাগল। সহজ কিস্তি। ব্যাঙ্ক সংযোগ। থ্রি বেডরুম। টু বেডরুম। স্কোয়ার ফিট।

কিছু করছেন, দেখে আমি যেন নতুন চোখ পাচ্ছি। তবে আপনি থাকবেন না, এটায় মনখারাপ লাগছে। যোগাযোগ রাখবেন তো?"

"নিশ্চয়ই স্বপ্না! তোমরা আমার কত উপকার করেছ। আমি, অর্ক

"সে এমন কী করেছি দিদি! ফ্ল্যাট যেটা কিনলেন, এরকমই? নাকি একটু বড়!"

"এর চেয়ে বড় স্বপ্না। আমি গুছিয়ে বসি, তারপর দেখতে যেয়ো।"

"হি হি হি! ওখানে সত্যনারায়ণ করলে এই কুচো নিয়ে আর কিছুই করতে পারব না কিন্তু!"

৪

বোড়ালের খেজুরবাগান থেকে মেট্রোপলিস ব্লু স্কাই ভৌগোলিক দূরত্ব হিসেবে কিছুই নয়। গড়িয়া স্টেশনগামী অটোয় চেপে ঢালাই ব্রিজে নামতে হয়। সেখান থেকে অনেক বাস—তার যে কোনওটিতে উঠে পড়লে বৈষ্ণবঘাটা-পাটুলি, বাঘাযতীন ব্রিজ, তারপরেই ব্লু স্কাই। যার পূর্বভাগে বিশাল মেট্রোপলিস মল।

'শান্তির বাড়ি' থেকে ব্লু স্কাই-এর বারো তলার ফ্ল্যাটে মিষ্টু এসেছে তেরো বছর হল। তাদের ছেলের বয়স সাড়ে তিন। খেলনা স্কুলে যায়। এক মাথা কালো কোঁকড়া চুল। টুকটুকে রং। শান্তমধুর একটি বাচ্চা। তাকে দেখাশোনার জন্য সর্বক্ষণের আয়া আছে। অর্ক ও মিষ্টু তাদের কর্মক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠার উচ্চতম বিন্দুর খুব কাছাকাছি। অর্কর পিতামহী পরলোক গমন করলে তার মা ও বাবার সঙ্গে চলনসই সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। মিষ্টু গর্ভবতী হলে তা প্রগাঢ় হয়।

এই দীর্ঘ তেরো বছরে অতনু ও স্বপ্না একবারও আসেননি ব্লু স্কাইয়ে। যাকে মিষ্টু বলে 'নীলাকাশ'! ভৌগোলিক দূরত্ব ছাড়াও আরও অনেকরকম দূরত্ব আছে, যা অনতিক্রম্য।

প্রথম দিকে মিষ্টু নিজেই গিয়েছে কয়েকবার। তার ফ্ল্যাট দেখতে আসার কথা বলে এসেছে। কিন্তু সে গেলে স্বপ্না হাসিতে ভরে উঠত, অতনু কোনও কারণ দেখিয়ে সরে যেতেন। কালক্রমে যাওয়া আর হয়ে উঠত না। মাঝে-মধ্যে ফোন। স্বপ্না একদিন কাঁদল। বলল, "মেরে-ধরে টাকা আদায় করল জানেন তো! সে কী ভাষা! ইতর লোকেদের মতো তুই-তোকারি করছে, বুঝলেন তো! বলে, হয় টাকা আনবি নয় তোকে আর তোর ছেলেকে লাথি মেরে রাস্তায় বের করে দেব।"

"টাকা পেয়ে শান্ত?"

"শাড়ির দোকানটা, মানে রঘুপতি মার্কেটে জামাকাপড়ের দোকানটা একজনকে চালাতে দিয়েছে। মাসে কত করে টাকা পায়। আর পাড়ার মুদিদোকান। ছেলের নামে নাম। বুঝলেন তো? পারিজাত স্টোর্স।"

"ভাল চলছে নিশ্চয়ই?"

"আমি কী জানি গো দিদি। বলে তো ভাল। বলেছিলাম, কাপড়ের ব্যবসা তুমি দেখো, এই মুদিদোকানে আমি বসি। বলে, মেয়েছেলে মানুষ, মেয়েছেলের মতো থাকো। বলেন তো, আমি কি খারাপ বলেছি? আমি যদি ঘর সামলে, ছেলে সামলে দোকান চালাই, ওর কী! দেবে না, বুঝলেন তো! পুরুষমানুষরা মেয়েদের হাতে টাকা দিতে ভয় পায়। যদি হুকুম না খাটে! হি হি হি!"

একসময় ফোনটা করাও আর হয়ে উঠত না। অর্ক ফিরে এল। মেট্রো রেল এই অঞ্চলে গতিবান হল। কতরকম সেলফোন কোম্পানি এসে গেল বাজারে। অনেকের আদি নম্বর বদলে গেল। আর 'নীলাকাশ'এর বারো তলার বাসস্থান প্রাণ ঢেলে সাজিয়ে তুলল মিষ্টু। অর্ক এতটুকু কার্পণ্য করল না। নীলাকাশে তাদের জীবন পূর্ণমাসী হয়ে উঠল। যে আসে সে-ই মিষ্টুর গৃহসজ্জার প্রশংসা করে। প্রতি দেওয়াল, প্রতি কোণ, রং, ছবি, আসবাব, শিল্পসামগ্রী, বইয়ের তাক, সমস্তই এমনই সুন্দর ও সামঞ্জস্যপূর্ণ যে অনেকেই মনে করে কোনও পেশাদার গৃহসজ্জাকারীর সাহায্য পায়। অর্ক মিষ্টুর জন্য গর্বিত বোধ করে।

এক সকালে অর্ক তার বাবাকে নিয়ে নিকটবর্তী হাসপাতালে গিয়েছিল। তাঁর হাড়ে সমস্যা দেখা দিয়েছে। সেইসব মিটিয়ে বাড়ি ফিরে এলে অর্ক বলল, "জানো আজ কার সঙ্গে দেখা হল?"

"কার গো?"

"অতনুদার।"

"ও তাই? কোথায় দেখা হল? কেমন আছেন? অনেকদিন যোগাযোগ নেই।"

"দেখা তো হল হাসপাতালে। ছেলেকে নিয়ে এসেছিলেন। ওঁরা ভাল নেই জানো।"

"কেন গো?"

"ওঁদের ছেলের নাকি কী এক বিরল ধরনের স্নায়ুরোগ হয়েছিল। ভেলোরে প্রায় এক বছর থেকে চিকিৎসা করে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে এনেছেন।"

"ইস! আহা রে!"

"সব বিক্রি করে দিয়েছেন জানো। কাপড়ের দোকান, মুদিদোকান, সব। বললেন, বিশ লাখ খরচা হয়েছে। এখনও হচ্ছে।"

"সে কী গো! চলছে কী করে?"

"অতনুদা কোন বন্ধুর সঙ্গে প্রোমোটিং করছেন। আর বউদি ঘরে বসে বুটিক চালাচ্ছেন। মানে শাড়ি-টাড়ির ব্যবসা। হাসপাতালেই বউদি আমার হাত ধরে উপরোধ করতে লাগলেন, "মিষ্টুদিকে বলবেন যেন কেনেন কিছু আমার থেকে।"

"স্বপ্নাও ছিল?"

"হ্যাঁ। বাচ্চাটাও। দেখলে কষ্ট লাগবে তোমার। নিজেরাই বলতে লাগলেন, এই রবিবারে আপনাদের ফ্ল্যাটে যাই? অগত্যা বললাম, আসুন।"

এলেন তাঁরা। শুধু স্বামী-স্ত্রী। সঙ্গে বিশাল দুটি ব্যাগ। বাড়িতে পা রেখেই হেসে গড়িয়ে পড়ল স্বপ্না। বলল, "সেই এলাম, বুঝলেন তো মিষ্টুদি। এতদিন পর। সবই তো শুনেছেন। ছেলেকে ফিরে পেয়েছি, এই ভাগ্য। কেউ না বাণ মেরেছে, বুঝলেন তো! না হলে ওই রোগ দশ লক্ষ বাচ্চার মধ্যে একজনের হয়। কী একটা জ্বর হল, তারপর সব নড়াচড়া বন্ধ। মা গো! কী কষ্ট পেয়েছে আমার ছেলেটা ভাবতে পারবেন না। মাসের পর মাস ও-ও ঘুমায়নি, আমিও ঘুমাইনি। চোখে দেখা যায় না এমন যন্ত্রণা! চিকিৎসা মানে শুধু টাকা টাকা টাকা! তাইতেও হত না, বুঝলেন তো? বাণ কাটাবার জন্য তিরুপতি গেছি। একশো এগারো ঘটি দুধ দিয়েছি। তবে গিয়ে ছেলে ভাল হয়েছে। আমি তো দীক্ষিত। আমার প্রার্থনায় তাড়াতাড়ি কাজ দেয়, বুঝলেন তো? টাকা গেল, পয়সা গেল, ফ্ল্যাটটা ছাড়া সব গেল! এ তো একেবারে পাগলের মতন। আমি শক্ত হলাম। বুঝলেন তো! তবে কী জানেন, আপনাকে দেখে শিখেছি, মেয়েরা সব পারে। তাই আমিই ব্যবসাটা করছি। খেতে-পরতে তো হবে। লোকে নেয়, বুঝলেন তো? সব এসলুসিভ বুটিকের মাল। একদম বেস্ট কোয়ালিটি জিনিস। এই তো, সেদিন একজন নিল পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা। গত মাসে নিল পঁচাত্তর হাজার...!"

স্বপ্নার কাছে যেমন মিষ্টু 'দিদি' থেকে 'মিষ্টুদি' হয়েছে, তেমনি মিষ্টুর কাছেও স্বপ্না এখন তুখোড় পোশাক বিক্রেতা। যে, ক্রমাগত কথা বলে, কখনও দুঃখের গল্প, কখনও তার পসরার গুণকীর্তন করে ছত্রিশ হাজার টাকার শাড়ি ধরিয়ে দিল। তিনখানা খাঁটি রেশমি শাড়ি।

প্রায় ঘণ্টা দেড়েকের বিকিকিনির ভিতর সে একবার মাত্র মিষ্টুর ছেলের গাল টিপে আদর করল। আর অতনু ঘুরে ঘুরে ফ্ল্যাট দেখতে লাগলেন। বৈঠকখানা তো দেখাই যাচ্ছে, পাকশাল, শৌচালয়, এমনকী ব্যক্তিগত শয়নকক্ষটিতেও সটান ঢুকে পড়লেন।

মিষ্টু জিজ্ঞেস করল, "চেক নেবে ত স্বপ্না?"

"না না মিষ্টুদি। শুধু ক্যাশ।"

"দাঁড়াও, আমি তা হলে তুলে আনি এ টি এম থেকে।"

"আরে না না! আপনি তো টাকা মারবেন না। এখন কত দিচ্ছেন?"

"কুড়ি দিই?"

"আমি না ইনসটলমেন্ট করি না। বুঝলেন তো? আপনি বলে আর অত মানছি না। কাল একবার আসুন না বাড়িতে। এখন তো আপনার গাড়িও আছে।"

"একটু বসো না। নীচেই এ টি এম।"

"না না। তাহলে আর আপনি আসবেন না আমার বাড়ি। ওখানে সালোয়ার কামিজ আছে, লেগিংস, স্কার্ট, জাঙ্ক জুয়েলারি— সব পাবেন। সব তো আনা যায় না। কুড়ি পারলে তাই দিন। আজ তা হলে আসি?"

"কাল সাড়ে আটটা হবে কিন্তু।"

"কোনও অসুবিধে নেই।"

ব্যাগ গুছিয়ে যাবার সময় বলল, "ছেলের নাম কী মিষ্টুদি?"

"মিঠাই।"

"মিষ্টুর ছেলে মিঠাই! হি হি হি!" প্রচুর হেসে স্বপ্না বিদায় নিল। জীবনের দুঃসময়, দুর্ভাগ্য, উদ্বেগ স্বপ্নার হাসিটুকু যে কেড়ে নিতে পারেনি, সেটা দেখে মিষ্টুর ভাল লাগল। বরং অতনু খানিক ম্রিয়মাণ। একদা স্ত্রীকে তিনি দোকানেও বসতে দিতে চাননি। এখন স্বপ্নাই তাঁর চালিকাশক্তি! অতনু অর্ককে আলাদাভাবে কিছু বলছিলেন। ওঁরা বিদায় নিতে অর্ক বলে উঠল, "আজই পুরো টাকা দিয়ে দিলে না কেন?"

"বললাম তো।"

"জোর করে দিয়ে দিতে। আমি না হয় তুলে আনতাম।"

"কী হয়েছে বলো তো?"

"অতনুদা পাঁচলাখ টাকা ধার চাইলেন।"

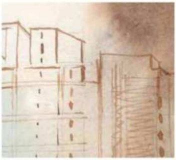
"পাঁচ লাখ! তুমি কী বললে?"

"ছেলের চিকিৎসার নামে...কী বলব? বললাম, দেখছি। ভেবে বলব।"

৫

স্বপ্নার ছেলেকে দেখে ভারী দুঃখ পেল মিষ্টু। তেরো বছর বয়স, কিন্তু পাঁচ বছরের বাচ্চার মতো শরীর। ল্যাগব্যাগ করে হাঁটছে। কথা বলছে থতিয়ে। যেখানে সেখানে শুয়ে পড়ছে। স্বপ্না বলল, "ডাক্তার বলেছে, আর বছর তিনেক পর ও একদম স্বাভাবিক হয়ে যাবে।"
"নিশ্চয়ই হবে স্বপ্না।" টাকা দিতে দিতে মিষ্টু বলল। সে লক্ষ করল, সেই দামি কাউচ নেই, বিশাল খাবার টেবিল নেই। তার পরিবর্তে প্লাস্টিকের খাবার টেবিল। পর্দাগুলো বিবর্ণ। দেওয়ালে ঝলমলে রং মলিন, বাইরের দেওয়াল থেকে চুঁইয়ে আসা জলে ফেঁপে ওঠা জায়গায় জায়গায়। জিনিসে ঠাসা ঘরখানায় আজ বড়ই রিক্ততা। রিক্ততা স্বপ্নার অঙ্গেও। শরীর থেকে মোটা মোটা স্বর্ণালঙ্কারের নজরকাড়া ঝলমলানি চলে গিয়েছে। কিন্তু স্বপ্না সফল ব্যবসায়িকতায় সমুজ্জ্বল। মিষ্টুর প্রয়োজন নেই জানিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও সে একের পর এক জড়ো করেছে নানান পোশাক, অলঙ্কার, টিপ, লিপস্টিক, অন্তর্বাস, এমনকী হাতব্যাগ। "নিতে হবে না, শুধু দেখুন!" বলছে সে। কবে স্বপ্না এমন ঝানু বিক্রেতা হয়ে উঠল? সে তার ও স্বপ্নার সেই সময়ের সংসারের কথা ভাবছিল। খুব ইচ্ছে করছিল, ওই ফ্ল্যাটে যায় একবার! যাবে কি? পুব দিকে যে ফাঁকা জায়গাটা প্রায় মাঠের মতো ছিল, এক জীর্ণ দোতলা বাড়ি সমেত, সেসব আর নেই। ওখানে এখন আটতলা বিশাল বিল্ডিং!
সে চা পান করে যাবার উপক্রম করছে, এসময় অতনু এলেন। স্বভাবমতো গলা চড়িয়ে বললেন, "আরে এতদিন পর এলে, আর একটু বসো। দেবদত্ত তো ফ্ল্যাটটা বেচে দিয়েছে।"
"আচ্ছা!"
"তোমার ফ্ল্যাট তো দেখলাম। দক্ষিণ খোলা, না?"
"পুব ও দক্ষিণ।"
"বারান্দাটা দক্ষিণে না? পুরো কাচের দেওয়াল। লম্বা বারান্দা। ভালই দেখায়। কত স্কোয়ার ফুট?"
"আঠারো শো।"
"আঠারো? ধুস! হতেই পারে না। কার্পেট এরিয়া টেনেটুনে ন'শো হবে। তার মধ্যে এমন আগোছালো করে রেখেছ! জিনিসে ঠাসা! সে এক বিশ্রী ব্যাপার! রাখতে হয় এইরকম! খোলামেলা! কত হাঁটাচলার জায়গা!"
এই প্রথম মিষ্টু তার ফ্ল্যাট সম্পর্কে নিন্দাবাক্য শুনল। তার কষ্ট হচ্ছিল। তবু চুপ করে রইল। অতনু বললেন, "অর্ক টাকাটা কবে দেবে কিছু বলল?"
মিষ্টু বলল, "আমায় কিছু বলেনি।"
"দিতে বোলো, বুঝলে? আমার দরকার। ধারই তো চাইছি।"
স্বপ্না বলল, "হি হি হি! পাঁচ লক্ষ কেন, ওরা দশ লক্ষ দিতে পারে। কত লোক কত টাকা দিয়েছে জানেন! আমার দাদারা। ওর ভাই, বন্ধু, সব্বাই। আমাদের পাশের ফ্ল্যাটে যদি থাকতেন দিতেন তো। ওকে তো জন্মাতে দেখেছেন। একটা দায়িত্ব আছে না?"
অতনু বললেন, "আরে তোমাদেরও ছেলে আছে। কার কপালে কী আছে কে বলতে পারে! ওটা, তোমাদের ওই ব্যালকনিটা তো মরণফাঁদ। আরে স্বপ্না, তোমার মাসতুতো দিদির ছোট ননদের কেসটা বলো।"
স্বপ্না বলল, "আর বলবেন না, ছেলেটা এই আপনার মিঠাইয়ের মতো। তিনতলার ব্যালকনিতে গ্রিল ছিল না, বুঝলেন তো? একদম নীচে পড়ে গেল। পিজি-তে নিয়ে গেল। অনেক চেষ্টা চরিত্র -- সব শেষ!"
অতনু বললেন, "কে বলতে পারে! কাচ ভেঙে পড়ল হয়তো বারো তলা থেকে।"
মিষ্টু উঠে দাঁড়াল। বলল, "অর্ক আপনাকে জানিয়ে দেবে। আজ আসি।"
দ্রুত পায়ে সিঁড়ি দিয়ে নীচে এল সে। নিজেদের পুরনো ফ্ল্যাটের দিকে ফিরেও তাকাল না। গাড়ি চালাতে চালাতে থর থর করে কেঁপে উঠল। তার চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল। সহজে কাঁদার মানুষই নয় মিষ্টু! একই সঙ্গে তার দয়া ছিল উত্তুঙ্গ, এবং অপরের দীনতা দর্শনে লজ্জা ছিল চরম। কাউকে কোনও দিন সে বলতে পারবে না, অর্ককেও না, যে, স্বপ্না ও অতনু টাকার জন্য অনুরোধ করেননি। দাবি করেছেন। হিংস্র ভয় প্রদর্শন করে দাবি করেছেন।

জীবনের দুঃসময়, দুর্ভাগ্য, উদ্বেগ স্বপ্নার হাসিটুকু যে কেড়ে নিতে পারেনি, সেটা দেখে মিষ্টুর ভাল লাগল। বরং অতনু খানিক ম্রিয়মাণ।



অনেক রাতে অর্ককে ডেকে তুলল সে।
"চলো।"
"কোথায়?"
"ব্যালকনিতে।"
"কেন? ঘুম পাচ্ছে সোনা।"
"প্লিজ চলো অর্ক।"
"চলো।"
"দেখো তো, এই কাচের দেওয়াল ভেঙে পড়ে যেতে পারি আমরা? আমি, তুমি, বা মিঠাই?"
"না! কেন পড়ে যাব? খুবই শক্ত ফ্রেমে আটকানো। তুমি কি দুঃস্বপ্ন দেখেছ মিষ্টু? এগুলো অন্যরকম কাচ। শক্ত। সহনশীল। শিশি-বোতল তো নয়। তুমি তো জানো সোনা।"
"আমরা ওদের পাঁচ লাখ টাকা দিয়ে দেব অর্ক।"
"হু! বেশ! দেব।"
"লোন নয়। একেবারে দিয়ে দাও। হ্যাঁ?"
"কিন্তু অতনুদা তো ধারই চাইলেন!"
"এই ব্যালকনির কাচটা সুরক্ষিত থাকবে। বিশ্বাস করো। আমি যে তোমাদের প্রবল ভালবাসি অর্ক। প্লিজ়, দিয়ে দাও।"
অর্ক রাজি হল। কথা বাড়াল না। মিষ্টুর চোখে জল ছিল। তাতে তারার আলো চিকচিক করছিল। সে মিষ্টুর গলা জড়িয়ে চুমু খেল। তার চেয়ে বেশি আর কে জানে, এই ঘর, সংসার, পরিবার মিষ্টুর কাছে কতখানি! হৃদয়ের কোন গভীরে কষ্ট পেলে এতখানি আবেগময়ী হতে পারে সঙ্ঘমিত্রা দাস, তার সম্যক ধারণা আছে অর্কর।
"চলো। কাল অফিস আছে না?"
"চলো।"
অর্কর গলা জড়িয়ে, গায়ে পা তুলে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল মিষ্টু। ভোরবেলা সূর্য দেখল, মিষ্টুর গলা জড়িয়ে, গায়ে ছোট্ট পা তুলে ঘুমোচ্ছে মিঠাই। অর্ক তার শালপ্রাংশু মহাভুজে জড়িয়ে আছে স্ত্রী আর পুত্রকে। 'শান্তির বাড়ি'-তেও কি সূর্য এমন ছবি দেখতে পাচ্ছিলেন?

অলংকরণ: কুনাল বর্মণ






মুখোপাধ্যায়, শ্রীমতী অনন্যা ভৌমিক, ডা. (মেজর) রঙ্গনা চক্রবর্তী। স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট, ডায়েট, নিউট্রিশন, দৈনন্দিন সুস্থতাবিষয়ে এঁরা অংশগ্রহণকারী মহিলাদের নানা গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দিয়েছিলেন। ওই দিনই একটি লাকি ড্র-এর মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ১০ জনকে বিজয়ী হিসেবে নির্বাচিত করা হয়। বিজয়ীদের ফ্রি বোটক্স ভাউচার প্রদান করেন ডা. ডলি গুপ্ত। সমগ্র অনুষ্ঠানটির সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন আর জে শেখর এবং আর জে মানালি। আধুনিক এই সমাজে নারী তার প্রগতির লক্ষে আরও এগিয়ে যাক, এটাই আমাদের প্রত্যাশা।




সাম্যের কথা ভারসাম্যের কথা

নারীদিবসে সি কে বিড়লা হাসপাতাল ও সানন্দা-র যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল 'শি পাওয়ার ২০১৯।'

সভ্যতার উন্মেষকালে সমাজের নিয়ন্ত্রণশক্তি ছিল নারী। মাতৃতান্ত্রিক সেই সমাজ ভেঙে গেছে বহুযুগ আগে। রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতা'-র প্রোটাগনিস্ট অমিত রায় বলেছিল "পুরুষ আধিপত্য ছেড়ে দিলেই মেয়ে আধিপত্য শুরু করবে। দুর্বলের আধিপত্য অতি ভয়ংকর।" প্রশ্নটা আধিপত্যের নয়, প্রশ্নটা সমতার। এই শতকে পুরুষ ও নারীর কর্মগত ব্যবধান আর নেই। অথচ তারপরেও পুরুষতান্ত্রিক সামাজিক কাঠামোয় নারীকে এখনও অনেক সময় মধ্যযুগীয় অন্ধতার অভিশাপ বহন করে চলতে হয়।


শ্রী উত্তম বসু, গ্রুপ সিইও, সি কে বিড়লা হাসপাতাল

নারী তার শাশ্বত মহিমায় সমুন্নত হয়ে উঠুক, এই চেতনাকে সঙ্গী করেই আন্তর্জাতিক নারীদিবস উপলক্ষে ৮ মার্চ সি কে বিড়লা হাসপাতাল ও সানন্দার যৌথ উদ্যোগে বি এম বিড়লা হার্ট রিসার্চ সেন্টারের অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হল 'শি পাওয়ার ২০১৯'। নারীর প্রগতি ও প্রতিনিয়তের সুস্থ যাপনের জন্য আয়োজন করা হয়েছিল একটি ওয়র্কশপের। সমাজের বিভিন্ন স্তরের অনেক মহিলাই এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছিলেন। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রেখেছিলেন শ্রীমতী ইলিনা বণিক, শ্রীমতী সুপ্রিয়া রায়, ডা. ডলি গুপ্ত, শ্রীমতী কস্তুরী



"আমি এমন একটা দিনের স্বপ্ন দেখি, যখন আমাদের আর নারীদিবস পালন করতে হবে না। আমি আশা রাখি একটি সঠিক সাম্যময় সমাজের, যেখানে প্রত্যেক লিঙ্গের মানুষই সমমর্যাদা ও সমান স্বীকৃতি নিয়ে বাঁচবে।"

ডা. অরুন্ধতী সেন
হেড-ব্র্যান্ড এবং কমিউনিকেশন, সি কে বিড়লা হাসপাতাল



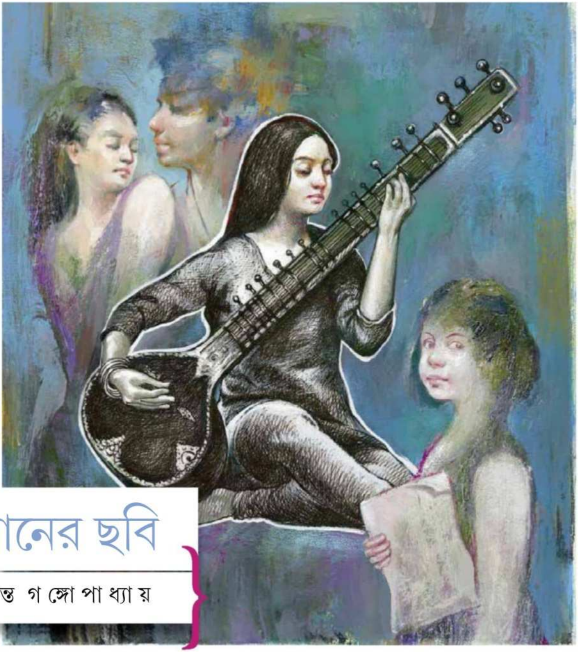
"আমার মনে হয়, প্রত্যেক নারীর সাফল্যের জন্য পুরুষের উচিত তাঁদের পাশে থাকা এবং নারীরও পুরুষদের পাশে থাকা প্রয়োজন।"

ডা.শান্তনু চট্টোপাধ্যায়
ইউনিট হেড, বি এম বিড়লা হার্ট রিসার্চ সেন্টার এবং গ্রুপ মেডিকেল ডিরেক্টর, সি কে বিড়লা হাসপাতাল



"এই দিনটি জীবনের প্রতিটি ঘাত-প্রতিঘাত সম্মুখীন হওয়া নারীদের সম্মাননা জানানোর দিন। সেইসঙ্গে অবশ্যই সেইসব পুরুষদেরও যাঁরা নারীর এই সম উপার্জন, নির্বাচনের সমতা, সম অধিকারের লড়াইয়ে তাঁদের পাশে থাকেন।"

শ্রীমতী ইন্দ্রাণী চক্রবর্তী, হেড-এইচ আর, সি কে বিড়লা হাসপাতাল



বুলানের ছবি

সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়

অফিস ফেরত ট্রেন থেকে স্টেশনে নামতে যাচ্ছে ধ্রুব, ফোন এল মোবাইলে। এখন ধরা যাবে না। ভিড়, ধাক্কাধাক্কি কাটিয়ে দেখতে হবে কে করল ফোনটা। সম্ভবত পলিই করেছে। বাড়ি ঢোকার আগে হয়তো কিছু কিনে নিয়ে যেতে হবে।

ফোন কেটে গেছে। প্ল্যাটফর্মে নেমে ফাঁকায় এসে প্যান্টের পকেট থেকে মোবাইল বের করে ধ্রুব। নাহ্‌, বউয়ের কল নয়। মিসড কলে নাম নেই, শুধু নাম্বার এবং সেটা অবন্তীর। একটু বিরক্তই হল ধ্রুব, এখন আবার কী দরকার পড়ল? অবন্তীর নামটা ধ্রুব ফোনে সেভ করেনি পলির কারণে। ধ্রুব চায় না পলি জানুক বহু বছর পর আবার অবন্তীর সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছে তার। প্রায় বছর পনেরো পর। এই যোগাযোগ পলির মনে আশঙ্কার মেঘ জমা করে দিতে পারে। বেচারি এমনিতেই চাকরি, সংসার, ছেলে মানুষ করা নিয়ে ব্যতিব্যস্ত থাকে। এরপর যদি বরের এক্সট্রাম্যারিটাল অ্যাফেয়ার নিয়ে ভাবতে হয়, তাহলে হয়ে গেল!

বিয়ের আগে যখন ধ্রুব আর পলির জমজমাট প্রেম চলছে, উদয় হল অবন্তী। বন্ধু কুন্তলের সঙ্গে ওদের বাড়ি গিয়ে দেখা হয়েছিল অবন্তীর সঙ্গে। অবন্তীর প্রতি এক ধরনের মুগ্ধতা তৈরি হয়েছিল ধ্রুবর। ঠিক অবন্তীর প্রতি নয়, ওর গানের প্রতি। অবন্তীর কথা পলিকে বলেছিল ধ্রুব। বোধহয় একটু বেশিবার বলা হয়ে যাচ্ছিল। ততদিনে পলি অবন্তীর স্টেজ পারফরম্যান্স দেখেছে, ধ্রুবই নিয়ে গিয়েছিল দেখতে। অবন্তীর ব্যাপারে ধ্রুবর আগ্রহের আতিশয্য দেখে পলি একদিন বলেই বসল, "তোমার হাবভাব কিন্তু আমার সুবিধের ঠেকছে না। অবন্তীর প্রেমে পড়ে যাচ্ছ না তো? পড়লে, একটু আগে থাকতে বলো। আমাকে প্রস্তুত হতে হবে। সময় লাগবে আমাদের বিচ্ছেদটা মেনে নিতে।" সরাসরি কথা বলাটাই পলির স্বভাব। ধ্রুব হেসে উড়িয়ে দিয়েছিল ওর সংশয়। বলেছিল, "আমার প্রতি এত ঠুনকো বিশ্বাস তোমার! আরে বাবা, অবন্তীর গানটুকুই আমার ভাল লাগে। কোনও আর্টিস্টের গান ভাল লাগলে বলব না!"

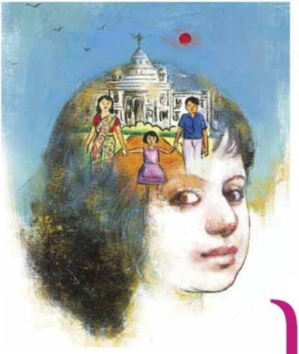
পলির উত্তর ছিল," ফাংশনে তো দেখলাম, মেয়েটা দেখতেও বেশ ভাল। গানের সূত্র ধরে ওর প্রেমে পড়ে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। তার উপর আবার তুমি যে হারে ওদের বাড়িতে যাতায়াত শুরু করেছ..."
ধ্রুব তখন বলে, "সর্বনাশ করেছে! তুমি তো দেখছি অবন্তীকে নিয়ে সিরিয়াসলি চিন্তাভাবনা শুরু করেছ! একটা কথা ভাবছ না, আমার যদি সত্যিই ওরকম কোনও ফিলিংস তৈরি হত, আমি কি ওর প্রসঙ্গ বারবার তোমার কাছে তুলতাম? জাস্ট চেপে যেতাম।"
মুখটা গোমড়া করে থাকলেও এরপর আর কিছু বলেনি পলি। ধ্রুব কিন্তু চেপে যাওয়ার রাস্তাই নিয়েছিল। অবন্তীর রেওয়াজের সময় প্রায় নিয়মিত যেত ওদের বাড়ি... হাঁটতে হাঁটতে প্ল্যাটফর্মের শেষ প্রান্তে চলে এসেছে ধ্রুব। আবার বেজে উঠল ফোন। মোবাইল হাতে ধরাই ছিল। চোখের সামনে এনে দেখে অবন্তী ফের কল করেছে। কল রিসিভ করে ধ্রুব বলে, "হ্যাঁ, বলো!"
অপর প্রান্তে অবন্তী লঘু স্বরে অভিযোগ করে, "আগের কলটা ধরলে না যে বড়!"
"ট্রেনে ছিলাম। এই তো নামলাম।"
"একবার ঘুরে যাবে আমার বাড়ি থেকে?"
"কেন?"
"মেয়েটা বড্ড বায়না করছে। তোমাকে একটা জিনিস দেখাবে। খালি বলছে, 'ধ্রুবমামাকে একবার ডাকো।'"
"জিনিসটা কী?"
"যদি ইচ্ছে হয় আসার, এসেই না হয় দেখো।"
একটু সময় নেয় ধ্রুব। বলে, "আচ্ছা, যাচ্ছি।"
দেবনগর স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম থেকে নেমে এল সে। বাঁ হাতি রাস্তায় সাত-আট মিনিট হেঁটে গেলে অবন্তীর ভাড়াবাড়ি। আর ডানদিকে রেললাইন পেরিয়ে মিনিট কুড়ি দূরত্বে ধ্রুবর বাড়ি। পথটুকু ধ্রুব অটোরিকশায় যায়। এখন যদিও বাঁ হাতি রাস্তাই ধরল। কিন্তু অবন্তীর মেয়ে বুলান তাকে কী দেখাবে বলে জেদ ধরেছে, বোঝা যাচ্ছে না। নাকি এটা অবন্তীর ছল? জানে, বাচ্চা মেয়েটার আবদার এড়াতে পারবে না ধ্রুব।

ধ্রুব এখন ঘোরতর সংসারী মানুষ। বারো বছরের একটি ছেলে আছে তার। এ ধরনের লুকোচুরির আর কোনও মানে হয় না।



আজ নিয়ে চারদিন হবে অবন্তীর ভাড়াবাড়িতে যাওয়া। ব্যাপারটা মোটেই স্বস্তিকর হচ্ছে না। পলি জানে ক'টা নাগাদ ধ্রুব বাড়ি ফেরার লোকাল ধরে হাওড়া স্টেশন থেকে। ফিরতে দেরি হলে অথবা বাড়ির জন্য কিছু আনার থাকলে ফোন করে। গত তিনদিনের মধ্যে দু'বার অবন্তীর বাড়ি থাকাকালীন পলির ফোন এসেছিল। ধ্রুব বলতে পারেনি, কোথায় আছে সে। বানিয়ে দু'বার দু'রকম জায়গার নাম নিয়েছিল। এখন মনে হচ্ছে, ভুল করেছে। পনেরো বছর পর অবন্তীর সঙ্গে দেখা হওয়াটা পলিকে প্রথমদিনই বলে দিলে ভাল হত। ধ্রুব এখন ঘোরতর সংসারী মানুষ। বারো বছরের একটি ছেলে আছে তার। এ ধরনের লুকোচুরির আর কোনও মানে হয় না। কেন অবন্তীর কথা প্রথমেই বলল না পলিকে? মনের গভীরে একটা আশঙ্কা নিশ্চয়ই তৈরি হয়েছিল ধ্রুবর। ভেবেছিল পলি হয়তো বারণ করবে অবন্তীর সঙ্গে আবার দেখা করতে। এদিকে দ্বিতীয়বার দেখা করার কৌতূহল দমন করতে পারেনি ধ্রুবও।
ঘটনার সূত্রপাত দিনদশেক আগে। ধ্রুব অফিস যাওয়ার জন্য স্টেশনে এসেছে। অপেক্ষা করছে ডাউন লোকালের। হঠাৎই দৃষ্টি থমকায় আপ প্ল্যাটফর্মে, অবন্তী না? একটু খুঁটিয়ে দেখে বুঝেছিল হ্যাঁ, অবন্তীই। চেহারা প্রায় একই রকম। বোঝাই যাবে না মাঝে পনেরোটা বছর পার হয়ে গেছে। তবে সব মিলিয়ে একটু যেন অনুজ্জ্বল! অত্যন্ত সাধারণ একটা শাড়ি ছিল পরনে। এত সাদামাটা পোশাক আগে পরত না অবন্তী। শাড়ি বা সালোয়ার-স্যুট যাই পরত, তার মধ্যে একটা অভিজাত ঝকমকে ভাব থাকত। ক্ল্যাসিকাল গাইত। পোশাকে এবং শরীরী ভঙ্গিতে থাকত ধ্রুপদিয়ানার জৌলুস। সেটা বিগত পনেরো বছরে উধাও হল কেন? এসব ভাবতে ভাবতে হঠাৎই ধ্রুবর চোখাচোখি হয়ে গেল অবন্তীর সঙ্গে। একটু চমকে উঠে হাতের ইশারায় ডাকতে থাকল ধ্রুবকে, যেন খুব আর্জেন্ট। লোকালটা মিস করলে অফিস ঢুকতে লেট হয়ে যাবে জানে, তবু 'আসব না' তো বলা যায় না। কত বছর পর দেখা! ইশারায় "আসছি" বলে ধ্রুব আপ প্ল্যাটফর্মের উদ্দেশে হাঁটা দিয়েছিল।
অবন্তীর সামনে গিয়ে যখন দাঁড়াল, দেখেছিল পনেরো বছরে বিশেষ কোনও বদল না হলেও আত্মগরিমার পরতটা পুরোপুরি উধাও, যে ভঙ্গিটাকে অনেক সময় অহঙ্কার বলে মনে হত। মলিন হাসি হেসে অবন্তী বলেছিল, "এখানে চলে আসার পর থেকে তোমাকে খুঁজছি। পথেঘাটে যদি দেখা হয়ে যায়..."
খানিক অবাক হয়ে ধ্রুব বলেছিল, "তোমরা কি আসানসোল থেকে শিফট করে এলে?"
"তোমরা বলতে আমি আর মেয়ে। সন্দীপের সঙ্গে আর থাকা গেল না।", বলেছিল অবন্তী।
খবরটা একেবারেই ভাল নয়। চুপ করেছিল ধ্রুব। অবন্তীর যে মেয়ে আছে, এই তথ্যও ছিল না ধ্রুবর কাছে। খোঁজ নেওয়া হয়নি। যাকে বিয়ে করেছে অবন্তী, তাকে চিনত ধ্রুব। কুন্তলদের বাড়িতে দেখেছে। ফের অবন্তীই বলে উঠেছিল, "তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে ধ্রুবদা। একদিন এসো না বাড়িতে।"
ধ্রুব বলেছিল, "যাব, সামনের রোববার সকালের দিকে যাব না হয়।"
উত্তরে অবন্তী বলে, "তুমি নিশ্চয়ই আমাদের মনসাতলার বাড়িতে যাওয়ার কথা ভাবছ। আমি কিন্তু ওখানে থাকি না। শান্তি কলোনির একটা বাড়ির নীচের তলায় ভাড়া থাকি।"
"মনসাতলার বাড়িতে থাক না কেন?", বিস্ময় প্রকাশ করেছিল ধ্রুব।
অবন্তী বলল, "সন্দীপের সঙ্গে যখন অশান্তি চলছে, মাঝে মাঝে ও বাড়ি গিয়ে থাকতাম। থাকাটা পছন্দ করত না দাদা-বউদি। বাবা বেঁচে থাকলে আমার অধিকারটা ফলাতে পারতাম। আর মা যে কেমন নিরীহ প্রকৃতির তুমি তো জানোই। তাই যখন ঠিক করলাম দেবনগরে এসে সেটেলড হব, ভাড়াবাড়িতে থাকার সিদ্ধান্ত নিলাম।"
আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল অবন্তী, বর্ধমান লোকালের অ্যানাউন্সমেন্ট হল। অবন্তী তড়িঘড়ি নিজের ফোন নাম্বারটা ধ্রুবকে দিয়ে বলেছিল, "যত তাড়াতাড়ি সম্ভব একদিন এসো বাড়িতে। ফোন কোরো, বলে দেব কী ভাবে আসতে হবে।"
প্ল্যাটফর্মে ঢুকে পড়েছিল ট্রেন। লেডিস কম্পার্টমেন্টে উঠে গিয়েছিল অবন্তী। ধ্রুবর হতভম্ব অবস্থা! অবন্তীর মতো একটা উজ্জ্বল, সুখী মেয়ের উপর দিয়ে এত ঝড় ঝাপটা বয়ে গেছে! ডাউনের ট্রেন ধরার জন্য তাড়াতাড়ি পা চালিয়েছিল ধ্রুব। অফিস

যাওয়ার দু'টো লোকাল ততক্ষণে ও মিস করে ফেলেছে। সেদিন আর অফিসের কাজে মন বসাতে পারছিল না ধ্রুব। অবন্তী তার মাথায় অনেক প্রশ্নের উদ্রেক করে গেছে। হিসেব মিলছে না বহু কিছুর। ধ্রুব বুঝতে পারছিল উত্তর পেতে অবন্তীর কাছে তাকে যেতেই হবে। কুন্তল তার বোনকে বাড়িতে থাকতে দিতে চায় না, মানতে অসুবিধে হচ্ছিল ধ্রুবর। এ ছাড়াও সন্দীপ, মানে অবন্তীর বর মানুষটিও অত্যন্ত ভদ্র, দিলখোলা লোক। কুন্তলদের বাড়ি যখন যেত ধ্রুব, সন্দীপকে দেখেছে। সন্দীপদা বলত। বয়সে অনেকটাই বড়। কুন্তলের বাবার অফিসের স্টাফ সন্দীপদা। অবন্তীদের বাড়িতে তার ছিল অবাধ যাতায়াত। কিন্তু ওই মানুষটার সঙ্গে অবন্তী যে বিয়ের মতো রিলেশনে জড়িয়ে পড়তে পারে, এমন কোনও আগাম



বরং সে একটু অসতর্ক হয়ে পড়েছিল। অবন্তীকে নিভৃতে পেলে ঠাট্টার ছলে কখনও চুমু, কখনও বা গাল ধরে আদর করত ধ্রুব।

আভাস পায়নি ধ্রুব। ধীরে ধীরে একটা সময়ের পর ধ্রুব অবন্তীদের বাড়ি যাওয়া বন্ধ করে দেয়। টের পাচ্ছিল অবন্তী প্রতিশ্রুতি চাইছে সম্পর্কটা থেকে। চাকরি পেয়ে পলিকে বিয়ে করার এক বছর পর ধ্রুবর কানে এল অবন্তী বিয়ে করছে সন্দীপদাকে। খবরটা শুনে অবাক হয়েছিল খুব! তবে ব্যাপারটা নিয়ে একেবারেই মাথা ঘামাতে চায়নি। কুন্তল এবং ওদের বাড়ির সকলেই নিশ্চয়ই ভুলতে চেয়েছে ধ্রুবকে, তাই অবন্তীর বিয়ের নিমন্ত্রণ আসেনি। কুন্তলের থেকে ওই সেজন্য আশা করেনি ধ্রুব। একেবারে ছোট থেকে বন্ধুত্ব তো নয় তাদের। আলাপ হয়েছিল কলেজ বয়সের শেষে, কলকাতার এক আর্টিস্ট ক্যাম্পে। ধ্রুব, কুন্তল দু'জনেই ক'দিন ধরে ছবি আঁকছিল ওখানে। কুন্তল তখন আর্ট কলেজে পড়ে। ধ্রুব জেনারেল স্ট্রিম। ভাল ছবি আঁকত বলে চান্স পেয়েছিল ওই ক্যাম্পে। কুন্তলই প্রথম এগিয়ে এসেছিল ধ্রুবর কাছে। বলেছিল, "অ্যাই, তুমি দেবনগরে থাক, তাই না?"

মাথা নেড়ে সায় দিয়েছিল ধ্রুব। কুন্তল বলল, "তাই বলি, এত চেনা চেনা লাগছে কেন? আমি তো দেবনগরেরই ছেলে। তোকে রাস্তাঘাটে দেখেছি। কিন্তু তুইও যে ছবি আঁকিস, জানতাম না তো!" 'তুমি' থেকে চট করে 'তুই'তে গিয়ে ধ্রুবকে আপন করে নিয়েছিল কুন্তল। ওর প্রশ্নের উত্তরে ধ্রুব বলেছিল, "আমি লুকিয়ে চুরিয়ে আঁকি। আর্ট কলেজে পড়ি না তো। দেবনগরের আঁকার সার্কেলে তাই আমাকে দেখা যায় না। তবে আমরা যখন একই এলাকার, তোকে কখনও দেখিনি কেন?"

"দেখার মতো চেহারা নয় বলে", কথা শেষ করে প্রাণখোলা হাসি হেসেছিল কুন্তল।

ক্যাম্পের দিনগুলোয় বন্ধুত্ব গাঢ় হল। পলি একদিন এসেছিল ওখানে। কুন্তলের সঙ্গে আলাপ করাল ধ্রুব। ক্যাম্পের শেষ দিনে কুন্তল বলল, " চল, আজ আমাদের বাড়িতে চল। পরে তোদের বাড়িতে একদিন যাব।"

কুন্তলদের বাড়িটা ধ্রুবদের দত্তপাড়া থেকে অনেকটাই দূরে। জি টি রোড ধরে বাসে করে গেলে চারটে স্টপ। এতদিন অপরিচিত থাকার এটাও একটা কারণ।

ক্যাম্প থেকে সরাসরি কুন্তলের সঙ্গে ওদের বাড়ি গিয়েছিল ধ্রুব। দুই বন্ধুর কাঁধ ব্যাগে আঁকার সরঞ্জাম। মনসাতলার বিশাল দোতলা বাড়ির নীচতলার গেট যখন খুলছে কুন্তল, ভিতর থেকে ভেসে আসছিল নারীকণ্ঠের রাগসংগীত। এত পরিশীলিত সেই গায়নভঙ্গি, মনে হচ্ছিল দামি মিউজ়িক সিস্টেমে বিখ্যাত কোনও শিল্পীর গান বাজছে।

সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠতে উঠতে ভুল ভেঙেছিল ধ্রুবর। গান ততক্ষণে জীবন্ত! কুন্তলকে জিজ্ঞেস করেছিল, "কে গাইছে রে? দারুণ গাইছে তো!"

"আমার বোন। চল, আলাপ করিয়ে দিই,", বলেছিল কুন্তল। বন্ধ ঘরে তানপুরা ছেড়ে বিলম্বিতে আলাপ করছিল অবন্তী। কী রাগ গাইছিল আন্দাজ করতে পারছিল না ধ্রুব। গান বিষয়ে তার সামান্য কিছু ধারণা আছে। দরজা ঠেলে অবন্তীর ঘরে ঢুকেছিল কুন্তল। পিছনে ধ্রুব। গান থামিয়ে অবন্তী বিস্ময়ের দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল ধ্রুবর দিকে। ধ্রুব তখন অবন্তীকে ঝাপসা দেখছে। দেখতে পাচ্ছে ঘরে থই থই করছে সুর।

কুন্তল তার বোনের সঙ্গে আলাপ করাল, "এ হচ্ছে ধ্রুব। দারুণ আঁকে। ক্যাম্পে প্রথম আলাপ হল, অথচ থাকে এই শহরেই। আমার মতো পোড়া কপাল ওর নয়। দারুণ দেখতে গার্লফ্রেন্ড আছে। ঘুরে গেছে একদিন ক্যাম্পে।"

গার্লফ্রেন্ডের প্রসঙ্গটা না তুললেও চলত। তথ্যটা কুন্তল দিয়ে রেখেছিল এই কারণে, বোন যাতে কোনও ভুল না করে বসে। ধ্রুব তখন সুরের জালে আবিষ্ট। পরিচিতি পর্ব বাড়তে না দিয়ে অবন্তীকে জিজ্ঞেস করেছিল, "এটা কী রাগ গাইছিলে?"

"পূরবী। কেন?", একটু অবাক হয়ে জানতে চেয়েছিল অবন্তী। ধ্রুব বলেছিল, " খুব চেনা চেনা লাগছিল সুরটা। রাগটা মনে করতে পারছিলাম না।"

ধ্রুবকে পরীক্ষা করার জন্য অবন্তী বলেছিল, "পূরবীর অবরোহণ, আরোহণ বলতে পারবে?"

বলে দিয়েছিল ধ্রুব। ইমপ্রেসড হয়ে পূরবী রাগে একটা গানই শুনিয়ে দিয়েছিল সে। দু'জনের মধ্যে জমে গেল খুব। কুন্তলের থেকে অবন্তীই বেশি বন্ধু হয়ে গিয়েছিল ধ্রুবর। তা নিয়ে কুন্তলের তো বটেই, অবন্তীর বাবা-মা'রও কোনও সমস্যা ছিল না। নাকি ওরা আশা করত পলিকে ছেড়ে অবন্তীকেই জীবনসঙ্গী হিসেবে বেছে নেবে ধ্রুব? তাই এত ছাড় দিত বাড়ির লোক? ভাবনাটা মাথায় এলেও যাচাই করার ইচ্ছে জাগেনি ধ্রুবর। বরং সে একটু অসতর্ক হয়ে পড়েছিল। অবন্তীকে নিভৃতে পেলে ঠাট্টার ছলে কখনও চুমু, কখনও বা গাল ধরে আদর করত ধ্রুব। নিজেকে

সরিয়ে না নিলেও অবন্তী কিন্তু বলত, "আমার কাছে তোমার অনেক ধার হয়ে যাচ্ছে ধ্রুবদা। পরে শোধ দিতে পারবে তো?" অর্থাৎ সম্পর্কটার স্বীকৃতি চাইত অবন্তী। যা দেওয়া সম্ভব ছিল না ধ্রুবর পক্ষে। ভবিষ্যৎ নিয়ে পলির সঙ্গে তার যে তখন অনেক প্ল্যান। পলি ভাল রেজাল্ট করা মেয়ে, সরকারি চাকরি পাবেই। ধ্রুবর মার্কস তেমন নয়, হয়তো একটা প্রাইভেট কোম্পানির চাকরি জুটবে। বিয়ের পর পলির চাকরির কারণেই আর্থিক অনিশ্চয়তায় ভুগতে হবে না। তা ছাড়া পলির ভালবাসায় তো কোনও খাদ নেই। কোন অজুহাতে পলির থেকে সরে আসবে ধ্রুব?

এ সব কারণে অবন্তীর সঙ্গে বন্ধুত্বটা স্থায়ী হল না। ধ্রুব নিজের থেকেই সরে এল। ভেবেছিল ওদের বাড়িতে যাচ্ছে না দেখে অবন্তী কুন্তলকে পাঠাবে খোঁজ নিতে। অথবা নিজেই যোগাযোগ করার চেষ্টা করবে। সেরকম কিছু ঘটল না। ওরা হয়ত ধ্রুবকে পাত্র হিসেবে ততটা যোগ্য বলে মনে করেনি। ধরে নিয়েছিল সম্পর্কটা হলে ভাল, না হলেও ক্ষতি নেই। পরিষ্কার মাথায় বিচার করলে ধ্রুবর সঙ্গে বিয়ে হলে স্টেটাস কিছুটা নামত অবন্তীর। ওর বাবা মাল্টিন্যাশানাল কোম্পানির অফিসার, ওদের গাড়ি আছে। অবন্তী রবীন্দ্রভারতীতে পড়তে যেত বাড়ির গাড়িতে। কাকাবাবু কোম্পানির গাড়িতে অফিস যাতায়াত করতেন। তুলনায় ধ্রুবরা অত্যন্ত সাধারণ পরিবার। বাবা চাকরি করতেন মাঝারি একটা চা কোম্পানিতে, হেড ক্যাশিয়ার। ধ্রুবরা দু'ভাই, এক বোন। ধ্রুব বড়। বোনের বিয়ে তখন বাকি। দামি চাকরি জোগাড় করার ক্ষমতা ধ্রুবর নেই। অবন্তীরা হিসেব কষেই ধ্রুবর ব্যাপারে আর আগ্রহ দেখায়নি। ওই বাড়ির মেয়ে হয়ে অবন্তীর এখন কী নিষ্প্রভ অবস্থা! তুলনায় ধ্রুবরা এখন অনেক সচ্ছল। এর জন্য অবশ্য পলির সরকারি স্কুলের চাকরিটার অবদান বেশি। স্কুলটা আবার দেবনগরেই। ভাই আর ধ্রুব দু'জনেই প্রাইভেট কোম্পানি। বোনের বিয়েটা বাবার জমানো টাকাতেই হয়েছে। বিয়ে করেছে ভাইও। বাবা-মা দুই পুত্রবধূর সেবাযত্নে দিন কাটাচ্ছেন। এককথায় বলতে গেলে ধ্রুবদের এখন সুখের সংসার।

অবন্তীর জীবনের চাকাটা উলটোদিকে ঘুরল কেন, ধ্রুবর জানতে ইচ্ছে করছিল খুব। একদিন অফিস ফেরত ফোন করল অবন্তীকে, "সন্ধেবেলা যাচ্ছি তোমার বাড়িতে। থাকছ তো?"

খুব খুশির সঙ্গে "থাকছি" জানিয়ে বাড়ির রাস্তা বলে দিয়েছিল অবন্তী। ওর বাড়িতে ঢোকার আগে মনে করে চকোলেট বার কিনেছিল ধ্রুব, অবন্তীর মেয়ের জন্য। আজকেও কিনতে হবে। বাড়ির গলির মুখেই একটা দোকান আছে।

অবন্তীর কাছে যাওয়ার জন্য সন্ধের সময়টা ভেবেচিন্তে বেছেছিল ধ্রুব। যেহেতু দেবনগরে বড় হয়েছে, এলাকার অনেকেই তাকে চেনে। দিনের বেলা অবন্তীর ভাড়াবাড়িতে গেলে কিছু লোক সাক্ষী থেকে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে।

বাড়িটায় গিয়ে ধ্রুব প্রথমবার বেশ ধাক্কা খেয়েছিল। ভাড়া নির্ঘাত খুব কম। সিমেন্টের মেঝে, স্ল্যাব এবং সিঙ্ক নেই রান্নাঘরে। কাঠের টেবিলের উপর গ্যাস আভেন। কোমড নেই টয়লেটে, ইন্ডিয়ান স্টাইল। দেওয়ালের সস্তা রঙের কারণে ঘরের আলোও বুঝি কম। বৈভবে বড় হওয়া অবন্তী এই অবস্থার সঙ্গে কী ভাবে মানিয়ে নিচ্ছে, ভেবে বেশ আশ্চর্য হয়েছিল ধ্রুব! ওর বাড়িতে একটাই খুব সজীব অংশ, বুলান, অবন্তীর মেয়ে। অপরিচিত ধ্রুবকে দেখে প্রথমটায় একটু চুপচাপ ছিল। তারপর খুব দ্রুতই আড়ষ্টতা ভেঙে জুড়ে দিল গল্প। ক্লাস থ্রিতে পড়ে মেয়েটা। মাথায় একঢাল চুল। মায়ের মতো ফরসা রং না পেলেও, মুখটা ভারী মিষ্টি!

অবন্তীর থাকার ঘর বলতে একটাই। ওই ঘরেই মেয়েকে টেবিলে পড়তে পাঠিয়ে নিজের ভাগ্য বিপর্যয়ের কথা নিচু গলায় বলতে শুরু করেছিল। বিপর্যয়ের প্রাথমিক দায় নাকি ধ্রুবরই। সে যদি অবন্তীদের বাড়ি যাওয়া বন্ধ না করে দিত, সন্দীপের সঙ্গে বিয়েটা হত না। বিয়ে না করে ধ্রুবর সঙ্গে শুধু বন্ধুত্ব রেখে জীবনটা কাটিয়ে দিত সে। সন্দীপকে বিয়ে করেছিল ধ্রুবর প্রতি অভিমান থেকে। অনেক দিন আগে থেকেই সন্দীপ প্রপোজ় করে যাচ্ছিল তাকে। বিয়ের পর সন্দীপের পৈতৃকবাড়ি আসানসোলে গিয়ে ওঠে অবন্তী। সন্দীপের যেহেতু কলকাতায় অফিস, কাছাকাছি একটা মেসে থাকত। সপ্তাহান্তে যেত বাড়ি। হঠাৎই চাকরি গেল সন্দীপের। বলল, "অফিস লোক কমাচ্ছে।" সত্যিটা জানল অবন্তী নিজের বাবার থেকে। দুর্নীতির কারণে চাকরি গেছে সন্দীপের। সন্দীপকে বলতে, সে অস্বীকার করল কথাটা। বলল, তাকে চক্রান্ত করে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে যে সব অ্যালিগেশন খাড়া করা হয়েছে, তা অনায়াসে খণ্ডাতে পারতেন অবন্তীর বাবা। উনি কিছু করেননি, হাত গুটিয়ে বসে থাকলেন। কথাটা নিজের বাড়ির লোকেদের বোঝাতে সমর্থ হল সন্দীপ। ওই বাড়িতে থাকার ইচ্ছে হারিয়ে ফেলল অবন্তী। মনসাতলার বাড়ি এসে থাকত। ফেরত নিতে আসত সন্দীপ। বেশ ক'বার ফিরেও গেছে অবন্তী। কিন্তু নিজের বাড়িতে গিয়ে সন্দীপের অন্য রূপ। মদের নেশা আগে ছিলই, চাকরি যাওয়ার পর থেকে বেড়েছে ক্রমশ। মদ খেয়ে মানসিক ও শারীরিক অত্যাচার করত সন্দীপ। পরে আবার ক্ষমাও চাইত। ওদের পারিবারিক চালু ব্যবসা আছে সেখানেও কাজে গোলমাল পাকাত। অন্যান্য ভাই-রা ওকে বিজ়নেস থেকে দূরে রাখত। সামান্য মাসোহারা দিত। এইভাবে বছর কাটতে লাগল। জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠছিল অবন্তীর। এরই মধ্যে অবন্তীর বাবা মারা গেলেন। মাঝে মাঝেই মেয়ে নিয়ে অবন্তীর বাপের বাড়ি ওঠা ভাল মনে নিচ্ছিল না দাদা-বউদি। কথা শোনাচ্ছিল। অবন্তী সিদ্ধান্ত নেয় মেয়ে নিয়ে আলাদা থাকবে। ডির্ভোস চাইবে সন্দীপের কাছে। উকিলের চিঠি পাঠিয়ে অবন্তী দেবনগরে চলে এসেছে। সন্দীপ ডির্ভোস দিতে রাজি নয়। এতদূর শুনে ধ্রুব জানতে চেয়েছিল, "তোমার এখন চলছে কী করে?"

অবন্তী জানাল, আসানসোলে থাকতেই সে দুটো গানের স্কুল গান শেখাত। একটা বর্ধমানে, অন্যটা চিত্তরঞ্জনে। দু'টোই এখনও চালাচ্ছে। এছাড়া বাবার থেকে বেশ কিছু টাকা পেয়েছে, যেটা ফিক্সড ডিপোজ়িট করা আছে ব্যাঙ্কে। ওখান থেকে মাসে মাসে ইন্টারেস্ট পায়। মেয়ের ভুল বিয়ে হয়ে গেছে দেখে কাকাবাবু টাকাটা ফিক্সড করে দেন।

এরপর ধ্রুব জিজ্ঞেস করে, "তুমি তো গানের স্কুলের কাছাকাছি কোথাও ভাড়া থাকতে পারতে, যাতায়াতে সুবিধে হত। দেবনগরে চলে এলে কেন?"

অবন্তী বলেছিল, "দেবনগর আমার নিজের জায়গা। এখানে বড় হয়েছি। বিপদে পড়লে পাশে লোকজন পাব। বর্ধমান, চিত্তরঞ্জন সন্দীপের এলাকা। ওখানে আমাকে তিষ্ঠোতে দিত না। হানা দিত মাঝে মাঝে। এখানে এতটা সাহস পাবে না। এছাড়াও দেবনগরে গানের টিউশন করার ইচ্ছে আছে আমার। আমি কেমন গাইতাম, এখানকার লোক সব চেয়ে ভাল জানে।"

কথার মাঝে পড়া দেখাতে উঠে আসছিল বুলান। অবন্তী চা করে খাওয়াল। এক সময় ফোন এল পলির, "কোথায় আছ?" ধ্রুব বলেছিল, "ট্রেন থেকে নেমেছি। টিভির কেবল অফিসে এসেছি পেমেন্ট করতে। কেন? কিছু আনতে হবে?"

"না, দেরি হচ্ছে দেখে ফোন করলাম।", বলেছিল পলি। ফোন কেটে ধ্রুব অবন্তীকে বলে, "উঠতে হবে এবার।"

অবন্তী বলল, "সে তো বুঝতেই পারছি। আবার কবে আসবে?"

"আসব একদিন সময় করে। আজ তোমার গানটাই শোনা হল না।", বলে দরজার দিকে এগিয়ে ছিল ধ্রুব।

আক্ষেপের সুরে অবন্তী বলে উঠেছিল, "হ্যাঁ, সত্যি! আজ শুধু

দুঃখের পাঁচালিই গেয়ে গেলাম। আমার এক সময়ের মুগ্ধ শ্রোতাকে কিছু শোনাতে পারলাম না। টাইমটা কেমন হুস করে কেটে গেল! তাড়াতাড়িই এসো আবার।"

অবন্তী এখন কেমন গায়? উচ্চাঙ্গসঙ্গীতে বুঁদ হওয়ার মতো মনের অবস্থা এখনও কি আছে ধ্রুবর? অনেকদিন শোনা হয় না। অফিস আর বাড়িই তার জগৎ... এগুলো যেমন মাথায় ঘুরছিল ধ্রুবর, তার সঙ্গে আর একটা কৌতূহলও ছিল, অবন্তী তার কাছে কী চায়? কেন সান্নিধ্য পাওয়ার জন্য উদগ্রীব? আগের দিন ধ্রুব ওর সামনে পলিকে ফোনে মিথ্যে বলল। তা নিয়ে একটা কথাও বলেনি অবন্তী। জিজ্ঞেস করতে পারত, সত্যিটা চেপে গেলে কেন? তা হলে কি অবন্তী চায় নতুন করে এই যোগাযোগ গোপন থাকুক? চারদিন বাদ দিয়ে ধ্রুবই ফোন করে নিয়ে গিয়েছিল অবন্তীর বাড়ি। অবশ্যই অফিস ফেরত, সন্ধের আড়াল ব্যবহার করে। তানপুরা সহযোগে সেদিন গাইল অবন্তী। গলায় সেই আগের তেজ নেই। ভুল বিয়ে তার গানের ক্ষতি করেছে। তাও এখনও যা গায়, ঘোর লেগে যায় ধীরে ধীরে। ওই দিনে আর একটা জিনিস আবিষ্কার হল, বুলান আঁকে খুব সুন্দর। ওর ড্রয়িং শিট দেখতে দেখতে ধ্রুব অবন্তীকে বলেছিল, "মেয়েটা তো মামার গুণ পেয়েছে!"

অবন্তী বলল, "গানের গুণ পেলে ভাল হত, গাইড করতে পারতাম। ওর মামা তো কোনও খোঁজই নেয় না। আজ পর্যন্ত আসেনি এ বাড়িতে। মা অবশ্য দু'বার ঘুরে গেছে। বউদি সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল।"

ধ্রুব এখন আর আঁকে না। একসময় তো আঁকত। আঁকা নিয়ে অল্প বিস্তর গাইড করল বুলানকে।

সেদিন অবন্তীর বাড়ি থেকে বেরতেই সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন বছর ষাটেকের এক ভদ্রলোক। বললেন, "আমি এ বাড়ির মালিক, মানে বাড়িওয়ালা। একটা কথা ছিল আপনার সঙ্গে।"

পরিচয় শুনে প্রমাদ গুনেছিল ধ্রুব। এক্ষুনিই হয়তো ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করবেন ধ্রুব অবন্তীর কে হয়? কিন্তু সেদিকে গড়াল না প্রসঙ্গ। বাড়িওয়ালা বললেন, "ভাড়া নেওয়ার সময় উনি বলেছিলেন গান শেখান। আজ প্রথম গাইলেন এ বাড়িতে। কী অপূর্ব গান! আপনি নিশ্চয়ই ওঁরা রিলেটিভ হন। মাঝে মাঝে আসবেন। আমাদেরও গান শোনা হবে।"

সন্ধের আলো আঁধার কাজে লাগল না। ভদ্রলোক চিনে রাখলেন ধ্রুবকে। কোনওদিন যদি দিনের আলোয় পলি, ধ্রুবকে রাস্তায় হেঁটে যেতে দেখে ভদ্রলোক এগিয়ে আসেন কথা বলতে, পলিকে ওঁর পরিচয় দিতে সমস্যায় পড়ে যাবে ধ্রুব।

এত লুকোচুরি পোষায় না। ধ্রুব ঠিক করে নিয়েছিল আর যাবে না অবন্তীর বাড়ি। ক'দিন যেতে না যেতে ফোন করল অবন্তী, "আজ একবার অফিস ফেরত আসতে পারবে? সকাল থেকে বিনা কারণে প্রস্তাবটায় 'না' বলতে পারল না ধ্রুব। তার কেন জানি মনে হচ্ছিল অবন্তী পনেরো বছর আগের সম্পর্কে ফিরে যেতে চায়। ঠাট্টার ছলে সেই শরীর ছোঁয়াছুঁয়ির সম্পর্ক। এখন আরও সাহসী হতে পারবে অবন্তী। কারণ, সে এখন নিজের জীবন নিজেই নিয়ন্ত্রণ করছে। তবে অবন্তী ওই সম্পর্কে যেতে চাইলেই যে ধ্রুব সায় দিতে পারবে, তার কোনও নিশ্চয়তা নেই। গোছানো একটা সংসার আছে ধ্রুবর। সেটা সে অগোছালো করতে চায় না। কিন্তু অবন্তী ঠিক কী চায়, জানার জন্য কৌতূহল হচ্ছিল খুব।

ধ্রুব যেমনটা ভাবছিল, তৃতীয় দিনে সেরকম কিছু হল না। আড্ডা-গান হল, বুলানকে আঁকা শেখাল ধ্রুব। বাচ্চাটার এই বয়সেই প্রপোর্শন সেন্স দারুণ। ল্যান্ডস্কেপের উপর হিউম্যান ফিগার বেশি করে আঁকতে বলল ধ্রুব। পলির ফোন এসেছিল, আবারও মিথ্যে বলতে হল। অবন্তী সেদিন গান শুরু করতেই বাড়িওয়ালা বউ-মেয়ে সমেত নীচের তলায় নেমে এলেন। দাদার বন্ধু এবং আমারও বন্ধু পরিচয় দিয়ে ধ্রুবর সঙ্গে বাড়িওয়ালার ফ্যামিলির আলাপ করাল অবন্তী। আশঙ্কিত হচ্ছিল ধ্রুব, সে যে এবাড়িতে আসছে, তার সাক্ষী বাড়ছে ক্রমশ। কোনও ভাবে যদি কথাটা কানে যায় পলির, কী জবাব দেবে ধ্রুব? তা ছাড়া কুন্তল ব্যাপারটা জানলে কী ভাববে? আমার কাছে আসার নাম নেই, বোনের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে! মাথায় বদ মতলব আছে নির্ঘাত।... আর অবন্তীর বাড়ি যাওয়া যাবে না, বুঝে যায় ধ্রুব। তবু আজ আসতে হল। বুলানের আবদার। নাকি অবন্তীর ছল?... অবন্তীর ভাড়া বাড়ির গলির মুখে এসে পড়ল ধ্রুব। দোকানটার দিকে পা বাড়ায়। চকোলেট নিতে হবে বুলানের জন্য।

বুলান বেশ কিছু ছবি এঁকেছে। সেগুলো ধ্রুবকে না দেখিয়ে শান্তি পাচ্ছিল না। মন দিচ্ছিল না হোমটাস্কে। বারবার মাকে বলেছে ধ্রুবমামাকে আসতে বলো। ধ্রুবর কোলে এখন বুলানের আঁকা চারটে ছবি। প্যাস্টেলে এঁকেছে। সাবজেক্ট— 'নিজের স্কুলের স্পোর্টস', যা দু'দিন আগে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ছবিগুলো খুবই ভাল এঁকেছে। ধ্রুব যেহেতু বেশি করে ফিগার আঁকতে বলেছিল। স্পোর্টসের ছবি বেছেছে সেই কারণে। তবে এই ছবি ক'দিন পরে দেখালেও তো চলত। বুলান এমন বায়না করল, অবন্তী ধ্রুবকে না ডেকে পারল না, এটা ঠিক যেন বিশ্বাস হচ্ছে না। আসলে ডাকার একটা অজুহাত পেয়ে গেছে অবন্তী।... ছবি দেখতে দেখতে প্রশংসা করেছে ধ্রুব। গায়ে ঠেস দিয়ে বসা বুলানের মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়েছে। ছবিগুলো বুলানের হাতে ফেরত দিয়ে ধ্রুব এখন অবন্তীকে বলে, "এবার থেকে ওকে ওয়াটার কালার দিতে হবে। হাত যথেষ্ট ম্যাচিওর হয়ে গেছে।"

"কে শেখাবে? তুমি তো আর নিয়ম করে এসে শেখাবে না, প্রত্যেক বার ডেকে পাঠাতে হবে।", বলল অবন্তী। ধ্রুব বলে, "দেবনগরে কি আঁকার স্কুল কম আছে! কোথাও একটা ভর্তি করে দাও। আর আমি যখন আসব। গাইড করে দেব।"

বলতে হয় বলেই বলল ধ্রুব, তবে সে আর এ বাড়িতে আসবে না। কিন্তু তার কথাগুলো অবন্তী কানে নিল বলে মনে হচ্ছে না। একটু অন্যমনস্ক থেকে বলতে থাকে, "শুধু আঁকায় ভাল হলে তো চলবে না। মেয়েটা লেখাপড়ায় ভীষণই উইক। ওকে দোষ দিতে পারি না। বাবা-মায়ের অশান্তির মধ্যে বড় হয়েছে। টানা স্কুল যেতে পারেনি। এ মাসে মামার বাড়ি তো, ও মাসে নিজের বাড়ি ঘুরে মরেছে।"

একটু চুপ থেকে ধ্রুব বলে, "এখন তো আর সে সমস্যা নেই। এবার ওর লেখাপড়ার যত্ন নাও। শুধু স্কুল আর বাড়ির মধ্যে ওকে আবদ্ধ রেখো না। একটু বেড়াতে টেড়াতে নিয়ে যাও। তাতে ভিক্টোরিয়ায় ঘুরিয়ে নিয়ে এলে। আগে গেছে ও সব জায়গায়?"

অন্য কিছু ভাবতে ভাবতে মাথা নেড়ে "না" বোঝায় অবন্তী। ধ্রুব ফের বলে, "বেড়াতে গেলে ওর আঁকারও উন্নতি হবে। অনেক ধরনের সাবজেক্ট পাবে।"

বড় করে শ্বাস ফেলল অবন্তী। বলল, "জানি, বাবা-মা দুটো রোলই আমাকে প্লে করতে হবে। সেটা জেনেই বেরিয়ে এসেছি।"

ধ্রুব কোনও মন্তব্য করে না। এবার বিষাদ ভাব ঝেড়ে ফেলে অবন্তী বলে ওঠে, "তুমি পলিকে বলো না ওর স্কুলে আমার মেয়েটাকে নিয়ে নিতে। এখন যেখানে পড়ে, তার স্ট্যান্ডার্ড ভাল নয়, তুমি তো জানো।"

এই প্রস্তাবের জন্য প্রস্তুত ছিল না ধ্রুব। তা হলে কি এই উদ্দেশ্যের জন্যই এত ডাকাডাকি? মনে তো হচ্ছে না। এ কথা বলার হলে

আগেই বলত। পলিকে ধরে হতে পারে, এটা বোধহয় সদ্যই মাথায় এসেছে। ধ্রুব বলল, “কিন্তু পলি কী করে পারবে? ও তো দেশবন্ধু গার্লসের হায়ার সেকেন্ডারি সেকশন। বুলান প্রাইমারি।”
“ঠিক পারবে। পলির সঙ্গে নিশ্চয়ই প্রাইমারির হেডমিস্ট্রেসের চেনা আছে। ও রিকোয়েস্ট করলে স্কুল একটু লুজ় করে পরীক্ষা নিয়ে ফোরে ভর্তি করে নেবে। একবার ওই স্কুলে ঢুকে গেলে টুয়েলভ অবধি নিশ্চিন্ত। ফাইভের পর থেকে খোদ পলি ওর উপর আলাদা করে নজর রাখতে পারবে।”
একটা ব্যাপার মাথায় না রেখে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা করে যাচ্ছে অবন্তী। ধ্রুব খেয়াল করায়, “কিন্তু পলির কাছে হঠাৎ এ প্রসঙ্গ তুলব কী করে? আমি যে তোমার বাড়িতে আসি, ওকে তো জানানোই হয়নি।”
ভাবতে একটু সময় নিল অবন্তী। তারপর বলল, “জানানোর তো দরকার নেই। যদি এখনই বাড়ি ফিরে কথাটা তোল, বলবে আজই তোমার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। রাস্তায় দাঁড়িয়ে কথা বলেছি। দেবনগরে চলে এসেছি, সন্দীপের সঙ্গে গন্ডগোল, সবই বলবে ছোট করে। তারপর বুলানকে ভর্তি করার ব্যাপারটা। এরপর তো আমি আর বুলান ওর সঙ্গে দেখা করতে যাব স্কুলে। তুমি থাকছ না সঙ্গে। বুলানও জানে না পলি তোমার কে হয়। তাই তোমার প্রসঙ্গ উঠবেই না ওখানে।”
অবন্তীর ভাবনায় কোনও ফাঁক নেই। তবু একবার খতিয়ে ভাবতে থাকে ধ্রুব। অবন্তী বলে যায়, “এখানে এসেই দেশবন্ধু গার্লসে পরীক্ষায় বসিয়েছিলাম মেয়েটাকে। পারেনি। বাধ্য হয়ে কালী কমলায় ভর্তি করতে হল।”
পরিকল্পনাটা মোটামুটি নিশ্ছিদ্রই মনে হচ্ছে। ধ্রুব বলল, “ঠিক আছে। পলিকে বলে দেখি, কী বলে!”

প্রথম ছবি দেখেই হোঁচট খেল ধ্রুব। এটাই বোধহয় সদ্য এঁকেছে, যেটা এখনও দেখেনি অবন্তী। দেখলে কি দেখাতে দিত?



দু’দিন বাদে অবন্তীর ভাড়া বাড়ির ডোর বেল টেপে ধ্রুব। অফিস ফেরত ফোন করেই এসেছে। অবন্তী ফোনে জানতে চেয়েছিল, “পলিকে বলেছ, বুলানের ভর্তি ব্যাপারে?”
ধ্রুব বলেছিল, “গিয়ে সব বলছি।”
দরজা খুলে গেল। অবন্তী বলল, “এসো।”
ধ্রুব ঘরে পা রাখতেই দেড়ে এসে কোমর জড়িয়ে ধরল বুলান। বলল, “আমার চকোলেট?”
হাসিমুখে চকোলেট বারটা বুলানকে দিল ধ্রুব। ফাউ হিসেবে ওর মাথার একঢাল চুলটা একবার ঘেঁটে দেয়। তারপর চেয়ারে গিয়ে বসে। ধ্রুবর মুখোমুখি হয়ে বিছানায় বসল অবন্তী। পলি কী বলেছে জানার জন্য টেনশনে আছে। মেয়েকে বলে, “ধ্রুব মামার সঙ্গে আমার জরুরি কথা আছে। তুমি পড়তে বসো নিজের জায়গায়।”
খুশি উধাও হল বুলানের মুখ থেকে। ঢিমে পায়ে এগোল পড়ার টেবিলের দিকে। ধ্রুব বলতে শুরু করে, “সেদিন তোমার এখান থেকে গিয়ে পলিকে বললাম। তুমি যেমন ভাবে বলতে বলেছিলেতেমন করেই। তোমার-সন্দীপের ঘটনা শুনে পলির মন ভারাক্রান্ত হল। বলছিল, ‘কেন যে এমন হয়! আজকাল যেন বড্ড বেড়ে গেছে এসব। বুলানের ভর্তির ব্যাপারে বলল প্রাইমারি হেডমিস্ট্রেস জয়শ্রীদির সঙ্গে ওর ভালই চেনা জানা। কথা বলে দেখবে। প্রথম দিন দেখা হয়নি। প্রাইমারি মর্নিং-এ, তার উপর অন্যদিনের তুলনায় আগেই চলে গিয়েছিলেন জয়শ্রীদি। কাল একটু সকাল করে স্কুলে গিয়ে জয়শ্রীদির সঙ্গে কথা বলেছে পলি।”
দম নিতে থামল ধ্রুব। ধৈর্য ধরতে পারে না অবন্তী। বলে, “কী বললেন হেডমিস্ট্রেস?”
“বলেছেন পরীক্ষা একটা দিতে হবে। নেওয়া হবে হাল্কা করেই। এছাড়া স্টুডেন্টের এক্সট্রা কোনও ক্যারিকুলাম, মানে বিশেষ গুণ থাকলে সুবিধে হবে ভর্তি নিতে।”, বলল ধ্রুব।
অবন্তী বলে, “ও যে ভাল আঁকে বলেছ তুমি?”
“বলেছি। তুমি একদিন স্কুলে কথা বলতে যেও পলির সঙ্গে। বুলানকে সঙ্গে নিয়েই যেও। কবে যাবে পলির থেকে জেনে আমি তোমাকে ফোন করে দেব। সেদিন বুলানের ক’টা আঁকাও নিয়ে যেও।”
এতক্ষণে যেন ধড়ে প্রাণ এল অবন্তীর। উৎফুল্ল কণ্ঠে বলে, “তোমার কথামতো কাল তো ওকে বেড়াতে নিয়ে গিয়েছিলাম। বাড়ি ফিরেই ছবি আঁকতে বসল। কী এঁকেছে দেখা হয়নি আমার।”
কথা শেষ করে দূরে টেবিল-চেয়ারে বসে পড়তে থাকা বুলানের উদ্দেশে অবন্তী বলে, “এই, তোর ক’টা ছবি নিয়ে আয় তো। ধ্রুবমামা দেখিয়ে দেওয়ার পর যেগুলো এঁকেছিস, ওগুলোই আনবি।”
বেছে বেছে বেশ কিছু ছবি নিয়ে এল বুলান। ধ্রুবর কোলের উপর রাখল। প্রথম ছবি দেখেই হোঁচট খেল ধ্রুব। এটাই বোধহয় সদ্য এঁকেছে, যেটা এখনও দেখেনি অবন্তী। দেখলে কি দেখাতে দিত? ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সামনে বাবা-মা, মাঝে মেয়ে। ধ্রুব অবন্তীকে জিজ্ঞেস করে, “কাল সন্দীপ এসেছিল? একসঙ্গে বেড়াতে গিয়েছিলে?”
“না তো।”, বলে ছবির দিকে ভাল করে তাকায় অবন্তী। আশ্চর্য হওয়া দৃষ্টিতে মেয়েকে জিজ্ঞেস করে, “এই লোকটা কে? কাকে এঁকেছিস?”
“ধ্রুবমামাকে।”, সহজ গলায় বলল বুলান।
অবন্তী বলে, “ধ্রুবমামা তো আমাদের সঙ্গে যায়নি!”
লাজুক হেসে বুলান বলল, “তাতে কী হয়েছে। এমনি আঁকলাম।”
ছায়া ঘনাল অবন্তীর মুখে। থম মেরে আছে ধ্রুবও। দু’জনকে গম্ভীর হয়ে যেতে দেখে, কী বুঝে বুলান ফিরে যাচ্ছে পড়ার টেবিলে। অবন্তী এখন কী ভাবছে, আন্দাজ করতে পারছে ধ্রুব। সে নিজে যা ভাবছে, সেটারই আশঙ্কা করছে অবন্তী। পলি জেনেছে বুলান আর বাবার সঙ্গে থাকে না। ছবিটা দেখলে পুরুষটির পরিচয় জানতে চাইবে। যদি এই ছবি না নিয়ে যাওয়া হয়, পরে আবার এরকম ছবি যে আঁকবে বুলান, তারও কোনও নিশ্চয়তা নেই। ধ্রুবর প্রসঙ্গ কখনও না কখনও পলির সামনে তুলে ফেলবে সে। ওর মনের অনেকটা জুড়ে এখন অবস্থান করছে ধ্রুব। কোনওদিনই ওকে আর পলির সামনে নিয়ে যাওয়া যাবে না। ধ্রুবকেও মেয়েটার থেকে দূরে সরে যেতে হবে।
বিছানা থেকে নেমে দাঁড়ল অবন্তী। বলল, “যাই, চা বসাই।”
কিচেনের দিকে গেল অবন্তী। চেয়ার টেবিলে বসে দুলে দুলে পড়ছে বুলান। মেয়েটাকে দেখে বড় কষ্ট হচ্ছে ধ্রুবর। ভাল স্কুলে পড়া হবে না ওর। বেচারির তো কোনও দোষ নেই, বাবার জায়গায় নিজের মতো করে একজনকে খুঁজে নিয়েছিল। অপরাধ বলতে এটাই!

অলংকরণ: সৌমেন দাস



স্মোকি উইথ আ টুইস্ট

চির চেনা স্মোকি আই লুক। তবে ছক ভাঙতে ব্যবহার করা হয়েছে সরু সাদা গ্লিটার লাইনার। রাতের সাজ হিসেবে উপযুক্ত!

মোনোক্রোম ম্যাজিক

সাদা-কালোর চিরন্তন জুটি। আর তাতেই রঙিন চোখের ক্যানভাস। রঙের প্রাচুর্য নেই, তবুও দারুণ গ্ল্যামারাস। সাদা-কালোয় চোখের মেক-আপের লুকবুক ক্রিয়েট করলেন রূপকিনী সেনগুপ্ত এবং সায়নী দাশশর্মা।



ডুয়াল ডিভা

আই মেক-আপে ডুয়াল লাইনার এখন সুপারহিট! কালোর সঙ্গে যে কোনও রঙের সঙ্গতই মানানসই। তবে আমরা বেছেছি সাদা। সিম্পল, তবু গর্জাস।



গ্রাফিক্যাল গডেস

চোখের সৌন্দর্য বাড়িয়ে তুলবে এই ইনোভেটিভ অ্যারাবিক লাইনার। সরু কালো লাইনারের উপর সাদার টানে এজি আই লুক।



রেট্রো রিইনভেন্টেড

পুরু সাদা লাইনারের উপর কালোর পোলকা ডট। এক্সপেরিমেন্ট করতে আপত্তি না থাকলে, এই আই মেক-আপ আইডিয়াল চয়েস।

মডেল: তরুণিমা, হিয়া
মেক-আপ: অভিজিৎ পাল
ফোন: ৯৮৩৬৭০২৭১৯
প্রথম পাতার সাদা টপ: ওয়েস্টসাইড, পার্কস্ট্রিট
বাকি পোশাক: নিভৃতি
ফোন: ৯৮৩৬০৮৯৩৫৫
ই-মেল: nivriti_16@hotmail.com
ছবি: সোমনাথ রায়



আনন্দ ওই এল...

আরও একটা নতুন বছর।
উৎসবে তার শুভ সূচনা।
মনেপ্রাণে খুশির জোয়ার।
সাজগোজেও সেই প্রতিচ্ছবি।
রং, প্রিন্ট, প্যাটার্নে উজ্জ্বল
বারো হাতের ক্যানভাস।
সিল্ক, তসর শাড়ির
বিস্তৃত সম্ভারে সাজানো
নববর্ষের ফ্যাশনস্কেপ।

ইক্কত শিল্কের শাড়ি। কচি কলাপাতা ও ম্যাজেন্টা রঙের গঙ্গা-যমুনা পাড়। কনট্রাস্টিং আঁচল। বারো হাত জমি জুড়ে ডুয়াল রঙের ফুলের মোটিফ। ট্র্যাডিশনাল ইক্কত শেভরনের স্মার্ট বর্ডার।



সুতির বেনারসি শাড়িতে সরু গোলাপি পাড়। তসর রঙের জমিতে গাঢ় গোলাপি ও টারকোয়াজ় নীল রঙের সাবেকি পেজ়লি প্যাটার্ন। আঁচলেও একই রেফারেন্স। লো বান আর স্টেটমেন্ট ইয়ারিংয়ে সুপার গর্জাস।



টারকোয়াজ় নীল
ও লালের অফবিট
কম্বিনেশন। তসর
ইক্কত শাড়ির জমি
জুড়ে ফুল আর
আলপনার নকশা।
চওড়া পাড়ে টেম্পল
ইক্কত বর্ডার। নীল
রঙের ইক্কতের আঁচল।



হাফ অ্যান্ড হাফ সিল্কের শাড়ি। নীল, লাল, সোনালি হলুদের বিন্যাস জমি জুড়ে। অর্ধেক শাড়িতে ফুলের মোটিফ। নীচের অংশে ফ্লোরাস জালি প্যাটার্ন। সরু একরঙা পাড়। আঁচলেও ফুলের মোটিফ।



হাফ অ্যান্ড হাফ সিল্কের শাড়ি। সারা শাড়ি জুড়ে ফুলের নকশা। লাল, নীল আর সোনালি হলুদের কম্বিনেশন। সরু নীল রঙের পাড়। আঁচলেও একই ফ্লোরাল প্যাটার্ন।

মডেল: ইশা
মেক-আপ: মৈনাক দাস
ফোন: ৮২৭৪৯০২৫২৭
শাড়ি: আনন্দ, রাসেল স্ট্রিট
ফোন: ২২২৯২২৭৫,
২২২৯৪১৩৮
গয়না: করিশমা, নিউ মার্কেট
ফোন: ৯০৩৮৭৪৫৭৪৮
লোকেশন সৌজন্য: ওজ়রা,
অ্যাক্রোপলিস মল
ফোন: ৮৬৯৭৯০৩৮৯০
ছবি: শুভদীপ ধর



রঙের রোশনাই

গ্রীষ্মের তীব্র দহনজ্বালা! হালকা কালার প্যালেটেই মনের শান্তি, প্রাণের আরাম। কিন্তু বৈশাখ যে উৎসবেরও সময়। বর্ষবরণের সাজে রঙের ছোঁয়া না থাকলে চলে? তাই গরমের আদর্শ ফ্যাব্রিকে বর্ণিল শাড়ির সম্ভার নিয়ে হাজির সানন্দা। নতুন বছরে পরনেও থাকুক রঙের ছোঁয়া।



এক রঙা পেস্তা সবুজ ওপারা খাদি কটনে কটকটে গোলাপি রঙের পাড় ও সরু টেম্পল বর্ডার। আঁচলে সোনালি পেটা জরির কাজ ও টাসেল। খোঁপার ফুলে বৈশাখী সাজ। (বাঁদিক)

উজ্জ্বল কুসুম হলুদ রঙের সুতির শাড়ি। টারকোয়াজ় নীল পাড়ে টেম্পল মোটিফ। কাপড়ের গয়নায় উজ্জ্বল উপস্থিতি। (ডানদিক)

সবুজ শাড়ি: অবন্তিকাজ়
ফোন: ৯৮৩০১৯০৩০৫
ব্লাউজ়: জলিজ় বুটিক, দক্ষিণাপণ
ফোন: ৯৮৩১০৫১১০৪

হলুদ শাড়ি: কমলা, আইসিসিআর
ফোন: ০৩৩ ২২৮২ ০৭৬৩
কাপড়ের গয়না: অরণ্য, দক্ষিণাপণ
ফোন: ০৩৩ ২৪২৩ ৬০১১



লাল-হলুদের চিরন্তন জুটিতে সুতির গঞ্জাম বোমকাই শাড়ি। উজ্জ্বল হলুদ রঙের শাড়িতে লাল ও কমলার হাফ অ্যান্ড হাফ পাড় ও টেম্পল বর্ডার। আঁচলে নানা রঙের সুতোর নকশায় ময়ুরের মোটিফ।

শাড়ি: অবন্তিকাজ়
কাপড়ের গয়না: অরণ্য



এক রঙা ঘন নীল তাঁতের শাড়িতে বেগুনি, গাঢ় নীল আর তসর জরির সরু পাড়। আঁচলে অফ হোয়াইট স্ট্রাইপস। কনট্রাস্টিং হল্টার ব্লাউজে ও রুপোর গয়নায় অনন্যা।

শাড়ি: কমলা
ব্লাউজ়: অরণ্য



কটকটে গোলাপি আর উজ্জ্বল কমলার জুটি। আঁচলে রং-বেরঙের চেকস এবং টাসেল। ঠিক নতুন বছরের মতোই ঝলমলে, সপ্রতিভ। ভিড়েও নজর কাড়তে বাধ্য!

শাড়ি: কমলা
ব্যাঙ্গলস: অরণ্য



আসমানি নীল, পেস্তা সবুজ আর হলুদে হ্যান্ডলুম কটন। জমি জুড়ে সবুজ সুতোর বুনট। সবুজ পাড়ে টেম্পলের নকশা। উজ্জ্বল হলুদ হাইনেক ব্লাউজ়ে আধুনিক সাজ।

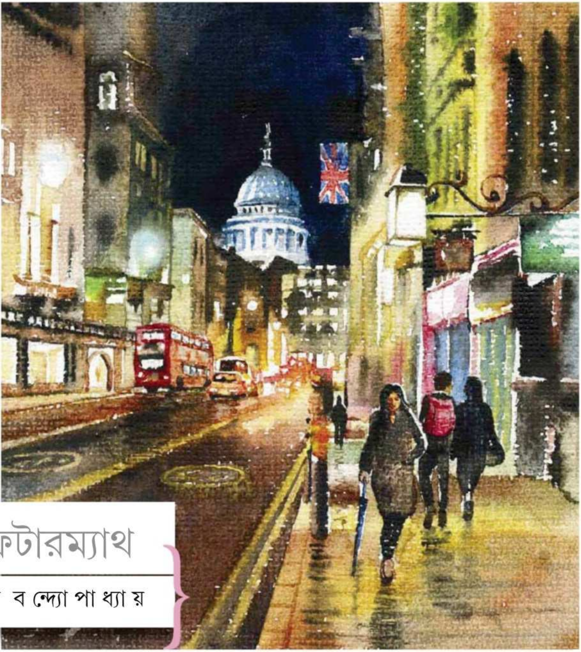
শাড়ি: কমলা
ব্লাউজ়: অরণ্য
ব্যাঙ্গল: সিয়েনা, হিন্দুস্তান পার্ক
ফোন: ৪০৬৫৮১২৩



গরমের সাজে কালো রং? একটু বুদ্ধি করে স্টাইলাইজ় করলে মন্দ লাগবে না। কালো সুতির শাড়ির জমি জুড়ে গোলাপি আর কমলা সুতোর ঠাসা কাজ। হট পিঙ্ক হল্টার ব্লাউজ় ও মিনিমাল গয়নায় মোহময়ী।

শাড়ি: কমলা

মডেল: দময়ন্তী, হিয়া, তরুণিমা
মেক-আপ: অভিজিৎ পাল
ফোন: ৯৮৩৬৭০২৭১৯
রুপোর গয়না: করিশমা, নিউ মার্কেট
ফোন: ৯০৩৮৭৪৫৭৪৮
ছবি: সোমনাথ রায়



আফটারম্যাথ

স ঙ্গী তা ব ন্দ্যো পা ধ্যা য়

প্রায় ন'টা বাজে। কিন্তু মাত্র কিছুক্ষণ হল অন্ধকার নেমেছে শহরটার উপর। কিংসক্রসের অফিস থেকে বেরিয়ে ভিক্টোরিয়া লাইনের টিউবে উঠল কামিয়া। তারপর সেন্ট্রাল লাইনে চেঞ্জ করে বন্ড স্ট্রিটে নেমে হেঁটে হেঁটে মে ফেয়ার গার্ডেনে পৌঁছতে তার সবমিলিয়ে আধ ঘণ্টা লাগল। বন্ড স্ট্রিটের বাজিং ক্রাউডকে পেছনে ফেলে রেখে, সে যখন এই রাস্তাটায় পৌঁছলো তখন ম্যাজিকের মত কমে এল হাজার বছরের পুরনো শহরের হইচইয়ের শব্দগুলো। এই দু'দিন ধরে ক্রমাগত বৃষ্টি হচ্ছে। আর গত তিনদিনই রোদ ওঠেনি। তার সঙ্গে ছাতা আছে অবশ্য। সে ছাতা মাথায় মেফেয়ার গার্ডেনের একটু ভিতরের দিকে ইস্ট মেফেয়ার স্ট্রিটে এসে থমকে দাঁড়াল। এবার তাকে বাড়িটা খুঁজে বার করতে হবে। রাস্তার দু'পাশের বাড়িগুলোর একতলা, দোতলায় নানারকম স্টোর। যেমন ডান হাতের প্রথম স্টোরটা বিশপস লাইব্রেরি। নিবু নিবু আলো জ্বলছে রিলিজিয়াস বইপত্রের দোকানটায়। আসলে বন্ধ হয়ে গিয়েছে। বাইরে বোর্ড ঝুলছে— ক্লোজ়ড। তারপর বিখ্যাত 'ওয়ালস্টার অ্যান্ড সানস্', ওয়াল পেপারের শো-রুম। সেটাও বন্ধ। তারপর একটা কফি শপ। কিন্তু সেটা 'এলান কাফে' নয় যেটা সে খুঁজছে। তারপর একটা খোলা লাল দরজা। আর সেটা পার হলেই নীচে নেমে যাওয়ার স্টিলের সিঁড়ি। ভিতর থেকে মৃদু হয়ে উঠে আসছে হইহল্লা আর বাজনার আওয়াজ। এটা একটা আন্ডারগ্রাউন্ড নাইট ক্লাব। নাম 'এলজিবিটিকিউ হেভেন'। গে নাইট ক্লাব। মনে মনে কাঁধ ঝাঁকাল কামিয়া। একবার একটা ইনভেস্টিগেশনের জন্য তাকে লন্ডনের গে নাইটক্লাবগুলোয় দিনের পর দিন গিয়ে বসে থাকতে হত। দিন সাতেক সব জায়গায় ঢুঁ মারার পর লোকটাকে পেয়েছিল ওয়াটারলুর একটা ক্লাবে। যে রিপোর্ট দিয়েছিল কামিয়া, তারপর লোকটার বউয়ের ডিভোর্স পেতে অসুবিধা হয়নি। ফলে ডিভোর্স সেটেলমেন্টও স্মুদলি হয়ে গিয়েছিল। বউ পেয়েছিল ওয়েস্ট লন্ডনের হ্যামস্টেডের বাড়িটা, দেড় মিলিয়ন টাকা আর বাচ্চাদের

কাস্টডি। এটা ঠিক, লোকটার পয়সাও ছিল।

এই রাস্তাটা আজ উইক ডে'র রাতে এটুকু হইচই বাদ দিলে চুপচাপই মনে হল তার। তাই হওয়ার কথা। শুক্রবার বিকেলেই চেহারাটা বদলে যাবে। তখন ফুটপাথ ধরে হেঁটে যাওয়াও মুশকিল। অবশ্য বৃষ্টির জন্যও রাস্তাগুলো ফাঁকা। পাবটার নম্বর ২৯৪। তার মানে ৩০২ এই পাশেই হবে। ঠিক তখনই রাস্তার কর্নারে 'এলান কাফে'র বাড়িটাকে মুখ বের করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখতে পেল সে। জর্জিয়ান বিল্ডিং। ধবধবে সাদা রং। নিয়ন গোলাপি অক্ষরে লেখা 'এলান কাফে'। কামিয়ার ফার্মের ক্লায়েন্ট বিলি ম্যাসিডন এই কাফের মালিক। বিলি ম্যাসিডন বছর চল্লিশের এক মাল্টিমিলিয়নেয়ার। এরকম কাফে লোকটার আরও আছে লন্ডনে। বিয়ে করেছেন এক বছর আগে। বউয়ের নাম মিরর ম্যাসিডন। এর আগেও অবশ্য একটা বিয়ে করেছিল বিলি ম্যাসিডন। ডিভোর্স হয়ে গিয়েছে।

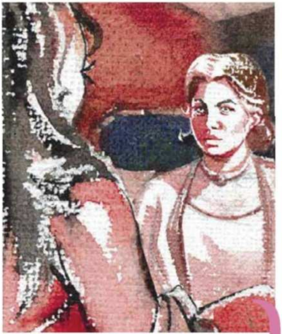
আর দু' পা এগোতেই কামিয়ার চোখে স্পষ্ট হয়ে উঠল কাফের ভেতরের সাজ, সজ্জা, ভিড়, মানুষজন, ব্যস্ততা। থরেথরে সাজানো পেস্ট্রিগুলোও দেখতে পেল সে। টেবলে টেবলে ভিড়। সমস্ত ইন্টিরিয়রটা গোলাপি রঙের। যদিও তার এখানে কোনও কাজ নেই, তবু অনেক টাটকা ফুল দিয়ে সাজানো এলান কাফের কাচের দরজা ঠেলে একবার ভেতরে না ঢুকে পারল না কামিয়া। সঙ্গে সঙ্গে কফি আর কেকের গন্ধে ভেসে গেল সে। সারাদিন হাড়ভাঙা পরিশ্রমের পর এখন তার শরীর, মন, পেট, রসনা এটাই চাইছে। এক কাপ কফি। একটা পুরু কেক। কেক সাজানো ঠান্ডা কাচের শোকেসগুলোর দিকে তাকিয়ে সে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তার পছন্দের টফি কেকগুলো যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে তাকে। কিন্তু হাতে সময় নেই। বসে একটু আরাম করে কফির কাপে চুমুক দিতে দিতে এলান কাফের ঝাঁ চকচকে কিন্তু নরম, স্নিগ্ধ, আড্ডামুখর পরিবেশকে ভিতরে শুষে নেওয়ার সময় তার নেই। সে দ্রুত নিজের টোট ব্যাগ থেকে পার্স বের করে একটা টেক-অ্যাওয়ে কফি আর কেক কিনে নিল। এবং কেকের বাক্সের মুখটা স্টিকার দিয়ে বন্ধ করতে বারণ করল ওয়েট্রেসকে। মেয়েটা একটা মুখভঙ্গি করল সঙ্গে সঙ্গে। মানে, হ্যাঁ, জানি, হাউ ইট ইজ়! পুরো একটা দিনের কাজের ধকলের পর একটা স্টিকার খোলার ধৈর্যও আর আমাদের অবশিষ্ট থাকে কি? আমি তো এখান থেকে একটা স্যালাড নিয়ে অ্যাপার্টমেন্টে ফিরি, কিন্তু চামচটা মুখে তোলার শক্তিটাও শরীরে থাকে না। হুঁ। কামিয়া একজন এক্সপার্ট। মনের কথা বোঝার এক্সপার্ট। পেপার ন্যাপকিন এগিয়ে দিয়ে একটা হালকা চাপ দিল মেয়েটা তার হাতে। সে ধন্যবাদ দিয়ে ধীর পায়ে বেরিয়ে এল কাফে থেকে। ৩০২ নং বাড়ির একতলা আর দোতলাটা নিয়ে জমজমাট এবং দামি এই কাফে। দামি তো বটেই। কফি সাত পাউন্ড আর টফি কেক দশ। মনে মনে একটু নিজেকে বকলো কামিয়া। এরকম হিসেব করে খরচ করার দিন এখন নেই তার। আসলে অভ্যেস হয়ে গিয়েছে। সতেরো পাউন্ডে এখনো লন্ডন শহরে তিন দিন ফুল ব্রেকফাস্ট খাওয়া যায়, এটা তো সে কাউন্টারে পেমেন্ট করার সময়ই ভেবেছে। অথচ এই বিলি আর মিররের সঙ্গে অফিস আওয়ার্সের পরে এবং অফিসের বাইরে এই একটা স্পেশাল মিটিংয়ের জন্য সে পাবে ঘণ্টা প্রতি পাঁচশো পাউন্ড। লট অফ মানি।
নীচে কাফে আর ওপরে তিনতলায় একটা অ্যাপার্টমেন্ট। অফিস ব্রিফ করেছে থ্রি বেডরুম স্প্রলিং ফ্ল্যাট উইথ কিচেন, লিভিংরুম, লন্ড্রি রুম, স্টোর, টু টয়লেটস অ্যান্ড ওপেন টেরাস। আসলে এই বাড়িটা পুরোটাই বিলি ম্যাসিডনের সম্পত্তি। বিয়ের আগেই তিনতলাটা রেনোভেট করিয়েছিল অনেক খরচ করে। বউ নিয়ে এখানেই বসবাস করছিল। এখন বিলি ম্যাসিডন আর এখানে থাকছে না। বৌয়ের থেকে সেপারেটেড হয়ে গিয়েছে। মিরর এখানে থাকে। একা। ইনভেস্টিগেশন রিপোর্ট বলছে মিরর বাড়ি থেকে বেরোয় না বললেই হয়। ফোনের কল রেকর্ডে কোনও পুরুষ বন্ধুর হদিশ পাওয়া যায়নি। ইনফ্যাক্ট সারাদিনে তেমন কোনও ফোনই করে না মেয়েটা কাউকে। একা একা গান শোনে। এমনকি জীবনযাপন অতি সাধারণ। বাইরে থেকে খাবার আনায় না। বাড়িতে রান্না করে খায়। শপিং করতে গিয়ে টাকা ওড়ায় না। জামাকাপড় কেনে না। জুতো পরে ডোন্ট ডেট পাম্প শু। যেটা কিনা এদেশে বুড়রা পরে সাধারণত। মোটা এবং ভোঁতা আড়াই ইঞ্চি হিল। বিলি নিজেও স্বীকার করেছে প্রেমের সময় এবং বিয়ের পর বিলি মিররকে যেসব পোশাক কিনে দিয়েছে, সে গুলোই মিরর পরছে। এর বাইরে একটা জ্যাকেটও মিররকে পরতে দেখা যায়নি এই সেপারেশনের দিনগুলোয়। মিররের বিরুদ্ধে একটা ছাড়া আর কোনও অভিযোগই আনা যাচ্ছে না। এমনকি মিররের বাড়ির গারবেজ রিপোর্ট বলছে মিরর খাবারও নষ্ট করে না। পচে যাওয়া খাবার, ডেট এক্সপায়ার করে যাওয়া খাবারের প্যাকেট এসবও থাকে না ডাস্টবিনে। কোনও অপচয় নেই। কোনও ব্যবহার করা কনডোম, পুরনো সেক্স টয়, ইনটিমেট জেলির টিউব..., কিসসু পাওয়া যায়নি গারবেজে। ইনভেস্টিগেটর রিপোর্টে লিখেছে," শি সিমস টু বি লিভিং লাইক আ সেন্ট আফটার মি. ম্যাসিডন লেফট হার।" এবং মিরর এখনও কোনও সলিসিটরকে মিট করেনি। এবং এদেশের একজন মানুষ হিসেবে এটাই মিররের পক্ষে সবচেয়ে আশ্চর্যজনক আচরণ।
৩০২ বিল্ডিংটার একদিকে অ্যাপার্টমেন্ট। আর একদিক দিয়ে সিঁড়ি। জর্জিয়ান বিল্ডিংগুলোর মাঝখান দিয়ে সিঁড়ি হয়। এটা কর্নার প্লট বলে আর্কিটেকচারটা বোধহয় একটু আলাদা। কফি আর কেকটা শেষ করে কামিয়া সিঁড়ি বেয়ে তিনতলায় উঠে ফ্ল্যাটের বেল টিপল। বেল টিপেই সে ব্যাগ থেকে একটা টোস্ট বিস্কিটের মাপের রেকর্ডার বের করে গলায় ঝুলিয়ে নিল। লিসটায় তার ল' ফার্মের নাম লেখা। 'টরিস এন্ড ক্রুকস'। সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে গেল। বছর তিরিশের মিরর ম্যাসিডন দাঁড়িয়ে বাড়ির পোষাকে। একটা গাঢ় সবুজ নাইটস্যুটের ওপর একটা গ্রে কালারের ভেলভেট রোব জড়ানো। অবিন্যস্ত চুলগুলো চোখ মুখের ওপর এসে পড়েছে। চুলের রং ব্রাউন। চোখের মণির রংও ব্রাউন। মিররকে দেখলেই বোঝা যায়, মিরর শুধু ব্রিটিশ নাগরিকই নয়, রক্তও বিশুদ্ধ ব্রিটিশ। যেমন বিলি ম্যাসিডন মিক্সড। বাবা ব্রিটিশ। মা ডাচ। ম্যাসিডনকে দেখলে কি বোঝা যায়? কামিয়া বুঝতে পারে। সে একজন এক্সপার্ট। এমনিতে কারও এত বোঝার কথা নয়। তা ছাড়া এখন বিশুদ্ধ রক্ত বলে তেমন কিছু নেই এদেশে। বেশিরভাগ মিক্সড ব্লাড। মিররের দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়েই রেকর্ডার অন করে দিল কামিয়া এবং এক নিঃশ্বাসে বলে গেল, "হাই, মিসেস

ম্যাসিডন। আমি কামিয়া দত্তা। মি. ম্যাসিডনের ল' ফার্মের একজন ইনভেস্টিগেশন অফিসার। আজ আপনার সঙ্গে আমার মিটিং ঠিক রাত ন'টা পঁয়তাল্লিশে। আমি রেকর্ডার অন করেছি। ঠিক এখন থেকে আপনার সঙ্গে আমার যা কথা হবে, সব রেকর্ডিং হবে। আপনার যদি এখনও কথা বলতে আপত্তি থাকে আমি এখান থেকে ফিরে যাব। যদি আপনি রাজি থাকেন তা হলে আমি ভেতরে আসব। আপনি কোনও প্রশ্নের উত্তর না দিতে চাইলে আপনার রাইট থাকবে উত্তর না দেওয়ার বা যে কোন মুহূর্তে মিটিং কল অফ করার।"
মিরর ম্যাসিডন শান্ত ভাবে বলল," শিওর। প্লিজ কাম ইন।"
সে ভিতরে প্রবেশ করল। সাজানোগোছানো লিভিংরুম। কোনও বড় আলো জ্বলছে না ঘরে। সবই হয় ফ্লোর ল্যাম্প বা টেবিল ল্যাম্প। একটা সিঙ্গল সোফায় গিয়ে বসল কামিয়া। সাত, আট হাত দূরে আর একটা সোফায় আরাম করে বসল মিরর। বলল," কিছু নেবেন?"
"আই অ্যাম গুড। থ্যাংক ইউ। কিন্তু এই আলোতে আমার একটু অসুবিধা হবে। যদি কোনও আপত্তি না থাকে তা হলে কি একটু জোরালো আলোর ব্যবস্থা করা যেতে পারে মিসেস ম্যাসিডন?"
উঠে গিয়ে সিলিং-এর এক ঝাঁক আলো জ্বালিয়ে দিল মিরর। আবার বসল এসে। সে শুরু করল," আশা করি আপনি ভাল আছেন এবং মানসিকভাবে সুস্থ অবস্থায় আছেন। আবারও বলছি কোনও প্রশ্নের উত্তর না দিতে চাইলে আপনার রাইট থাকবে উত্তর না দেওয়ার।"
"ওকে। আমি জানি।"
"শুরু করি?"
"অবশ্যই।"
"আমার আগের ইনভেস্টিগেটর বলছেন মি. ম্যাসিডন সম্পর্কে আপনার মনে কোন বীতরাগ নেই।সত্যি?"
"অফকোর্স নেই। কোন অভিযোগ বা বীতরাগ নেই।"
"আপনি কী চান?"
"আমি চাই বিলি ফিরে আসুক। আমরা আবার আগের মতো থাকি। যেমন ছিলাম।"
"কিন্তু মি. ম্যাসিডন বলছেন আপনাদের সম্পর্কটা আর আগের জায়গায় নেই। মি. ম্যাসিডনের ধারণা আপনি ওঁকে ভালবাসেন না।"
"নাহ, ভালবাসি।"
"আপনি অনেকক্ষণ সময় নিলেন এটা বলতে।"
"হ্যাঁ, আমি ভেবে দেখলাম আবার করে। এই প্রশ্নটা আমি বারবার করি নিজেকে যে বিলিকে আমি ভালবাসি কি না!"
"কিন্তু ভালবাসার বিষয়টা কি অনেক স্বতঃস্ফূর্ত হওয়ার কথা নয়? ভাবতে হবে কেন?"
"কিন্তু ভালবাসার বিষয়টা একটা রেসপনসিবিলিটিও। প্রতি মুহূর্তে সেটাকে যাচাই করা যায়।"
"মানে আপনি বলছেন যে এক্ষেত্রে আপনার মি. ম্যাসিডনের প্রতি ভালোবাসাটা একটা দায়িত্ব হয়ে দাঁড়িয়েছে?"
"এ মুহূর্তে আমি কেন বিলিকে ভালবাসি এটা অনেক বড় একটা প্রশ্ন। কারণ আমাদের মধ্যে গত পাঁচ মাসে যা ঘটেছে তারপরও আমি কেন বিলিকে ভালবাসছি এটা নিয়ে আমি ভাবি! আই মিন আই টক টু মাই ইনার সেলফ।"
"আপনি কি বলতে চাইছেন যদি একটু ভেঙে বলেন।"
"আমাদের বিয়ের কয়েকমাসের মধ্যে বিলি অন্য একটা সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে। বিলির ফিঞ্চলের ফ্ল্যাটে মেয়েটি দু'মাস থেকেছে। দে লিভড টুগেদার। দে হ্যাড সেক্স। বিলি আর ন্যাটালিয়া প্রকাশ্যে ঘুরেছে বেরিয়েছে। আমি জানতে পেরে বাধা দিয়েছি। কিন্তু বিলি ব্যাক আউট করেনি। যখন বিলি নিজে জানতে পেরেছে ন্যাটালিয়া আসলে অন্য একজনের সঙ্গে ইনভলভড এবং বিলিকে ব্যবহার করছে তখন বিলি স্টপড। এই পুরো সময়টায় আমি চুপ করে থেকেছি। বিলি নিজের স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার পর একটা দুটো দিন করে আমি এবং বিলি চেষ্টা করেছি সব ভুলে যেরকম ছিলাম সে রকম হয়ে যেতে। কিন্তু আমি নিজেকে তখনও প্রশ্ন করেছি যে আমার ভেতরে কী প্রভাব পড়েছে এই ঘটনার। আমার উত্তর আমি পেয়েছি। আমি বিলিকে ছাড়তে চাইনি। তারপর বিলি সেপারেটেড হয়ে গিয়েছে। বিলি ডিভোর্স চাইছে। এটাও আর একটা পরিবর্তিত পরিস্থিতি। এবং সেখানেও আমার ভূমিকাটা একই আছে। আই ওয়ান্ট টু কনটিনিউ।"
"কনটিনিউ উইথ?"
ঠিক এখানে মিরর ম্যাসিডনের মুখে একটা মাইক্রো ইমোশনাল বার্স্ট হল। কিন্তু সেটা রাগ না। হতাশা। কামিয়া এখানে এসেছে রাগ, ক্রোধ, প্রতিহিংসা খুঁজতে। যদিও এখনও পায়নি। সে একজন বডি ল্যাঙ্গোয়েজ এক্সপার্ট এবং মাইক্রো ইমোশন রিডার। আশ্চর্য, মিরর ম্যাসিডন তীব্র আলোর নীচে বসে মুখের সূক্ষ্মতম আবেগকে তার মত একজন এক্সপার্টের কাছে লুকিয়ে রাখতে পারছে কী করে! কিছু তো আছে বিলির এগেনস্টে। কিছু নেই এটা কোনও ভাবে সম্ভব নয়। কিন্তু মিরর সব লুকিয়ে রাখতে পারছে। কিন্তু লুকিয়ে রাখতে পারাটা ধরতে না পারলে তো কামিয়া সেটা রিপোর্ট করতে পারে না। এখানে ক্লায়েন্ট কোন ল' স্যুট ফাইল করেনি। ক্লায়েন্ট সত্যিটা জানতে চায়। ক্লায়েন্ট তার স্ত্রীর মনের গভীরতম সত্যকে জানতে চায়। তারপর তৈরি হবে ডিভোর্সের গ্রাউন্ড। অদ্ভুতভাবে বিলিও আসলে ডিভোর্স চায় না। মিরর তো চায়ই না। অথচ ডিভোর্স হবে। ম্যারেজ কাউন্সেলিং কাজ করেনি। এখন তার ল' ফার্ম সম্পর্কটার তদন্ত করছে। থিংস আর সো কমপ্লিকেটেড। আর এই সব কমপ্লিকেশনকে ভাঙিয়ে কামিয়া মাসে পঁচিশ হাজার পাউন্ড রোজগার করে। কামিয়া চোখ বোলালো লিভিংরুমে। "আপনি কী ড্রিংক পছন্দ করেন? ওয়াইন?"
"আগে ওয়াইন পছন্দ করতাম।"
কামিয়া নড়ে চড়ে উঠল একটু," মি. ম্যাসিডন ওয়াইন পছন্দ করেন। তাই কি আপনি ওয়াইন ত্যাগ করেছেন?"
কামিয়ার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মিরর ম্যাসিডনের মুখের রেখাগুলো পড়ে ফেলল। তুলনামূলকভাবে একটা আরামদায়ক মুখের

মিরর ম্যাসিডনের মুখে একটা মাইক্রো ইমোশনাল বার্স্ট হল। কিন্তু সেটা রাগ না। হতাশা। কামিয়া এখানে এসেছে রাগ, ক্রোধ, প্রতিহিংসা খুঁজতে।



ভাব যেটাকে বলে উদাস হয়ে যাওয়া তাই ধরা পড়ল তার চোখে। হাত দুটো এলিয়ে পড়ল। কোনও কথাতেই কোন প্রতিরোধ নেই কেন?
"এটার সঙ্গে বিলির কোনও সম্পর্ক নেই।"
এতটুকুও ছাড়তে নেই এটাই কামিয়া জানে,"আগে ভালবাসতেন। এখন বাসেন না। দুটোর মধ্যে একটা ব্রিজ আছে। আপনি উত্তর দিতে না চাইলে অবশ্যই বলতে পারেন। ইউ ক্যান সেভ ইওর রাইট।"
"আমি মেডিটেশন করছি, যোগা করছি। সিগারেট,



সত্যি বোধহয় কোন গ্রাজ নেই মিররের ভিতর। এই মুহূর্তে বিলি ম্যাসিডনের জন্য মিররের প্রেম আর কমিটমেন্ট ছাড়া সে কিছু খুঁজে পাচ্ছে না।

অ্যালকোহল, জাংকস সব ছেড়ে দিয়েছি। এখন ডিসলাইক করি বলা যায়।"
"মেডিটেশন, যোগা আর গ্রেট কম্প্লোজ়। প্রাণায়ম?"
"রোজ।"
"মেডিটেশন আর যোগা আপনার মধ্যে কী ধরনের পরিবর্তন এনেছে বলে মনে হয় আপনার মিরর?"
"টু হ্যান্ডেল মাই ইমোশনস মোর পজ়িটিভলি। একাকীত্বের মধ্যে আনন্দ খুঁজে পাওয়া।"
"ওহ! ইউ আর সো পজিটিভ। আপনি বললেন যে ন্যাটালিয়া পর্বের পর বিলি যখন স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসে, তখন আপনারা দুজনেই বিয়েটা ওয়র্ক করানোর চেষ্টা করেন। আপনি বলেছেন স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার কথা। আপনি বলেননি যে ন্যাটালিয়া পর্বের পর বিলি আপনার কাছে ফিরে এসেছে। আপনি কি এটা সচেতন ভাবেই বলেছেন? আপনি কি মনে করেন না ন্যাটালিয়া পর্বের পর মি. ম্যাসিডন আপনার কাছে ফিরে এসেছিলেন?"
"বিলির অনেকগুলো বাড়ি আছে। মেফেয়ার স্ট্রিটের এই বাড়িতেই ওর মূল বসবাস। সেটা ন্যাটালিয়ার সঙ্গে থাকার সময়ও মূল আবাসস্থল ছিল। পরেও তাই ছিল। সে অর্থে চলে যায়নি যখন তখন ফিরে আসার কথাও ওঠে না।"
"হুঁ। রাইট। আপনি বলছেন ইউ ওয়ান্ট টু কনটিনিউ। বাট অন হোয়াট গ্রাউন্ড? হি চিটেড অন ইউ। আসলে তো মি. ম্যাসিডনকে আপনারই ডিভোর্স দেওয়ার কথা এবং অবশ্যই একটা সেটেলমেন্টসহ। যেটার জন্য মি. ম্যাসিডন রেডি আছেন।"
"প্লিজ় ডোন্ট প্রোভোক মি মিস কামিয়া দত্ত। আমার স্বামীকে আমি ক্ষমা করে দিয়েছি। এবং আমি বিশ্বাস করি জীবনের সেরা মুহূর্ত, আনন্দের স্মৃতি দিয়ে এই তুচ্ছ ঘটনার ঊর্ধে ওঠার ক্ষমতা আমার আছে।" মিররের মুখটা ম্লান। চোখ চিকচিক করছে।
এটা অভিনয় যে নয় বিশ্বাস করা ভীষণ ভীষণ মুশকিল। কিন্তু সত্যি বোধহয় কোন গ্রাজ নেই মিররের ভিতর। এই মুহূর্তে বিলি ম্যাসিডনের জন্য মিররের প্রেম আর কমিটমেন্ট ছাড়া সে কিছু খুঁজে পাচ্ছে না। খুঁজে না পেয়ে সে নিজেই বিরক্ত হয়ে যাচ্ছে।সে না নিজেই ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে যায়! কিন্তু এটা ইংল্যান্ড। ইন্ডিয়া হলে সে হয়তো বলে ফেলত, "কাম অন! কোথাকার কোন সত্য যুগের সতী-সাবিত্রী বাবা তুমি? তোমার বর দু'মাস একটা মেয়ের সঙ্গে শুয়ে এল আর তুমি এখনও তকে পুজো করছ? ডোন্ট ইউ হেট দ্যাট আইডিয়া?"
নিজের মাথায় নিজেই ফুঁ দিয়ে নিজেকে শান্ত করল কামিয়া। "আমি একজন প্রফেশনাল। আমি এখানে ডিভোর্স পারসিউ করতে আসিনি। আমি শুধু একটা কথা জানতে চেষ্টা করছি। এত প্রেম, এত কমিটমেন্ট, এত ক্ষমা প্রবণতার পরও কেন আপনি মি. ম্যাসিডনকে "আই লাভ ইউ" কথাটা বলতে পারছেন না। মি. ম্যাসিডনের যেটা কিনা একমাত্র কনসার্ন।"
মিরর তাকিয়ে আছে এবং খুব নরম চোখে তাকিয়ে আছে। প্রশ্নটা করে ফেলে কামিয়াই বরং সোফার হাতলে নখ দিয়ে আঁচড় কাটল। যে কোনও বডি ল্যাঙ্গোয়েজ এক্সপার্ট বলে দেবে সে এই মুহূর্তে নিজের কাজের সফলতা সম্পর্কে এতটুকু আশাবাদী নয়।
"আমি ওকে লিখেছি। যতবার ও 'আই লাভ ইউ' লিখেছে, আই রোট হিম ব্যাক, 'আই লাভ ইউ টু।' আমি সেপারেশনের এই ক'মাসে অনেক অনেকবার নিজে থেকে লিখেছি," আই লাভ ইউ বিলি।"
"কিন্তু আপনি মুখে বলতে পারেননি। কেন?"
"একটা ব্রেক নেওয়া যেতে পারে?"
"হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। একটু জল পেতে পারি?"
মিরর উঠে গিয়ে এক গ্লাস জল এনে দিল তাকে," উড ইউ মাইন্ড সাম জুস?"
"ইটস্ ওকে। থ্যাংকস। প্রায় এগারোটা বাজছে। আমার মনে হয় আমরা অনেক দেরি করে ফেলছি।"
"নট ফর মি।"
"তাহলে আমি বলব ইন্টারভিউটা আমরা আজই শেষ করে ফেলি।"
"হুম।"
"কেন আপনি আপনার ভালোবাসার মানুষকে আই লাভ ইউ বলতে পারছেন না? আমরা জানি ন্যাটালিয়ার বিষয়টা জানার পরও আপনি মি. ম্যাসিডনের সঙ্গে অসংখ্যবার মিলিত হয়েছেন। এবং মি. ম্যাসিডন বলেছেন যে তিনি

মনে করেন আপনি যথেষ্ট প্যাশনের সঙ্গেই সেক্স করেছেন। আপনি চুমুও খেয়েছেন। আবেগে ভেসে গিয়ে, চোখের জলে ভেসে গিয়ে চুমু খেয়েছেন। সব ঠিক। কিন্তু আপনি 'আই লাভ ইউ' বলতে পারেননি। বলতে পারছেন না। বলতে চাইছেন না। না, সরি, রং! ইয়েস, আপনি চেষ্টা করেছেন। মি. ম্যাসিডন অনেক আন্তরিকতার সঙ্গে বার বার স্বীকার করেছেন এটা যে আপনি চেষ্টা করেছেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা মি. ম্যাসিডন আপনার হাত ধরে বসে থেকেছেন, আপনাকে বলাবার চেষ্টা করেছেন এই একটা মাত্র কথা। কিন্তু আপনি বলেননি। সাম থিং হোল্ডস ইউ ব্যাক ফ্রম সেয়িং ইট। সেটা কী? কনজুগাল লাইফে এটা মি. ম্যাসিডনের রাইট। তিনি তাঁর স্ত্রীর মুখ থেকে আই লাভ ইউ শুনতে চান। অ্যাশিওরড হতে চান যে আপনার তাঁর বিরুদ্ধে কোন আবেগ কাজ করছে না। আমি জানতে এসেছি কেন আপনি বলতে পারছেন না। এবং আপনি আমাকে যে কারণই বলবেন আমি সেটাকে নানা লেয়ারে ইন্টারপ্রেট করব। মিসেস ম্যাসিডন, আপনি যদি "আই লাভ ইউ" না বলতে পারেন মি. ম্যাসিডন আপনাকে "এলিয়েনেশন অফ লাভ", এই গ্রাউন্ডে ডিভোর্স দেবেন। ইজ় দ্যাট ওকে ফর ইউ?"

"আমি তো বলছি যে বিলিকে ভালোবাসি, এর বাইরে আর কোন সত্য নেই।"

"তাহলে কেন মুখে বলতে পারছেন না? হয়ত কারণটা ব্যাখ্যা করতে পারলে মি. ম্যাসিডন বুঝবেন। এই বিয়েটা ভাঙবে না। আপনি অন্তত চেষ্টা করুন একটা কনভিনসিং কারণ আমাকে জানাতে।"

"আমি জানি না। আমি অনেক চেষ্টা করেছি কিন্তু আমার মুখ থেকে বেরোচ্ছে না। কিছুতেই বেরোচ্ছে না। কিন্তু এটুকু ছাড়া আর সব তো ঠিক আছে। এই দেখুন আমি আপনাকে কতবার বললাম যে আমি বিলিকে ভালোবাসি। আই লাভ হিম। আই কেয়ার ফর হিম। ও সেপারেটেড হয়ে যাওয়ার পরও আমি ওর সামার অবধি ট্যাক্সেশন নিজের হাতে রেডি করেছি। ইনশিওরেন্স, ডোনেশনস, চ্যারিটি, ল' স্যুটস্ সব দেখেছি জুলাই অবধি। যে সিকিওরিটি এজেন্সি ওকে সার্ভ করে, তাদের সঙ্গে একটা খুব বড় ভুল বোঝাবুঝি হয়েছিল, তা সলভ করেছি। ওর একটা ইস্যু ছিল ওর এক্সের সঙ্গে। আই টুক কেয়ার অফ দ্যাট টু। ওহ! বিলির পিঠে একটা ইনজুরি হয়েছে কদিন আগে বাস্কেটবল খেলতে গিয়ে। ইজ় হি অলরাইট? ও আমার ফোন ধরে না। কল আনসারিং মেশিনে চলে যায়। হি নেভার কলস ব্যাক। আশা করি ও ভাল আছে।"

"এটা খুব দুঃখজনক মিসেস ম্যাসিডন যে আপনার সমস্যাটা ঠিক ধরা যাচ্ছে না। এটা আমার বলার কথা নয়, আমার আপনাকে পারসিউ করার কথা নয়, তবু বলছি যে শুধু মুখে আই লাভ ইউ বলে দিলে হয়তো এখনও মি. ম্যাসিডনকে আপনি ফিরে পেতে পারেন। আপনি সব করেছেন কিন্তু এই একটা কারণে আপনার কোনও কিছুই দাঁড়াচ্ছে না। ব্যাপারটা একটা হাস্যকর জায়গায় চলে গিয়েছে। আপনি আপনার হাজ়ব্যান্ডকে ভালবাসেন কিন্তু মুখে বলতে পারেন না। এটা সর্বাত্মক ভাবে আপনার বিপক্ষে যাচ্ছে। ল' স্যুট ফাইল হয়ে যাওয়ার পর টেস্টিমনির সময় যদি আপনি আপনার স্ট্যান্ড পালটান তাহলে কিন্তু সেটা আর এক্ষেত্রে গ্রাহ্য হবে না। আপনি কাঁদছেন মিসেস ম্যাসিডন?"

"আমি কখনও স্ট্যান্ড চেঞ্জ করব না মিস দত্তা। আমি আর কখনো ওকে মুখে বলব না 'আই লাভ ইউ'। কারণ আমি জানি আমি আর বলার সুযোগ পাব না।"

কামিয়া চাইল না কিন্তু হয়তো তার গলায় একটা শ্লেষ এসেই গেল, হেসে ফেলে বলে ফেলল,' ইউ রিজ়ার্ভ ইওর রাইট। কিন্তু ব্যাপারটা কি কনট্রাডিকটরি না? ভালবাসতে পারা কিন্তু উচ্চারণ করতে না পারা? আপনার নিজের দমবন্ধ লাগে না? নিজেকে এত যন্ত্রণা আপনি কেন দিচ্ছেন?"

ঠিক এই কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে কামিয়া যা খুঁজছিল, যা বের করে ফেলার জন্য এত রাতের এই ইন্টারভিউ, তা ধরে ফেলল সে।

একটা বিস্ফোরণ হল মিররের মুখে। মাত্র কয়েক সেকেন্ডের একটা বিস্ফোরণ। সে নিজের মুখের ওপর হাত চাপা দিয়ে কয়েক মুহূর্ত অপলকে দেখল মিররকে। সে কল্পনা করেনি আজ রাতে এই ভীষণ সংযত মিরর ম্যাসিডনকে পড়ে ফেলতে পারবে। সে হয়রান হয়ে গিয়েছিল কিছু খুঁজে না পেয়ে। কিন্তু এই একটা ভগ্নাংশ সময়ে মিররের সমস্ত মুখ অপমানে ছয়লাপ হয়ে গেল। মিরর ম্যাসিডনের মুখ, চামড়া, চামড়ার নীচে রক্তনালিকা আর স্নায়ুগুলো সমস্ত হিউমিলিয়েশনটা একটা ঝলক দেখিয়ে আবার চলে গেল কোনও অজানা অতলে। মানুষ যেভাবে অনেক সময় পাতায় লেখা লাইনের অক্ষরে অক্ষরে আঙুল রেখে পড়তে পড়তে যায়, ঠিক সেভাবে মিররের মুখের ওপর সে অদৃশ্য আঙুল রেখে রেখে পড়ে ফেলল, "কনট্রাডিকটরি নয়, ইটস ডেনজারাস!" কী স্ট্রাগল, তাই না?

মেফেয়ার গার্ডেন থেকে বেরিয়েই একটা ক্যাব পেয়ে গেল কামিয়া। বন্ড স্ট্রিট অবধি হাঁটার এখন আর শক্তি নেই শরীরে। নিজেকে সিটে এলিয়ে দিয়ে সে ভাবল কী লম্বা ছিল আজকের দিনটা। তারপরও সে ডেভিডকে একটা টেক্সট করে দিল, "গট ইট।" ডেভিড কল ব্যাক করল সঙ্গে সঙ্গে, "মি. ম্যাসিডনকে জানিয়ে দিচ্ছি। পুওর ম্যান।"

"হ্যাঁ! এলিয়েনেশন অফ লাভ।" বলে হা, হা করে হাসল সে। বোধহয় সারাদিনে এই প্রথমবার। "কী অদ্ভুত প্রতিশোধ তাই না? আসলে সব প্রতিশোধকে কি আর আমাদের আইনি ভাষায় অকারেন্স বলা যায়!"

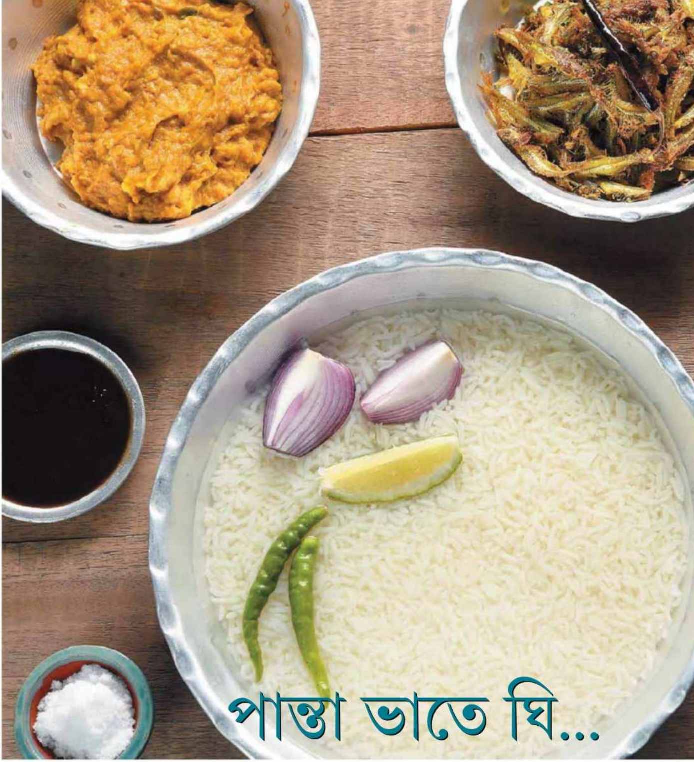
ডেভিড বলল, "বাট ইউ আর গুড! একটার পর একটা ভাল কাজ করছ।"

"মাই জব।"

সে বলতে যাচ্ছিল, "কিন্তু ডেনজারাস জব, তাই না ডেভিড? মানুষের মনটাকে পড়ে ফেলা? সেই জন্যই তো এই পৃথিবীতে আমি এত একা। এটা একটা ডেনজারাস প্রফেশন ডেভিড।" কিন্তু এসব সে বলল না। কেউ এসব বলে না। এসব কথা ভেতরে চাপা দেওয়া থাকে, যতক্ষণ না একজন এক্সপার্ট টেনে বের করতে পারছে। ভীষণ খিদে পেয়েছে। কিন্তু বাড়িতে কোনও খাবার নেই।

সামনে চব্বিশ ঘণ্টার ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে একবার নামবে কি না ভাবল সে। যত ক্লান্তি থাকুক কোনওমতে একটু কেনাকাটা করে নিতে পারলে আবার ক'দিন নিশ্চিন্ত মনে কাজ করা যাবে। আর নইলে অগতির গতি সেই বাড়ির সামনের ডোনার কাবাব। "মা গো, মা!" বলে চোখ বন্ধ করল কামিয়া আর ব্ল্যাকওয়েল টানেলে ঢুকে গেল তার ক্যাব।

অলংকরণ: মহেশ্বর মণ্ডল



পান্তা ভাতে ঘি...

তা কেন হবে! পান্তার বন্ধুর অভাব! টক, ঝাল, মিষ্টির নানা অনুপানে, অনুষঙ্গে সে যে মিতালি পাতাতে ওস্তাদ। আসুন পান্তার ফ্রেন্ডস সার্কলে গুটিগুটি ঢুকে পড়ি আমরা। গরমে এই আলাপ মন্দ হবে না। পান্তার সঙ্গী-সাথীদের সঙ্গে আলাপ করলেন শর্মিলা বসুঠাকুর।

গনগনে গরমে কনকনে পান্তা। জাস্ট ভাবা যায় না। নিঝুম দুপুর। মাথার উপর পাখা ঘুরছে আপন ছন্দে। বেশ মৃদু ঝিমুনি ধরানো একটা আওয়াজ পাখার ঘোরার সঙ্গে সারা ঘরে ছড়িয়ে পড়ছে। কাঠের পুরনো চার টুকরো করে কাটা পেঁয়াজ আর কাঁচালঙ্কা। কোনও ঝুট ঝামেলা নেই, নুন দিয়ে মাখো আর খাও। সঙ্গে সর্ষের তেল দিয়ে মাখা আলুসেদ্ধ। আহা! কী আরাম! জল ঢালা ভাত আর পান্তা কিন্তু এক নয়। সারা রাত জলে ভিজে ভাতে বেশ একটা



> জল ঢালা ভাত আর পান্তা কিন্তু এক নয়। সারা রাত জলে ভিজে ভাতে বেশ একটা তৃতীয় সত্তা তৈরি হয়, থার্ড ফ্যাক্টর যাকে বলে, যা পান্তার পরাণ আর তার সঙ্গে মিতালি হলে স্বাদ একেবারে তুরীয় মার্গে।

যায়ে বই কী! কখনও চটপটা মটর ডালের বড়া, কখনও বা চিকন মৌরলার ঝাল। কখনও পেঁয়াজ দিয়ে বরিঝুরা কখনও বা পোস্তর বড়া। আর ইলিশ মাছের পুরুষ্টু এক টুকরো পেটি ভাজা যদি জোটে তার কপালে, ভরা গরমেও পৌষ মাস। গন্ধরাজ লেবুর সুবাস নিশ্চিত ভ্যালু অ্যাডিশন। যাকে ছাড়া এই ভালোমানুষের একেবারেই চলে না, তিনি হলেন আহ্লাদি অম্বল। মাছের কিংবা আমের, টোম্যাটো বা তেঁতুল, চাই-ই-চাই। তাহলে দেখলেন তো, নিরীহ পান্তার পরিবার বৃহৎ। তার মধ্যে মাত্র কয়েকটিরই উল্লেখ করা হল। চলুন রেসিপিগুলো দেখে নেওয়া যাক।

ডালের বড়া

উপকরণ: মটর ডাল ১০০ গ্রাম, পেঁয়াজ ১টা (বড়), কাঁচালঙ্কা ২ টো, আদাকুচি সামান্য, নুন স্বাদমতো, তেল ভাজার জন্য।

প্রণালী: ডাল ভাল করে ধুয়ে জলে ভিজিয়ে রাখুন। পেঁয়াজ কুচিয়ে নিন। লঙ্কা কুচিয়ে নিন। ডাল বেটে নিন। খুব বেশি জল দিয়ে বাটবেন না। সব উপকরণ একসঙ্গে ভাল করে ফেটিয়ে নিন। আঁচে তেল বসান। তেল গরম হলে ছোট ছোট বড়ার আকারে গড়ে ভেজে নিন।

পটল চিংড়ির ভর্তা

উপকরণ: পটল ২০০ গ্রাম, চিংড়িমাছ ১০০ গ্রাম, পেয়াজ ২টো, কাঁচালঙ্কা ৩-৪ টে, হলুদগুঁড়ো সামান্য, নুন অও চিনি স্বাদমতো, তেল প্রয়োজনমতো।

প্রণালী: পটল চেঁছে ছোট টুকরো করে কেটে নিন। মাছ ধুয়ে নুন ও হলুদ মাখিয়ে রাখুন। কড়াইতে তেল গরম হতে দিন। তেল গরম হলে তাতে পেঁয়াজ দিয়ে ভাজুন। বেশ লালচে ভাজা হলে পটল ও কাঁচালঙ্কা দিন। নাড়াচাড়া করে



বড়ি ঝুরা


মৌরলা মাছের ভুনা


ডালের বড়া

মাছ দিন। স্বাদমতো নুন ও মিষ্টি দিয়ে খুব ভাল করে নাড়তে থাকুন। সব উপকরণ ভালভাবে মিশে একেবারে মণ্ডের মতো হলে নামিয়ে পরিবেশন করুন।

কুমড়ো ভর্তা

উপকরণ: মিষ্টি কুমড়ো ২০০ গ্রাম, পেঁয়াজকুচি ২ টেবলচামচ, কাঁচালঙ্কা ৩-৪ টে, ধনেপাতাকুচি ২ টেবলচামচ, সরষের তেল ২ টেবলচামচ, নুন স্বাদমতো।

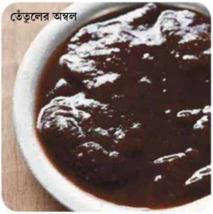
প্রণালী: কুমড়ো সিদ্ধ করে চটকে নিন। এতে পেঁয়াজকুচি, কাঁচালঙ্কা, ধনেপাতাকুচি, নুন ও সরষের তেল ঢেলে একসঙ্গে ভাল করে মেখে নিন। কড়াইতেও নেড়ে নিতে পারেন। তৈরি কুমড়ো ভর্তা।

বড়ি ঝুরা

উপকরণ: বিউলির ডাল বা মটর ডালের বড়ি ১০০ গ্রাম, পেঁয়াজ ২টো, শুকনোলঙ্কা ২ টো, নুন স্বাদমতো, সরষের তেল ভাজার জন্য।

প্রণালী: বড়ি ভেজে গুঁড়িয়ে নিন। পেঁয়াজ কুচিয়ে নিন। তেলে পেঁয়াজ দিন। নরম হয়ে এলে ভাঙা বড়ি দিয়ে ভাল করে নেড়ে শুকনোলঙ্কা ভাজা দিয়ে নামিয়ে নিন।


আমের মিষ্টি মাখা


তেঁতুলের অম্বল


পোড়া টোম্যাটোর ভর্তা


কুমড়ো ভর্তা

মৌরলা মাছের ভুনা

উপকরণ: মৌরলা মাছ ৩০০ গ্রাম, পেঁয়াজ ২টো, হলুদগুঁড়ো ১ চা-চামচ, লঙ্কাগুঁড়ো ১ চা-চামচ, কাঁচালঙ্কাকুচি ২ চা-চামচ, নুন ও চিনি স্বাদমতো, তেল ৩ টেবলচামচ।

প্রণালী: মাছ ধুয়ে নুন ও হলুদ মাখিয়ে ভেঁজে নিন। পেঁয়াজ কুচিয়ে নিন। তেলে পেয়াজ ভেজে একে একে সব উপকরণ দিন। মাছ দিন। ভালভাবে নাড়াচাড়া করুন। ভাজা ভাজা হলে নামিয়ে নিন।

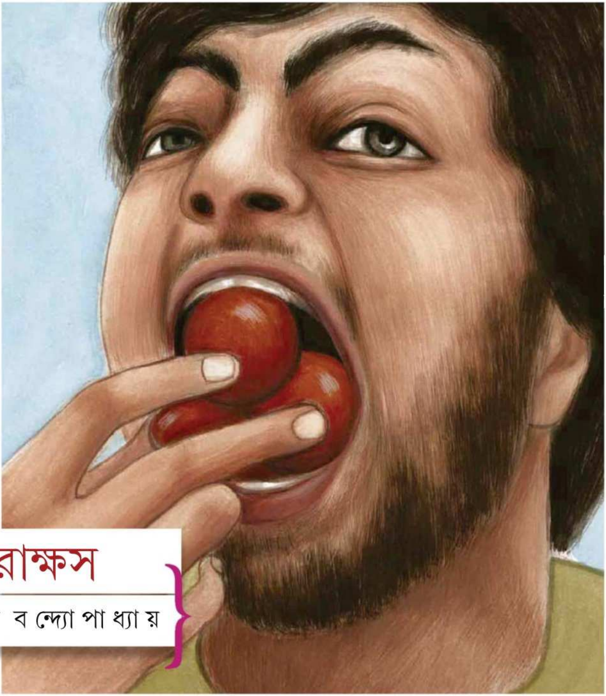

পটল চিংড়ির ভর্তা

আমের মিষ্টি মাখা

উপকরণ: কাঁচা আম ২টো, আম আদা সামান্য, চিনি স্বাদমতো, নুন সামান্য।

প্রণালী: আম খোসা ছাড়িয়ে সেদ্ধ করে নিন। সব উপকরণ একসঙ্গে ব্লেন্ডার চালিয়ে নিন।

ছবি: সোমনাথ রায়



রাক্ষস

তমাল বন্দ্যোপাধ্যায়

“খোকন... খোকন...” প্রলম্বিত সেই ডাকটা এখনও কানে বাজে তার। কী ভীষণ আদর, কী অপার স্নেহ দিয়ে তৈরি কলজে নিংড়ে বার করা ডাক! পাড়াপড়শি বলত খোকনার মা-টার আদিখ্যেতা দেখলে গা জ্বলে যায়! ওই রকম সব হাড়-হাভাতে ঘরের উনপাঁজুরে ছেলেপিলেকে আবার ওরকম পাড়াময় ডেকে ডেকে ঘুরে খুঁজে বেরোনোর কী আছে! দেখ সে ছোঁড়া আবার কোন ভাগাড়ে ঝোপঝাড়ের পেছনে বসে কী না কী টেনে পড়ে আছে!

সে সব অবশ্য বহুকাল আগের কথা। আজ তো আর সেই ডাকও নেই, মা-ও নেই। মরে ভূত হয়ে গেছে তা কিছু না হলেও তিরিশ বছর হল। এখন সে আধদামড়া মরদ, কিন্তু তার সেই খোকনত্ব আর ঘুচল কই? শরীরখানা আড়েদিঘে বেড়ে যতই এইরকম আখাম্বা হয়ে উঠুক না কেন, ফ্যালফেলিয়ে চেয়ে থাকা চোখ দু'টো তো সেই একই, অবোধ শিশুর মতো টলটলে, নির্বিকার!

টাউনের বড় রাস্তার ধারে নামমাত্র সাইকেলের দোকান একখান আছে, কিন্তু বেশির ভাগ দিনই সেটার ঝাঁপ বন্ধ থাকে। খোলা রাখলেও বেশিরভাগ সময়েই কাজের মেজাজ থাকে না আর তখন খদ্দের লিক সারাতে বা পাম্প করাতে এলে ও ডাঁটের মাথায় মুখের উপর বলে দেয় এখন হবে না। ঠোঁটের কোণে বিড়ি গোঁজা, একমাথা কাঁধ অবধি নেমে আসা রুক্ষ বাবরি চুল, পরনে পুলিশের খাকি জাতীয় মোটা কাপড়ের তেলকালি মাখা জামা, শীতের রোদে পিঠ পেতে দোকানের সামনে উবু হয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকবে তাও ভাল। কিন্তু কাজ করবে না।

সেই সময় রেলাটাই আলাদা, ভাবটা এমন যেন ভাল্লাগছে না তাই কাজ করব না! আমার মর্জি করব না, কার বাপের কী!

তাছাড়া মেলা টাকা কামিয়ে হবেটা কী? একা তো লোক। খাবেটা কে? বউ-বাচ্চা সংসার ধম্মোর যখন বালাই নেই, তখন একেবারে ঝাড়া হাত-পা, যদ্দিন আছি মস্তিতে থাকব। আর সেই সব মস্তির বহর কেমন শুনি, মেয়েমানুষের ধারকাছে ঘেঁষার তো মুরোদ নেই তাহলে আবার কী ধরনের মস্তি? জিজ্ঞেস করলে ও বিজ্ঞের মতো মাথা দোলাবে, ঠোঁটের কোণ বেঁকিয়ে এমন একটা তাচ্ছিল্যের হাসি হাসবে যেন বলতে চায় এসব উপর মহলের ব্যাপার-স্যাপার, অধম মানুষ ওসব তোরা কী বুঝবি?
মুখে কিছু না বললে কী হবে ওকে যারা কাছ থেকে চেনে তারা বিলক্ষণ জানে, ওর পয়লা নম্বর মস্তি অবশ্যই রাস্তার দিকে তাকিয়ে ঠায় বসে থাকা। রাস্তা দেখার চেয়ে বড় রগড় দুনিয়ায় আর কী আছে! রাস্তা মানেই সিনেমার মতো 'হেব্বি অ্যাকশান, হেব্বি খিচাইং, ক্যালাকেলি'। তার চেয়েও ভাল্লাগে 'অ্যাক্সিডেন'। চোখের উপর অ্যাক্সিডেন্ট দেখা মানে তো দিনটা সফল। অ্যাক্সিডেন্ট শুনলেই ওর চোখের মণি দপ করে জ্বলে উঠবে, কোথাও অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে কানে এলেই সেদিক পানে ছুট লাগাবে। না না, দুর্ঘটনাগ্রস্তকে সাহায্য করতে না, ভুলেও স্পটের দিকে পা বাড়াতে না। বেশ খানিকটা দূর থেকে ইতিউতি উঁকিঝুঁকি মারা মরখুন্ডে কাক আর উৎসুক নেড়ি কুকুরগুলোর মতো কেসটা খুঁটিনাটি দেখে যেতে, সম্ভাব্য সমস্ত কোণ থেকে পুরো ব্যাপারটার তলানি পর্যন্ত তারিয়ে তারিয়ে চেখে নিতে।
তবে সবচেয়ে বড় 'ইন্টিয়েস' অবশ্যই মরার খবরে। কে জানে কোথা থেকে খবর পায়, মরার গন্ধ পায় কি না কে জানে, পাড়ার বা এলাকায় লোক মরলে ও সে যেখানেই থাকুক না কেন ঠিক সেখানে পৌঁছে যাবে। ভিড় ঠেলে, যাকে বলে টুঁসিয়ে ঢুকে মৃতমানুষটার বাড়ির লোকজন আত্মীয়-বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে গায়ে পড়ে আলাপ জমিয়ে একপ্রকার উপযাচক হয়েই মরদেহের শ্মশানযাত্রার প্রস্তুতিতে লেগে যাবে। তখন পুরো অন্য মানুষ, যেন শোকগ্রস্ত এই বাড়ির কত কালের চেনা! ব্যস্ততা দেখে কে, ওর চেয়ে বড় করিতকর্মা পুরুষ যেন ভূ-ভারতে আর দু'টি নেই। আজ বলে তো না, গত দশ বছর ধরে শ্মশানযাত্রার প্রস্তুতিতে এই জাতীয় তৎপরতার জন্য এলাকায় ওর অন্যরকম একটা চাহিদাও তৈরি হয়ে গেছে। আগেকার সেই দিন তো আর নেই, আজকাল পাড়ায় কেউ মরলে আগের মতো বাড়িতে ভিড় বাড়ে না, কোমরে গামছা বেঁধে লরিতে উঠে হরিবোল চিৎকার করতে করতে শ্মশানে পোড়াতে নিয়ে যাওয়ার লোক জোটানো মুশকিল হয়ে পড়ে। কেউ কেউ এগিয়ে এলেও তাদের মধ্যে অন্ত্যেষ্টির ব্যাপারে সে রকম এক্সপার্ট লোক আর ক'জন! এ পাড়ার লোকজনের তাও কপাল ভাল, এখানে খোকনের মতো নির্ভরযোগ্য একজন আছে। রাতবিরেত হোক বা ভনি্য দুপুরবেলা, ঝড়-জল-তুফান শ্মশান যাওয়ার নামে ওর কোনও ক্লান্তি নেই। 'না' নেই ঘাটে বেরনোর আগের জোগাড়যন্ত্রের ব্যাপারে বাড়ির কর্তা বা পুরুত নাপিতের ফর্দ ট্যাঁকে গুঁজে দশকর্মার দোকানে ছুটতে।
আজকাল অবশ্য ওসব ফর্দ-টর্দ হাতে ধরালে অপমানিত বোধ করে। এত বছরের অভিজ্ঞতা বলে কথা, ঘাটের কাজকম্মো প্রেত-পিণ্ডদান মুখাগ্নি হয়ে যমদেবতাকে সিধে দিয়ে আসা অবধি যা যা লাগে সবই তো ওর মুখস্থ। আর এইসব ব্যাপারে খুঁটিনাটি জ্ঞানগম্যি নিয়ে পাড়ার রতন পুরুতের আস্কারা পেলে ওর সর্দারি বেড়ে দশগুণ হয়ে ওঠে। এই তো সপ্তাহ খানেক আগেই সাহা বাড়ির পঁচানব্বই পেরনো বুড়িটা যেদিন মরল সেদিন রতনের পুরুতের পৌঁছতে খানিকটা দেরি হচ্ছিল বলে বাড়ির বড় ছেলে মধু সাহাকে খালি ফোনে একবার বলেছিল, "খোক্‌নাটা তো আছে চিন্তা কীসের, আমি আধঘন্টার মধ্যে ঢুকছি।" ব্যস, সেই কথা শোনামাত্র ওর কেদ্দারি আর দেখে কে! কাঁধিদের স্বঘোষিত নেতা হয়ে ওঠা থেকে শুরু করে পুড়িয়ে বাড়ি ফিরে শ্মশানযাত্রীদের লোহা ছোঁয়ানো, নিমপাতা দাঁতে কাটানো পর্যন্ত বডি ফেলে যেভাবে সবটা উতরে দিল তাতে বাড়ির লোকজনকে তো ঝক্কি ঝামেলা কিছুমাত্র পোয়াতে হল না।
তার ফল পেয়েছিল হাতেনাতেই। বড়লোক পার্টির বাড়ি বলে কথা, ঘাট থেকে ফেরার পথে বাসস্ট্যান্ডের বিখ্যাত শঙ্করের হোটেলে জব্বর একদফা খানাপিনা জুটেছিল আর নিয়মভঙ্গের দিনে তো একেবারে এলাহি আয়োজন— দই কাতলা, গলদাচিংড়ি থেকে শুরু করে নবদ্বীপের লালদই, নলেনগুড়ের সন্দেশ, সরপুরিয়া... যে যত পারে পুরো কবজি ডুবিয়ে। শেষযাত্রায় যারা কাঁধ দেয় তাদের পেটপুরে খাওয়ানো মহাপুণ্যের কাজ কিন্তু কীসে যে এই খোকনাটার পেট পোরে আর ওর কব্জির মাপটাই বা আদতে কত বড় সেটা নিয়েই সবার যত ধন্দ! সঙ্গীসাথী সবার মুখে এক কথা, পেট তো নয় যেন খনি, না হলে অত খাওয়া যায় কোথায়? ওই তো হাড় জিরজিরে শরীর! কেউ কেউ আবার বলে ওর হাড়ের ভেতরগুলোও নাকি সব ফাঁপা! তবে ওসব কথা হরগিজ কান দেয়না খোকনা, দিয়েই বা কী করবে, শ্মশানে গেলেই যে ওর পেটে আগুন জ্বলে ওঠে। সেই আগুনের আঁচে মাঝে মাঝে মনে হয় যেন আস্ত একটা পাহাড় ভরে দিলে সেটাও ছাই হয়ে হাপিস হয়ে যাবে। তবে এবার শীতটা পড়েছে জাঁকিয়ে। এই রকম প্রবল শীতের জন্যেই সারা বছর হা-পিত্যেশ করে বসে থাকে খোকন, কারণ শীতের কামড় এরকম বাড়লেই পরপারের দিকে পা বাড়িয়ে রাখা বুড়োবুড়িগুলো ঝাঁক বেঁধে যাওয়া শুরু করে। তার ওপর পাড়াটার আবার তেমাথার পাড়া বলে বদনাম আছে, একটা মরলে অন্ততপক্ষে এখানে তিনটে ঠিক মরবেই। আর তাতেই পোয়াবারো হয় ওর। কারণ বিয়েবাড়ি অন্নপ্রাশন গৃহপ্রবেশ পৈতে ইত্যাদি রঙচঙে অনুষ্ঠানে ওর মতো খচাটে মার্কা চেহারার উদ্ঘুটে লোকজন বড় একটা নেমন্তন্ন পায় না। আবার বাড়িতেও কেউ নেই যে ভালমন্দ রেঁধে খাওয়াবে। তাই এইসব শ্রাদ্ধবাড়ির জন্য তক্কে তক্কে থাকা।
পৌষমাসটা মোটের উপর খরা গেছে। মাঘের শুরুতে খসেছে মাত্র এক পিস, তাই ও একটু চিন্তিতই ছিল। রোজ আয়রনভর্তি রাস্তার টিউবকলের জলে স্নান করার জন্য বাদামী হয়ে ওঠা জট পড়া চুলগুলোর মধ্যে আঙুল চালাচ্ছিল আর পাশে বসা জামাই-এর চায়ের দোকানের কাপ-প্লেট ধোয়া ছোকরা নান্টুর কাছে একধারসে এই টাউনের যতো অ্যালাপাতি ডাক্তারগুলোর নামে তেড়ে গাল পাড়ছিল। এই ডাক্তারগুলোই যতো নষ্টের গোঁড়া, এদের জন্যই আজকাল পঁচাশি-নব্বই পেরনো লোকজন সব বিছনায় পড়ে পড়ে পচে গলে হেজে যাচ্ছে তবুও মরতে চাইছে না। "কী শতেক খোয়ার বলত! এই জন্যেই বলে না হাজারটা শকুন মরতে তবে একটা করে অ্যালাপাতি ডাক্তার পয়দা হয়, ওরে শালা সুমুন্দির বিটারা, তোদের টাকার খাঁই মরলেও যাবে না, মানুষগুলোকে ঠিক বয়সে শান্তিতে মরতেও দিবি না!"
ঘাড় নাড়ে নান্টু, এমনিতে ছোঁড়াটা ওর বেশ অনুগত। তাই সেরকম লোকবলহীন সরেস বাড়ি বুঝলে ঘাটে যাওয়ার সময় ওকে মাঝেমাঝেই ওর পাড়ার মোড় থেকে লরিতে তুলে নেয় খোকনা। বদলে সে ওকে খবর সাপ্লাই করে। চায়ের দোকানগুলো তো এমনিতেই দুনিয়ার হরেক রকম খবরের আখরা তাই ওর মুখের খবরে মার নেই। দূর থেকে জামাই-এর দোকানে নতুন একদল খদ্দেরকে ঢুকতে দেখে প্যান্ট ঝেড়ে উঠে দাঁড়ায় নান্টু। এখুনি

জামাই হাঁক পাড়বে, তার আগেই গা ঝাড়া দিয়ে উঠে মুখের বিড়িটা পাশের ড্রেনে ছুঁড়ে ফেলে দোকানের দিকে দৌড় লাগায়। মিনিট পঁচিশ পর ঘুরে আসে ঠোঁটে হাসির রেখা নিয়ে। দেখেই মনে হচ্ছে খবর আছে, জবর খবর। খবর দেওয়ার জন্যই এসেছে তার আগে তবু চোখ মটকে ধাস্টামো করবে। অগত্যা পকেট থেকে খইনির প্যাকেট আর চুনের ডিবেটা এগিয়ে দেয় খোকনা। তালুর উপর ভোঁতা বুড়ো আঙুলটা দিয়ে খইনি ডলতে ডলতে ঘাড়ের কাছে মুখ এনে নান্টু বলে এইটা নিলে এই মাসের দু'নম্বরটা গেল। শুনে নড়েচড়ে বসে খোকনা। নান্টু জানায় দত্তদের বাড়ির ওই যে বুড়োটা অনেকদিন ধরে ভুগছিল না, টেঁসে গেছে। মরেছে কাল রাতে ঘুমের মধ্যে, টের পাওয়া গেছে সকালে। এত বড়লোক অথচ কপাল দেখো, শেষ সময়ে নিজের রক্তের একটা লোকও ছিল না মাথার কাছে। নার্স আয়া কাজের লোকদের জিম্মাতেই থাকত, ছেলেটা মাস গেলে মোটা টাকা পাঠাত আরতি নার্সিংহোমের কর্মচারী কাম দালালের হাতে। বউ মরে গেছে দু'তিন বছর হল। একটাই ছেলে থাকে বাইরে। ছেলেটা ইঞ্জিনিয়ার, থাকে মুম্বই না ব্যাঙ্গালোর কোথায় যেন একটা! খবর পাঠানো হয়েছে কিন্তু তার তো ফ্লাইট ধরে আসতে আসতে রাত হয়ে যাবে। হয়তো বা সকাল, ততক্ষণ বডি পড়ে থাকবে বাড়িতে।

দত্তবাড়ি তো দু'টো-তিনটে আছে পাড়ায়, কোনটার কথা বলছে নিশ্চিত হতেই লাফিয়ে ওঠে খোকন, "আরে ওর ছেলে তো আমার বন্ধু সমু, সম্রাট। ছোটবেলায় একসঙ্গে কিরিকেট খেলতাম।"

তর্জনী বাড়িয়ে খিঁকখিঁক করে হেসে ওঠে নান্টু, ভঙ্গিতে ভরপুর অবিশ্বাস "সবাই তোমার বন্ধু, ওই বাড়ির ছেলে তোমার বন্ধু! গুল মারার আর জায়গা পাও না? কত বড় চাকরি করে জানো? বছরের আদ্ধেক বিলেতে থাকে, ওসব লোকের ধারের কাছে ঘেষতে পারবা যে বলছ?"

অসহায় চোখে তাকায় খোকন, পাশে পড়ে থাকা সাইকেলের একটা ভাঙা হ্যান্ডেল চেপে ধরে বলে "এই লোহা ছুঁয়ে বলছি, মা কালীর দিব্যি বলছি, কী করলে তুই বিশ্বাস করবি বল? আচ্ছা চল, সমুকে আসতে দে, তোকে ওর সামনে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করিয়ে যদি কথা বলিয়ে না দিতে পারি তো আমার নামে কুত্তা পুষিস।"

অনেকভাবে চেষ্টা করেও কিছুতেই বিশ্বাস করাতে পারেনা নান্টুটাকে। দোকানের পোশাকটা পাল্টে বাড়ি থেকে একটা পরিষ্কার জামা গায়ে গলিয়ে জোর পায়ে দত্তবাড়ির দিকে পা চালাতে থাকে আর ভাবতে থাকে সত্যিই তো, সম্রাট দত্তকে কি সত্যিই ওর বন্ধু বলা যায়? হ্যাঁ এটা ঠিক ওরা পাড়ার মাঠে বিকেলবেলায় বহুবার একসাথে খেলেছে, ফুটবলও পিটিয়েছে গরমকালে। সে তো হতেই পারে, ওইসব খেলায় দু'দলে ভাগ হয়ে খেলতে এক দঙ্গল ছেলেপিলে লাগে, তাতে সমুদের মতো অত্যুজ্জ্বল মেধাবী ছেলেও যেমন থাকে তেমন থাকে ওর মতো ওঁচাটে উড়ুক্কু ছেলেপিলেও। সেই সম্পর্কের ভিত্তিতেই কি কাউকে বন্ধু বলা যায়?

সে সব দিনের কথা নিশ্চয়ই সমুর মনে নেই। সে থাকুক বা না থাকুক পাড়ার ভিতরে মরার খবর যখন কানে এসেছে তখন তো তাকে যেতেই হবে। চেনাজানার ক্ষীণ একটা সুতো যখন বেরিয়েছে তখন তো আরও বেশি করে যেতে হবে। যাই হোক, দত্তবাড়ি গিয়ে দেখে পরিস্থিতি যেমনটা ভেবেছিল তেমনটাই, বাড়ির লোকজন বাড়িতে না থাকলে যা হয় আর কী! মরদেহ পড়ে আছে একদিকে, দূর সম্পর্কের দু'-একজন আত্মীয়স্বজন যারা এসে পৌঁছেছে তাদের কথাবার্তা থেকে যেটুকু বোঝা গেল মেয়ে জামাই চণ্ডীগড় থেকে ফ্লাইটে উঠেছে একটু আগেই, কিন্তু ছেলের ফোন সকাল থেকে বন্ধ ছিল তাই খবর পেয়েছে দেরিতে, ফ্লাইট ধরতে ধরতে নাকি দুপুর গড়িয়ে যাবে। তার মানে কলকাতা হয়ে এই মফস্‌সল শহরে এসে পৌঁছতে রাত।

হালচাল দেখে খোকনা থ, দুপুর পেরিয়ে বিকেল হতে এল কিন্তু এ বাড়িতে কারও কোনও হেলদোল নেই, মৃতদেহর কাছে বসে ফোঁপানি নেই, কান্না নেই। সন্ধে নাগাদ বাড়ির ছেলের ফোন পেয়ে হঠাৎ যেন টনক নড়ল সবার, এখানে আপাতত মুরুব্বি এ বাড়ির এক দূর সম্পর্কের জামাই দীপেনবাবু গেটের মুখে দাঁড়িয়ে এই পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার বিধান বিশ্বাসের ডানহাত কান্তিকে বলছিল সমু নাকি এই মাত্র দমদম এয়ারপোর্টে নেমেছে, বলেছে ঘাটে যাওয়ার সব জোগাড়যন্ত্র করে রাখতে, রাস্তায় যদি খুব জ্যাম না থাকে তাহলে ঘণ্টাচারেকের মধ্যে এসে বডি নিয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রওনা দেবে।

নান্টু জানায় দত্তদের বাড়ির ওই যে বুড়োটা ভুগছিল না, টেঁসে গেছে। মরেছে কাল রাতে ঘুমের মধ্যে, টের পাওয়া গেছে সকালে।



শ্মশানে পোড়াতে গেলে কাউন্সিলারের যে সার্টিফিকেট লাগে সেটা দিতে এসেছিল কান্তি ঘোষ, জামাই ভদ্রলোক ওকে ধন্যবাদ জানিয়ে বললেন, "আমি তো এ পাড়ায় নতুন, কাউকে তেমন চিনিনা। এদিকে সময় পেরিয়ে যাচ্ছে, আমার চেনা পুরুতটার আবার আজ বিয়ের কাজ। আপনাদের এদিকে পুরুত নাপিত কেউ থাকলে একটু কন্ট্যাক্ট করিয়ে দেবেন। আর হ্যাঁ, কিছু পাড়ার ছেলেপিলে গেলে ভাল হত, বুঝতেই পারছেন আমাদের বাড়ির পুরুষ মানুষ এই যা তিন-চারজন..."

হাওয়ায় হাত নেড়ে নিশ্চিন্ত করে কান্তি ঘোষ, "ওসব নিয়ে ভাববেনই না, আমি রতন ঠাকুরমশাই আর গঙ্গা নাপিতকে ফোন করে দিচ্ছি আর আমাদের কিছু ছেলেপিলেকেও। বেশি দেরি করা ঠিক হবে না, উনি তো কাল মাঝরাতে গিয়েছেন, দেরি করলে আবার পচন টচন ধরে যেতে পারে।"

কাছেই দাঁড়িয়ে থাকা খোকন অযাচিতভাবেই প্রসঙ্গের মধ্যে ঢুকে আসে, বিশেষজ্ঞের মতামত দেওয়ার মতো সুরে বলে, "হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক, একদম ঠিক, দেরি করা একদম ঠিক হবে না। 'এক্সপ্রিয়েন্স' থেকে বলছি এই সিজিনে ঘাটে হেবি চাপ থাকে, রাত বারোটায় গিয়ে চুল্লিতে নাম লিখালেও দশজনার পরে লাইনে পড়তে হবে, একটা বডি পুড়াতে কম করে পঁয়তাল্লিশ মিনিট লাগলে হিসেব করে দশটায় কতক্ষণ, সকাল হয়ে যাবে।"

চেহারা বেশভূষা দেখে ভ্রু কুঁচকে ওর দিকে তাকায় দীপেনবাবু। ভ্রু ভঙ্গিতেই প্রশ্ন লেখা ছিল, স্বতঃপ্রণোদিত হয়েই উত্তর দিতে আরও দু'পা এগিয়ে আসে খোকন, "আমি পাড়ার ছেলে, সমুর ছোটবেলার বন্ধু, ছোটবেলায় এ বাড়িতে কত এসেছি। আমরা তো আছি, আপনি কোনও রকম চিন্তা করবেন না।"

ভদ্রলোক কৌতূহলী চোখে কান্তি ঘোষের দিকে তাকালে মোটর সাইকেলে স্টার্ট দিতে দিতে কান্তি বলে, "ওই তো, ও যখন চলে

এসেছে আর চিন্তাই করবেন না। ও এইসব ব্যাপারে খুব কাজের লোক দাদা। ওকে দায়িত্ব দিয়ে ছেড়ে দিন একাই ঘাড়ে নিয়ে জোগাড়যন্ত্র সব তুলে নেবে, আপনাদের কাউকে ভাবতেই হবে না।"

প্রশংসা শুনে গদগদ হয়ে ওঠে খোকনা, ঘাড়টা সামান্য ঝাঁকিয়ে বেশ এক ধরনের কেতার সঙ্গে বলে, "না মানে আজ যা ঝ্যামেলায় ছিলাম, অন্য কোনও বাড়ি হলে আসতাম না। কিন্তু সমুর বাবা বলে কথা, কাকাবাবুকে কতবার আমার দোকানের সামনে দিয়ে বাজারে গেছেন, শুনে না এসে পারা যায় বলুন?"



পাড়ার ভিতরে মরার খবর যখন কানে এসেছে তখন তো তাকে যেতেই হবে। চেনাজানার ক্ষীণ সুতো যখন বেরিয়েছে তখন আরও বেশি করে যেতে হবে।

"সে তো বটেই। যাক আপনার মতো কাউকেই একজন খুঁজছিলাম। আসলে আমি তো এদিককার বাজারহাট সব কোন দিকে কিছুই জানি না," ঠোঁট কামড়ে হাসেন দীপেন, যাওয়ার আগে কান্তি ঘোষ ওঁর কানের কাছে ফিসফিসিয়ে খোকনের সম্পর্কে যা বলার বলে গেছে।

"ওসব নিয়ে আপনি ভাববেনই না, পাড়ার লোক হয়ে এটুকু না করলে কী করে হবে! কান্তি রতনদাকে ফোন করে দেবে বলে গেল, আপনি তাও একবার নিজে থেকে করেন। আমার কাছেও ওর মুবাইল নাম্বার রাখা আছে।"

বের করে খোকন, তার মধ্যে থেকে এক টুকরো ভাঁজ করা কাগজ বার করে ভদ্রলোকের দিকে এগিয়ে ধরে, ও যে এখানে উপস্থিত আছে সেটা জানাতেও বলে ঠাকুরমশাইকে। উনি ফোন করলে রতন পুরুত জানায়, হ্যাঁ কাউন্সিলারের অফিস থেকে ওকে একটু আগেই ফোন করা হয়েছিল, যেতে সে পারবে তবে ঢুকতে ঢুকতে রাত আটটা সাড়ে আটটা মতো হয়ে যাবে। তার মধ্যে খোকনকে ঘাটের কাজে যা যা জিনিসপত্র লাগে আনতে দিয়ে দিলে ও নির্ভুল এনে দিতে পারবে। বিশ্বস্ত লোক, এসব ব্যাপারে সব জানে।

বয়োজ্যেষ্ঠ কর্তাস্থানীয় তেমন কেউ না থাকায় একা কোন দিকে যাবেন, কী করবেন বুঝে উঠতে পারছিলেন না দীপেনবাবু। খোকনার পিঠে আলতো হাত রেখে তাই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন। ওর হাতে বেশ কিছুটা টাকা তুলে নিয়ে জিনিসের একটা ফিরিস্তি দিতে গেলে হাত তুলে বাধা দেয় সে। আপাদমস্তক বিনয়ের সুরে বলে, "ওসব কিছু বলতে হবে না দাদা, সবটা বিশ্বাস করে আমার উপর ছেড়ে দিন, কাজে খুঁত পেলে খালি বলবেন।"

টাকাপয়সা নয়-ছয় করার বান্দা কোনওদিনও ছিল না খোকন। দড়ি, লজ্জাবস্ত্র, কলারপেটো থেকে শুরু করে পাটকাঠি, তিল, ঘি, মধু, কাঁচা দুধ সব গুছিয়ে নিয়ে হাজির হয় যথাসময়ে। নান্টুকে দায়িত্ব দিয়ে একটা খাট আর কিছু বাঁশও আনিয়ে নেয় রিকশা করে। হিসেবের কাগজ আর অবশিষ্ট টাকা ওই জামাই ভদ্রলোকের হাতে তুলে দিতে আড়চোখে দেখে এ বাড়ির মেয়ে জামাই চলে এসেছে ইতিমধ্যে। আজ থেকে বিশ বছর আগের সেই যে রোগা লাজুক মেয়েটি আর একেবারেই তেমনটি নেই। চেহারা এখন মোটের উপর ভারিক্কি, দারুণ ব্যক্তিত্বময়ী, চুলে রঙে লালচে আভা, গা বেয়ে চুঁইয়ে পড়ছে গ্ল্যামার, এরা সব কী খায় কে জানে?

হাঁ করে তাকিয়ে ছিল সেই দিকে, সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে ওকে আর নান্টুকে উপর তলায় ডাক দেন দীপেনবাবু। মৃতদেহ খাট থেকে নীচে নামাতে ওদের সাহায্য দরকার। বাড়ির মহিলারা বলছে যে বিছনায় উনি শুতেন সেই সব তোষক, লেপ, কম্বল শ্মশানযাত্রার খাটের সঙ্গে দিতে। ওসব একসঙ্গে বাঁধাছাঁদা করে গঙ্গার ধারে ফেলে দিয়ে আসতে হবে।

সেই মতো রোগশয্যার যত বালিশ, কাঁথা, লোটাকম্বল ঘাড়ে করে নিয়ে নিচে নামছিল খোকন। এমন সময় দেখল সদর দরজা দিয়ে সমুকে সস্ত্রীক ঢুকতে। আহা, কী চেহারা হয়েছে! রঙ ফেটে পড়ছে গা থেকে, যেন সাহেব বাচ্চা! এ কী তার সেই মাঠে একসঙ্গে রোদে পুড়ে বল পেটানো বন্ধু, না না হতেই পারে না। ও খোকনের পাশ দিয়েই হেঁটে উপর তলায় গেল কিন্তু ওর দিকে একবার তাকালও না। সেটাই স্বাভাবিক! বেড়াতে তো আসেনি, মৃত বাবাকে দেখতে এসেছে শয়ে শয়ে মাইল পেরিয়ে। অন্য কোনও দিকে তাকাবেই না কেন?

খুব ইচ্ছে করছিল উপর তলায় গিয়ে নিজের পরিচয় দিয়ে শোকবিহ্বল বন্ধুকে কিছুটা সান্ত্বনা দিতে, কিন্তু এখন নির্ঘাত খুবই কাতর মানসিক অবস্থায় রয়েছে, এই অবস্থায় গিয়ে কথা বলাটা সমীচীন হবে না। তার চেয়ে অপেক্ষা করা ভাল। কথা বলার অনেক সুযোগই পাওয়া যাবে খানিকক্ষণ পর থেকে। তার চেয়ে আপাতত দাঁ দিয়ে বাঁশগুলোর গাঁট ছুলে সাইজ মতো কাটা, পাটের দড়ি দিয়ে বেঁধে মাচা বানানো, তার উপর পাটি পেতে মরার খাটের সঙ্গে সেট করা বেশি জরুরি।

তবু তর সইছিল না খোকনের। সমুর সঙ্গে একটিবার কথা বলার সুযোগ খুঁজছিল কাজের ফাঁকে ফাঁকে। ওকে নিচের তলায় উঠোনে নেমে আসতে দেখল বটে কিন্তু বাড়ির অত লোকের মাঝখানে কাছে গিয়ে পরিচয় দিয়ে কথা বলার সাহস জোগাড় করে উঠতে পারে না। তারপর একবার একধারে একা পেয়ে যাব কি যাব না করতে করতে শেষে এগিয়েও গেল একেবারে কাছে, কিছু একটা বলতেও গেল কিন্তু ঘাবড়ে গিয়ে কিছুই বলে উঠতে পারল না।

রাস্তার জামাকাপড় ছেড়ে সাধারণ ফতুয়া-পাজামা পায়ে নির্জন কোণে একটা সিগারেট ধরিয়ে নিজের ফোনের দিকে দাঁড়িয়েছিল সমু, সেই সুযোগে ওর দিকে এগিয়ে গিয়ে হাসিহাসি মুখ করে তাকায় খোকন। কে না কে ভেবে, চোয়াড়ে দর্শন লোকটার মাথা থেকে পা পর্যন্ত চোখ বুলিয়ে বিন্দুমাত্র পাত্তা না দিয়ে হাতের মোবাইল ফোনটা নিয়ে ভাল টাওয়ার পাওয়ার আশায় বাইরের দিকে পা বাড়ায় সমীরণ। গায়ে মাখে না বিশেষ, অনুসরণ করে এগিয়ে ফোন কানে ব্যস্ত বন্ধুর পিছনে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

ফোনটা কেটে চকিতে বাঁক নেয় সমু। বিরক্ত ভঙ্গিতে ঝাঁঝিয়ে উঠে বলে, "কী হল, আশপাশে এই ভাবে ঘুরঘুর করছেন কেন? কী চাই?"
বিগলিত বদনে খোকন বলে, "কিছু না, কি রে তুই আমায় চিনতে পারলি না সমু? আমি খোকন। ছোটবেলায় শৈলেন করের মাঠে আমরা সবাই একসঙ্গে খেলতাম, কিশোর বাহিনি করতাম। মনে নেই?"
ভ্রু কুঁচকে তাকায় সমু। মগজে যথেষ্ট চাপ দিয়েও মুখটা মনে করতে পারে না। ছোটবেলায় মাঠে খেলাধুলোর সময় কত ছেলেপিলেই তো ছিল, সবাই কে কি মনে রাখা সম্ভব? তাছাড়া সেই বয়সের মুখ আর এই বয়সের মুখ কি আর এক হল!
নাছোড়বান্দা খোকন বলে, "সেই মনে নেই তুই আর আমি কতদিন তোদের বাড়ির পিছনের জায়গাটাতেও খেলেছি। আমি হাত ঘুরিয়ে বল করতে পারতাম না বলে তুই আমায় গায়ের জোরে ছুঁড়ে বল করতে বলতিস আর তুই হাঁকিয়ে ছয় মারতিস। আমি ঝোপঝাড় আগানবাগান যেখান থেকে হোক বল খুঁজে আনতাম। মনে আছে সেইবার পাড়ার মাঠে সবাই মিলে খেলার সময় সুজয় বলটা এমন জোর তুলে ছক্কা মারল, বল গিয়ে পড়ল তপন মাস্টারের বাড়ির ছাদে। বাড়ি তালাবন্ধ তাই আমি পাশের জামগাছটা দিয়ে উঠে সেই বল নামিয়ে নিয়ে এসেছিলাম, নামতে গিয়ে ডাল ভেঙে পড়ে মরছিলাম আর কী, মনে আছে?"
এই সময়ে এইসব খেজুরে আলাপ ভাল লাগছিল না সমীরণের। তবে হ্যাঁ, হালকা একটা ছবি মনে পড়ছে না তা নয়। একটা রোগা প্যাংলা ন্যালাখ্যাপা ছোকরার ছবি। ছেলেটা ওদের কাছে ছিল অনেকটা ফাইফরমাশ খাটার ছেলেগোছের। মাঠে ব্যাট উইকেট কাঁধে করে বয়ে এনে দিত, আদারবাদার থেকে বল খুঁজে এনে দিত, ফুটবলের মরশুমে নেট খাটাতো, মাঠে খুব ধুলো হয়ে গেলে জল ছিটাত। দোলের সময় ভালো নেড়াপোড়া বাঁধত, সবচেয়ে বেশি রঙ ওকেই মাখানো হত। এমনিতেও গায়েগতরে জোর বেশি ছেলেরা ওকে ধরে ধরে মারত, নির্মমভাবে মারা ছিল ওদের কাছে বিনোদন আর লাথি খেলেও ও দাঁত বের করে হাসত।
ভ্রু-যুগল যেন সামান্য নড়ে উঠল সমুর আর তাতে যারপরনাই উৎসাহিত হয়ে উঠল খোকন, "কাকাবাবুর যাওয়ার খবর পেয়ে তাই আর থাকতে পারলাম না, চলে এলাম। তোর আসতে দেরি হচ্ছিল, তার মধ্যে ঘাটের সব জিনিসপত্র সব গুছিয়ে নিয়ে চলে এসেছি। কাজ সব রেডি, তুই কিচ্ছু চিন্তা করিস না, এবার ঘাটে রওনা দিলেই হল।"
ঘাড় কাত করে সমু। সে চেনস্মোকার, আর একটা কিংসাইজ় সিগারেট বার করে ধরাতে গিয়ে দেখে লুব্ধ দৃষ্টিতে ওটার দিকে তাকিয়ে আছে খোকন। এ বাড়ির সেই দুঃসম্পর্কের জামাই ভদ্রলোককে দ্রুত পায়ে এদিকে এগিয়ে আসতে দেখে সরে দাঁড়ায় সে। "ওহ তুমি এখানে আর আমি সারা বাড়ি তোমায় খুঁজে বেরাচ্ছি", এখানে থামের আড়ালে সমুকে খুঁজে পেয়ে বলে ওঠেন দীপেন। তারপর ব্যক্তিগত কিছু কথা বলতে ওকে নিয়ে যায় আরও একটু পিছন দিকে। দরকারি পারিবারিক কথা সেরে কানের কাছে মুখ এনে খোকনা সম্পর্কে বলে, "এই লোক তোমার চেনা কিনা জানিনা কিন্তু খুব কাজের লোক, একাই দায়িত্ব নিয়ে ঘাটের গোছগাছ সব করে ফেলছে। কাউন্সিলারের অ্যাসিসটেন্ট লোকটা আমায় বলে গেল এই লোককে হাতে রাখতে, প্রচুর নাকি খেতে পারে, পেট পুরে খাইয়ে দিলে শ্মশানের যাবতীয় কাজ নাকি একাই তুলে দেয়।"
চতুর হাসি ঠেলে ওঠে দীপেনবাবুর ঠোঁটে। চোখের কোণ হেসে ওঠে বহুজাতিক সফটওয়্যার সংস্থার উচ্চপদস্থ কর্মী সমীরণ দত্তেরও। দীপেনবাবু চলে গেলে হাতছানি দিয়ে খোকনাকে কাছে ডাকে। ফতুয়ার পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেটটা বার করে একটা কিংসাইজ এগিয়ে ধরে ওর দিকে। সীমাহীন আহ্লাদে লাফিয়ে ওঠে খোকনার হৃদযন্ত্র। এইসব বড় চাকুরে হাই-ফাই ক্লাসের লোকজনের কাছ থেকে পাত্তা পেলে ওর উদ্দীপনা কিছুতেই আর বাগে থাকতে চায় না, তার চেয়েও বড় কথা হল ছোটবেলার বন্ধু তাহলে ওকে ভোলেনি।
অত বড় সুন্দর আর দামি সিগারেটটা প্রাণে ধরে খেতে চায় না, পকেটে পুরে রেখে হাতের কাজে মেতে ওঠে নজিরবিহীন তৎপরতায়। বাড়ির লোকদের সঙ্গে বডি ধরাধরি করে এনে শুইয়ে গায়ের উপর সাদা কাপড় বিছিয়ে দেয়। পায়ের তলায় আলতা মাখিয়ে সাদা কাগজে ছাপ নেয়। বুকের উপর গীতা রাখে, চোখের পাতায় তুলসি। খুঁটিগুলোয় রজনীগন্ধার স্টিক আর ধূপকাঠি গুঁজে কাঁধে তোলার জন্য খাট একদম রেডি করে ফেলে। শবের মাচা কাঁধে তুলে বাতাস ফাটিয়ে 'বল্লো হোরে হোরে বোল' ধ্বনি তোলে। নবদ্বীপ ঘাটে পৌঁছে লরি থেকে ঝাঁপ মেরে নেমে চুল্লির অফিসে গিয়ে কাগজপত্র দেখিয়ে নাম লেখায়। মাঘের সঘন গম্ভীর রাত, ঘড়ির কাঁটায় তখন রাত প্রায় সাড়ে ন'টা। তখনই সিরিয়াল আরও সাত জনার পরে। মানে পুড়িয়ে বেরতে বেরতে রাত কাবার হয়ে যাবে।
একবার শ্মশান চত্বরে পা দেওয়া মানে যেন তার মুক্তাঞ্চলে ঢোকা। কে বলবে এ এক ভয়াবহ জায়গা! শবযাত্রীদের কলরব, কান্না, কীর্তন, হৈ হুল্লোড়ে এখানে যেন রোজকারের মেলার মতো গমগমে পরিবেশ। এই রকম আবহাওয়ার মধ্যে ঢুকে বেমক্কা এক আনন্দে পাগল পাগল লাগে হঠাৎ। তার উপর মাসে লাখের উপর মাইনে পাওয়া বিলেত ফেরত বাল্যবন্ধুর হেসে কথা বলার আনন্দ ধরে রাখা যাচ্ছে না শরীরের সীমায়।
বডি ওয়েটিং রুমে শুইয়ে রেখে নান্টুর সঙ্গে মিনিট কুড়ির জন্য বেপাত্তা হয়ে যায় ও। ছাপড়ার বেড়ার দেওয়াল ঘুপচি একটা চা-জলখাবারের দোকানের পিছনের অন্ধকার থেকে বেশ কয়েক ছিলিম গাঁজা টেনে আনন্দটাকে সারা শরীরে চাড়িয়ে নিয়ে আসে। তাতে অবশ্য কাজের ক্ষমতায় ছেদ পড়েনা বিন্দুমাত্রও। রতন পুরুতের পাশে বসে নদীর ধারে প্রেতপিণ্ডদানে কলা, কাঁচাদুধ, মধু, তিল দিয়ে পিণ্ড মেখে কলার পাতায় জোগাড় দিয়ে চলে অনবরত। বিদেহী আত্মা আর পূর্বপুরুষদের পিণ্ডের ডেলার উৎসর্গ দিতে দিতে ক্লান্ত দেখায় সমুকে, কিন্তু খোকনার কোনও ক্লান্তি নেই।
তবে দুপুরে দত্তবাড়িতে কাজের নেশায় কয়েক কাপ লিকার চা ছাড়া পেটে কিছু দিতে ভুলে গিয়েছিল খোকন। পুড়িয়ে ফেরার পর পেট-ঠেসে খাওয়ার যখন একটা অপেক্ষায় আছেই তখন পাকস্থলিটা যথেষ্ট ফাঁকা তো রাখতেই হবে। ভেবেছিল তার আগে পেটের ভার মোটেও বাড়াবে না কিন্তু পাড়ার ছোঁড়াগুলো দঙ্গল বেঁধে যেরকম জোরজার করল যে ঝোপের ফাঁকে গিয়ে উপর্যুপরি চার পেগ গলায় ঢেলে আসাটা আটকানো গেল না কিছুতেই। দত্তদের জামাই কাঁধিদের নিজের হাতে উপহার দিয়েছে। দামি মদ, গন্ধ বেরয় না। তাই ওই পা টলেনি একেবারেই তবে খালি পেট থাকায় চোঁয়া ঢেঁকুর ওঠা শুরু হয়েছে, গ্যাসও দিয়েছে উর্ধ্বমুখী ঠেলা।
এক খিলি পান গালে ভরে মুখের ঝাঁঝালো গন্ধটাকে ঢেকে ফেলে বেমালুম। থমথমে মাঝরাত। সারা শ্মশানটার আনাচকানাচ টইটই করে ঘুরতে ঘুরতে বুকের ভেতরটা কেমন যেন মুচড়ে ওঠে। চাগাড় দিয়ে ওঠে বহুবছরের বেদনা। নিজের মায়ের মরা থমথমে মুখটা মনে পড়ে। ওঁকে এই শ্মশানেই পোড়াতে আসার

দিনটা। খুলির ভেতরে বহুক্রোশ দূর থেকে ভেসে আসা ক্ষীণ একটা ডাকের অনুরণন ক্রমশ বাড়তে বাড়তে পাক খেয়ে ওঠে যেন "খোকন খোকন...।" সহসা কেমন যেন সমব্যথী হয়ে উঠে ছুটতে ছুটতে এসে দাঁড়ায় সমুর পাশে। বন্ধুকে একটা গাছে ভর দিয়ে অন্যমনস্কভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ভাবে ওর ভেতরে এখন নিশ্চয়ই পিতৃবিয়োগের যন্ত্রণা চরমে উঠেছে।

সাহস করে ওর পিঠে হাত রাখে খোকনা, "একদম দুঃখ করবি না, বাবা-মা কি মানুষের চিরকাল থাকে? আমার মা-টাও এইরকুমই এক শীতের রাতে... মেনে নিয়া যায় না জানি তবু তো মেনে নিতে হয় বল। আমাদের সব্বাইকে একদিন না একদিন এইদিনটা..." বলতে বলতে ডুকরে কেঁদে ওঠে। এত বড় বেখাপ্পা দামড়া বলদের মতো চেহারার লোকটাকে হাপুস নয়নে কাঁদতে দেখে হাসি পায় সমীরণের। আস্তিনের আড়ালে হাসি ঢেকে অস্ফুটে বিড়বিড় করে যত্তসব পাগলছাগল উটকো মাতালের ভ্যানতাড়া।

চুল্লির মাইকে আগের সিরিয়াল নাম্বার অ্যানাউন্স হতেই কান্না থামিয়ে গা ঝাড়া দিয়ে দাঁড়ায়। পরবর্তী মৃতদেহ রেডি করতে বলছে শুনে সমুকে ইশারা করে অনুসরণ করতে বলে ওয়েটিং রুমের দিকে ছুট দেয়। একার ঘাড়ে সব দায়িত্ব তুলে নিয়ে বডি গঙ্গায় স্নান করিয়ে আনে। সর্বাঙ্গে ঘি মাখিয়ে তার উপর লজ্জাবস্ত্র বিছিয়ে উত্তরশিরা করে শুইয়ে দেয় বেদিতে। পুরোহিতের মন্ত্রোচ্চারণের সঙ্গে পাটকাঠি জ্বালিয়ে বন্ধুর হাতে তুলে দিয়ে মৃতের চারদিকে সাত বার প্রদক্ষিণ করিয়ে মুখাগ্নি করায়। কাঁধিদের দিয়ে তুলিয়ে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দেয় চুল্লির সামনের চাতালে। পোড়ানো হয়ে গেলে ফার্নেসের পিছন থেকে ডোমের হাত থেকে অস্থি সংগ্রহ করে। সমুকে দিয়ে সেই অস্থি জলে ভাসিয়ে স্নান করিয়ে বটতলার কোণে নিয়ে গিয়ে কাছা পরায় নিজের হাতে।

দাহকার্য শেষ করে যখন ওদের গাড়ি শেষমেষ শ্মশান চত্বর ছাড়ে তখন রাত প্রায় তিনটে। ফাঁকা রাস্তা দিয়ে ঝড়ের মতো এগিয়ে সাড়ে তিনটে নাগাদ গাড়ি এসে থামে পান্থতীর্থের মোড়ের এক নামকরা হোটেলে। ভাতের হোটেল কাম মিষ্টির দোকানটা সারা রাত খোলা থাকে দূরপাল্লার বাস আর শবযাত্রীদের জন্যেই। এখানকার খাবারদাবারের সুখ্যাতি জেলাজুড়ে, তাই সারা রাত খালি পেটে থাকার পর এই চত্বরে ঢুকতেই খিদেটা চাগাড় দিয়ে ওঠে সবার। তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি বলাই বাহুল্য খোকনের তো বটেই। যদিও সন্ধে থেকে হাবিজাবি জিনিস পেটে দেওয়ার ফলে পেট গজগজ করছে। গা বমি বমি দিচ্ছিল খুব। তবু এই রকম মওকা তো বারবার আসবে না।

হোটেলের চেয়ারে পাড়ার শ্মশানবন্ধুদের বসিয়ে ওদের সামনে বিধিবদ্ধ হাত জোড় করে বাড়ির পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানালেন দীপেনবাবু। খোকনার ঘাড়ে হাত রেখে দিলদরিয়া উচ্চারণে বলে উঠলেন, "আজ আপনারা সবাই আমাদের পরিবারের জন্য যা করলেন তার জন্যে আমরা আপনাদের কাছে সর্বান্তকরণে কৃতজ্ঞ আর খোকনবাবুর কথা আর কী বলব, যাই বলা যাক তাই কম পড়বে। তাই আপনাদের কাছে অনুরোধ আপনারা দয়া করে কেউ লজ্জা করবেন না। যার যা ইচ্ছে, যতখানি ইচ্ছে চেয়ে খাবেন। আপনারা প্রাণভরে খেলে তবেই আমাদের শ্রদ্ধেয় শ্বশুর মশাইয়ের স্বর্গপ্রাপ্তির পথ প্রশস্ত হবে।"

'খোকনবাবু' সম্বোধনটা শেষ কবে শুনেছে মনে পড়ে না। মোহাচ্ছন্ন ভঙ্গিতে সে তাকায় সমীরণ দত্তর দিকে। সমু এগিয়ে এসে ওর তেলচিটে চুলের মধ্যে আঙুল পুরে সামান্য এলোমেলো করে দিয়ে একমুখ হেসে বলল, "দীপেনদা যা বলল যেন মনে থাকে, খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারে কিন্তু আমরা কোনওরকম কিপটেমি করতে চাই না। পেটভরে মন সবচেয়ে বেশি যতখানি চায় খাবি আর আমায় পিতৃদায় থেকে মুক্ত করবি। কী ঠিক আছে তো?"

"সব ঠিক আছে, ওসব নিয়ে তোকে কিছু ভাবতে হবে না।" আহ্লাদে আটখানা খোকন বলে।

"হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই ব্যাপারে খোকনদাকে কিচ্ছু বলতে হয় না দাদা। ওকে শুধু আপনি পারমিশনটা দিয়ে দিন। আজ আগের সব রেকর্ড ভেঙে দিতে হবে," সোল্লাসে হাওয়ায় দু'হাত ছুঁড়ে বলে পাড়ার ডাকসাইটে ছেলে স্বপন পোদ্দার।

"রেকর্ড কী রকম শুনি," কৌতূহলে গলা বাড়িয়ে তাকায় সমীরণ দত্ত।

"সে দাদা অনেকরকম আছে। লুচির একরকম রেকর্ড, কাতলার আরেকরকম, মাটন, রসগোল্লা, সন্দেশের আলাদা আলাদা। তবে এই দোকানের বিখ্যাত আইটেম হল গরম গরম গোলাপজাম।" সমীরণের দিকে চোখ টিপে ছেলেটা চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ায়, "খোকনদা আমাদের পাড়ার গর্ব দাদা। যা টানতে পারে ভ্যাকুম ক্লিনারও ফেল। কিন্তু পাশের পাড়ার কানাই হালদার আগের সপ্তাহেই দাদাকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছে। মনা প্রামাণিকের মা-কে পুড়িয়ে ফেরার দিন আমার সামনে বসে এই দোকানেই সাতচল্লিশটা গোলাপজাম খেয়ে আমাদের পাড়ার সামনে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছে।"

"তাই নাকি ...?" বেশ একটা জমাটি আমোদের সম্ভাবনায় নেচে ওঠে সমীরণের মন। সারাদিন এক প্রকার গুমড়েই ছিল সে। না পিতৃবিয়োগের দুঃখ একেবারেই সে ভাবে না। বরং তার মেজাজটা এখানে আসার আগে থেকেই খিঁচড়ে ছিল বাবার এইভাবে হুট করে বিনা নোটিসে চলে যাওয়ায় অফিসের একটা ক্রুশিয়াল পিরিয়ডে দু'সপ্তাহের ছুটিতে বাড়ি আসতে হওয়ার জন্য। সামনেই হায়ার অথরিটির সঙ্গে খুব জরুরি একটা মিটিং ছিল। সেটা মিস হওয়ায় সামনের বড় একটা প্রোমোশন হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে আর সেই তালেগোলে রাইভাল'-চারজন কোলিগ মেরে বেরিয়ে যেতে পারে বেটার প্লেসমেন্ট নিয়ে। তাই নিকটতম স্বজনহারানোর যন্ত্রণার চেয়ে সে অনেক বেশি উদ্বিগ্ন ছিল কেরিয়ার-কার্ভ নিয়ে। তাই গুম মেরে ছিল শুরু থেকেই।

এই রকম মানসিক আবহাওয়ার মধ্যে আধপাগলাগোছের মানবেতর এই লোকটাকে নিয়ে কিছুটা রঙ্গ তামাশা হলে মন্দ হত না। খাক না। যে যত খুশি খাক। তাছাড়া পুরনো পাড়ার লোকজনের সামনে বেহিসেবি টাকা ওড়ানোর মধ্যে একটা রংবাজি তো আছেই। এই জাতীয় একটু আধটু মাসল-ফোলানো না থাকলে বড়-চাকুরে বলে লোকজনে পাত্তাই বা দেবে কেন! জমিদারি ঢঙে সে বলে ওঠে, "ঠিক আছে পারমিশন দিলাম, দেখি ওর কেমন মুরোদ। বিল নিয়ে একদম ভাববি না। অন্য পাড়ার লোক এসে আমাদের পাড়াকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে যাবে সে আবার কেমন ব্যাপার! পাড়ার মানসম্মানের ব্যাপার বলে কথা। কি রে খোকন পারবি না কানাই হালদারের রেকর্ড ভাঙতে?"

বীরোচিত ভঙ্গিতে রোগা শিরা ওঠা হাত শূন্যে তুলে ধরে খোকন আর ওমনি হৈ হৈ করে ওঠে পাড়ার ছেলেপিলে। চারদিক থেকে সবাই ওকে ঘিরে ধরে। সারাদিন পেট খালি থাকার পর আগে কিছুটা ভাত বা রুটি পেটে দিতে পারলে ভাল হত কিন্তু ওসব খেতে গেলে মিষ্টির মতো রসালো জিনিস বেশি টানা যাবে না। শরীরটাও ইদানীং মাঝেমধ্যেই বেগরবাই করছে। নিমেষে গা ঝাটকা দিয়ে ওঠে। ধমকে ওঠে নিজেকে। ধুর ধুর, তাদের মতো অখদ্দে ইতর লোকজনের আবার শরীর নিয়ে অত ভাবনা কী? হাত যখন তুলে ধরেছে তখন পেছপা হওয়ার আর কোনও জায়গা নেই। তার চেয়েও বড় কথা হল স্বয়ং সমীরণ দত্ত, পাড়ার সেরা ছেলে, এই মুহূর্তে তার সবচেয়ে বড় অহংকার বন্ধু সমু যখন মুখ ফুটে বলেছে তখন তো তার মানসম্মান রাখতেই হবে।

প্রথম আটটা গোলাপজাম অবলীলায় সাবড়ে দিয়ে দুর্দান্ত শুরু করে খোকন। পরের সাতটাও মোটের উপর তাড়াতাড়িই। এই দোকানের ময়রার হাতে জাদু আছে বলতে হবে। ফার্স্টক্লাস ক্ষীর ব্যবহার করে বেড়ে টেস্ট বার করে এনেছে বলতেই হবে। ওকে গোল হয়ে ঘিরে ধরে হাততালি দিয়ে ওঠে সহযাত্রীরা। আর তাতে তোল্লা খেয়ে বাহাদুরি দেখিয়ে আরও কিছু পুরে দেয় মুখে। কিন্তু আজ হঠাৎ এমন হচ্ছে কেন কে জানে, আর দু'টো মুখে তুলতেই গা পাকিয়ে উঠল যেন। তাতে কী, কিছুটা জল খেয়ে নিয়ে আরও কয়েকটা গালে ফেলে দেয়, প্রাণপণে চিবোতে থাকে।

টারগেট বড় তাই ধীরে এগোতে হবে। সামান্য থামতেই চেঁচিয়ে ওঠে সবাই, "কী হল থামলে কেন?" মুখ ভরা মিষ্টির দলা। কোনও রকমে বলে ওঠে, "না না থামিনি থামিনি, দাঁড়া ধীরেসুস্থে খেতে দিবি তো নাকি?" হাঁ-য়ের মধ্যে ঠেসে ধরে আরও কয়েকটা রসে টইটুম্বুর গোলাপজাম। কিন্তু আজ যেন ওগুলো আর কিছুতেই ভেতরে ঢুকতে চাইছে না! পেটটা গজগজ করছে। আটকে আসছে গলা তবু থামলে চলবে কেন? থামলেই বা ওরা ছাড়বে কেন? ওকে সবাই ঘিরে ধরেছে চারদিক থেকে। মোবাইল বার করে ভিডিও করতে শুরু করেছে সমু, "আজ তোকে বিখ্যাত করে দেব রে খোকন, তোর এই খাওয়া নেটে ছেড়ে দেব, সারা দুনিয়ার লোকে দেখবে তোর দম।" হোটেলের বেয়ারাকে হাঁক দিয়ে আরও গোলাপজাম আনতে বলে। ওর দেখাদেখি ভিডিও করতে শুরু করে দিয়েছে পাড়ার ছোটন, দিলীপ, মিঠুনরা। উৎসাহ পেয়ে পাতে পড়া আরও কয়েকটা মিষ্টি পুড়ে দেয় মুখে, ছবি উঠছে বুঝে গিলতে থাকে বাড়তি জোর লাগিয়ে।

কিন্তু আজ কী হয়েছে কে জানে! অন্যদিনের মতো এগোনো যাচ্ছে না। শরীর সঙ্গ দিচ্ছে না কিছুতেই। কণ্ঠনালী ঠেলে ভেতরে ঢোকাতে গিয়ে আচমকা কেমন যেন গরম অনুভব করায় আপাদমস্তক ঘেমে ওঠে। অসহায় চোখে তাকায় চারদিকে কিন্তু সবার চোখে উল্লাস, "আজ এমন রেকর্ড করতে হবে টাউনের কেউ যেন ধারে কাছে ঘেঁষতে না পারে।"

মুখগহ্বর ঠাসা তাই অর্থপূর্ণ ধ্বনি উঠে আসে না। শূন্যে তুলে ধরে কাঁপা কাঁপা হাত। আবার খেতে শুরু করে যথারীতি। যে করে হোক আজ তার মধ্যে থেকে অতিমানবীয় ক্ষমতাসম্পন্ন একটা রাক্ষসকে জাগিয়ে তুলতেই হবে। এই রকম সব খাওয়ার দিনে ওই রাক্ষসটার সঙ্গে অনেকবারই তার দেখা হয়েছে। আজও সে এল বটে, কিন্তু এ যে এক করুণ নির্বীর্য দানব। বড্ড রুগ্ন লাগল তাকে। দাঁত নখ সব কেমন নড়বড়ে, কোলকুঁজো, চোখমুখ আশঙ্কিত, তাকে দেখে আজকাল আর বাচ্চারাও ভয় পায় না। তবু সে সাধ্যমতো হুঙ্কার দিয়ে ওঠে। আরও কিছু মিষ্টি ঠেসে দেয় মুখে। কিন্তু এ কী, গলার ভেতরে যা যা গেছে সব এইভাবে উঠে আসতে চাইছে কেন? গায়ের জোরে সেই ঠেলার বিপরীতে আরও বেশ কয়েকটা গোলাপজাম ঠুঁসে দিতে চায় ভেতরে। কিন্তু এ কী রকম হল, মাথাটা এইরকম চক্কর দিয়ে উঠল কেন? শিরদাঁড়া দিয়ে নেমে গেল ঠান্ডা স্রোত, ভয়ানক এক চাপ পড়ল মলাশয়ে। হাত-পা ঠান্ডা হয়ে এল। সামনের মুখগুলো ঝাপসা লাগে। ওদের চেঁচামেচি কিছুই স্পষ্ট কানে আসছে না যে।

"কী হল রে? এখনও তো তিরিশটাই উঠল না। হাফ সেঞ্চুরি করবি কী করে। চালা হাত চালা, তাড়াতাড়ি চালা।" সমুর গলা ফিনকি দিয়ে উঠতেই সর্বাঙ্গে ঝাঁকি তুলে আবার হাত বাড়ায় ডিশের উপর, গোটা কয়েক গোলাপজাম তুলে পুরে দিতে চায় হাঁয়ের ভেতরে। কিন্তু সেখানে আর জায়গা কোথায়? মুখ থেকে খসে পড়ে মিষ্টি। চোখে মুখে অন্ধকার দেখে। ঝুলে পড়ে মাথা। বহু মাইল দূর থেকে কানে ভেসে আসে এক চেনা প্রুতস্বর, "খোকন খোকন..., আর খাসনে বাবা, তোর কি আর সেই বয়স আছে। ওরা যা বলছে বলুক, আর একটাও মুখে তুলিসনে..."

ঘনিয়ে আসা অন্ধকারের মধ্যে মাথা ঝাঁকায় খোকন, "না না মা, তুমি বুঝতে পারছ না, সমু কে তোমায় বলে বোঝাতে পারব না, লাখে এক ছেলে মা। বিশাল চাকরি বিরাট লোক। কত বড় ওসব তুমি বুঝবা না। আমারও তো একটা পেস্টিজ আছে নাকি, কথার নড়চড় মানেই পেস্টিজ পাংচার..." বলতে বলতে মুখ থুবড়ে পড়ে ডিশভর্তি রসালো গোলাপজামের উপর। গোঁ গোঁ শব্দ বেরতে থাকে মুখ দিয়ে, কষ দিয়ে বেরতে থাকে গ্যাঁজলা।

কী হল, কী হল? রব উঠল চারদিক থেকে। রসভঙ্গে মেজাজ বিগড়ে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে ওঠে সহযাত্রী ছোটন, "ও কিছু না, ও এক্ষুনি উঠে বসবে। সন্ধেবেলা কোন ফাঁকে শুনছিলাম কোত্থেকে নাকি লালজল চাপিয়ে এসেছে। আরও আজেবাজে কী সব। বারণ করলাম, শুনল না। যা পাবে তাই খাবে, এত্তো নোলা, কী আর বলব!"

কিন্তু ওঠে না খোকন। মুখের শব্দটা থেমে আসে কিছুক্ষণের মধ্যেই। টেবিলের উপর থেকে চাগিয়ে তুলতেই, মাথাটা নেতিয়ে পড়ে ওর ঘাড়ে। ওখানেই থড়থড়িয়ে কেঁপে উঠে নড়াচড়া থেমে যায়। বেগতিক বুঝে শরীরটা ধরে ঝাঁকি দেয় দিলীপ। চোখে মুখে জলের ছিঁটে দেয় কিন্তু কোনওরকম নড়াচড়া নেই দেখে বিস্ফারিত চোখে তাকায়। চিৎকার করে ওঠে "এতো মনে হচ্ছে ম-ম-র-র..., এক্ষুনি হাসপাতালে নিয়ে ছুটতে হবে।"

ঘাবড়ে গিয়ে ছুটোছুটি শুরু করে দেন দীপেনবাবু। দিশেহারা দেখায় সমীরণ দত্তকে। দরদরিয়ে ঘেমে উঠে, "এসব কী উড়ো ঝামেলা বল তো, এইরকম আলফাল এলিমেন্ট আগে জানলে কি আনতাম নাকি? সরাও সরাও, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এসব ঝামেলা সরাও। আমি আর চাপ নিতে পারছি না।" পাড়ার ছেলেপিলে নিস্পন্দ শরীরটাকে চ্যাংদোলা করে তুলে এনে গাড়ির ফুটবোর্ডে ফেলে ড্রাইভারটাকে হাঁক পাড়তে থাকে। সেই ফাঁকে ওদের দলপতি স্বপন পোদ্দারকে পাশে নিয়ে গিয়ে হাত চেপে ধরে সমীরণ দত্ত, "এখন কী হবে? ওর বাড়ির লোকজন তো এখন আমাদের ওপর চড়াও হবে। হাজার ঝঞ্ঝাট লাফড়া! আমরা কিন্তু ওইসব পোয়াতে পারব না।"

"কে চড়াও হবে, ওর বাড়িতে কেউ থাকলে তো চড়াও হবে? সাতকূলে কেউ নেই। ওর যা করার পাড়ার ছেলেপিলেকেই করতে হবে। না হলে কিছু না।"

দেওয়ালের আড়ালে নিয়ে পকেটে বেশ কিছু বড় নোট পুরে দিয়ে বলে, "থানা পুলিশ টানাটানি হবে নাকি? আমরা কিন্তু কোনও ঝক্কি ঝামেলা নিতে পারব না। তোমরা এর একটা ব্যবস্থা করো, টাকা পয়সা নিয়ে ভাবতে হবে না। আমাদের গায়ে যেন কোনও রকম আঁচ না আসে।"

"না না কোনও চিন্তা করবেন না, নিশ্চিন্তে বাড়ি যান। আমরা এদিকটা দেখছি। কাউন্সিলার রাধাদাকে ফোন করে দিচ্ছি। ওর সঙ্গে কথা বলে একটা রফা করে নিলেই হবে।" নির্বিকার গলায় বলে স্বপন।

"ঠিক আছে, তাই হবে তাই হবে।" হাত কচলায় সমীরণ, "আমিই বা কী করব বলো, তোমরা বললে সেই ভরসাতে আমিও ভাবলাম একটু যদি ফুর্তিফার্তা..."

"আমরাই বা কী করে বুঝব বলুন। আমরাও তো জানতাম ও শালা রাক্ষস একটা। ওর কিছুতেই কিছু হয়না। আজ যে এইভাবে ডোবাবে কে জানত?" ড্রাইভারটাকে গাড়ি স্টার্ট দিতে দেখে ওইদিক ছুট লাগায় স্বপন। যাওয়ার আগে হাত নেড়ে বলে যায় "চিন্তা করবেন না, দেখি ওদিকে হাসপাতাল কী বলে। সে রকম হলে আমাদের তো আবার শ্মশান ছুটতে হবে।"

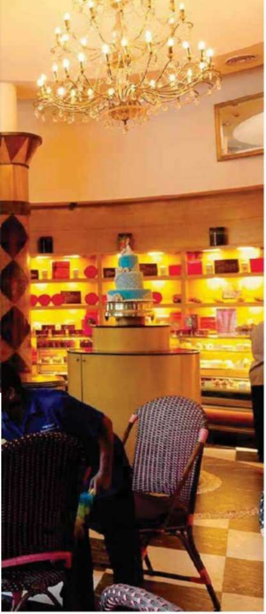
অলংকরণ: বৈশালী সরকার


ফ্লুরিজের অন্দরে

সুস্বাদু সকাল

বেকড বিনস অন টোস্ট, সিনামন টি, সানি সাইড আপ...জিভে জল চলে এল তো? শুধুমাত্র ডিম-পাঁউরুটি বা লুচি পরোটা নয়, বাঙালির ব্রেকফাস্ট এখন গ্লোবাল। আর এর নেপথ্যে রয়েছে কলকাতার বেশ কিছু জনপ্রিয় কাফে, যারা আয়োজন করছে নিত্যনতুন ব্রেকফাস্ট রেসিপি। জলখাবারের স্বাদবদলের গল্প শোনালেন সৌমী ঘোষ ও ঋতুপর্ণা রায়।

লোকে নাকি বলে বাঙালিরা বেজায় অলস। 'ল্যাদ' তাঁদের ডিকশনারির প্রিয় শব্দ। তা সে অন্য ব্যাপারে আমরা যতই গা-ছাড়া দিই না কেন, খাওয়ার কথা উঠলে, আমাদের কোনও প্রতিদ্বন্দ্বী খুঁজে পাওয়া যাবে না। আমাদের ভোজনবিলাসিতা নিয়ে রসিকতা করলে কী হবে, এটা তো মানতেই হবে আমরা খেতে এবং খাওয়াতে বেজায় ভালবাসি। সাধে কি আর আমাদের রসনাবিলাসের উপর কবিতা থেকে গান সবই লেখা হয়েছে। ভাল খাবারের জন্য আমরা সবাই কিন্তু ভজহরি মান্না হয়ে উঠতে পারি। চষে ফেলতে পারি দেশ-বিদেশ শুধুমাত্র জিভের তোয়াজের আশায়। তাই তো শীত সকালে লেপের আদর ছেড়ে মল্লিকবাজারের বিখ্যাত পায়া নিহারী খেতে যেতে আমাদের একটুও আপত্তি থাকে না। টেবলে কানা-উঁচু ধূমায়িত বাটি আসতেই মেজাজ একেবারে ফুরফুরে হয়ে যায়। কিংবা টেরিটি বাজারের ডাম্পলিং চেখে দেখার জন্য ভোরবেলা উঠতেও বেজায় উৎসাহ। ময়দার পাতলা আস্তরণের মধ্যে মাংসের তুলতুলে পুর, মুখে দিলেই একেবারে স্বর্গীয় সুখের আনন্দ। এ হেন সুস্বাদু প্রভাতের লোভ কি সহজে ছাড়া যায়? আর



> কলকাতার বুকে ইংলিশ তো বটেই স্প্যানিশ ব্রেকফাস্টেরও অন্যতম সেরা ঠিকানা ফ্লুরিজ়। শুধু সুস্বাদু খাবার নয়, এর সঙ্গে জড়িয়ে থাকা ঐতিহ্য এবং নস্টালজিয়ার স্বাদ পেতে বহু মানুষ ভিড় জমান এখানে।



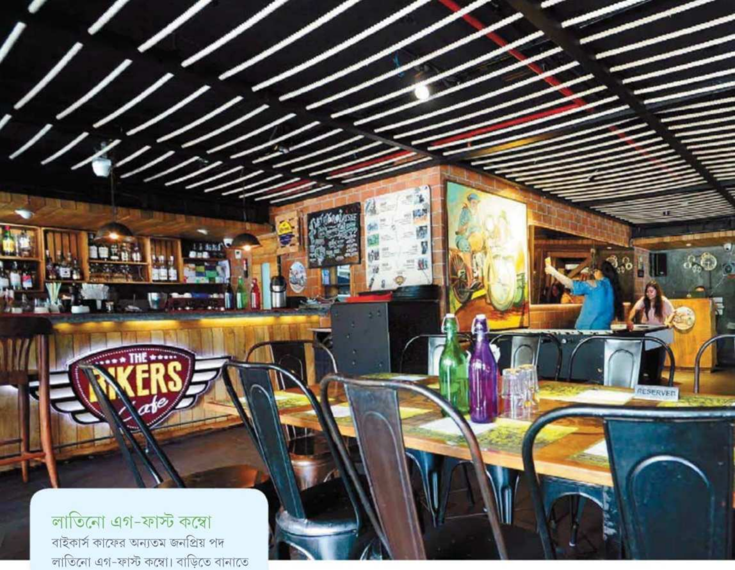
তাই তো কলকাতা শহরে জাঁকিয়ে বসেছে এমন অনেক কাফে বা রেস্তরাঁ, যারা সকাল থেকেই তাদের দরজা খুলে দেয় আমাদের মতো ভোজনরসিকদের জন্য। ঘড়িতে আটটা বাজলেই একেবারে সেজেগুজে তৈরি হয়ে যায় অতিথি আপ্যায়নের জন্য। আর আমরাও সুযোগ পেয়ে যাই। সকালবেলা হেঁসেলে ঢুকতেও হয় না, অথচ মনের মতো খাবার হাজির হয়ে যায় চোখের সামনে। ছুটির দিন তো বটেই, এখন কিন্তু সপ্তাহের বাকি পাঁচদিনও অনেকেই ব্রেকফাস্ট সেরে নেন এমনই কোনও কাফে বা রেস্তরাঁতে। আসলে আমাদের হাতে এখন সময় বড় কম। ঘুম থেকে ওঠা ইস্তক তো ছুটছি। তার মাঝে ব্রেকফাস্টের এলাহি আয়োজন করার না থাকে সময়, না থাকে এনার্জি। তাই প্রতিদিনই ব্যাজার





ইংলিশ ব্রেকফাস্ট

ফ্লুরিজ়ের ইংলিশ ব্রেকফাস্টের কথা জানে না, এমন মানুষ বোধহয় খুঁজে পাওয়া যাবে না। এই খাবারের টানে সাত সকালে কত মানুষ যে ছুটে আসেন ফ্লুরিজ়ে তার হিসেব করা যাবে না। এক সময়কার সাহেব-সুবোদের প্রিয় খাবার এখন যে ছাপোষা বাঙালির নাগালে চলে এসেছে, তার জন্য এই রেস্তরাঁকেই ধন্যবাদ জানাতে হয়। বেকড বিনস থেকে সসেজ সব খাওয়া শেখাই তো এর হাত ধরে। বাড়িতে কিন্তু এই ইংলিশ ব্রেকফাস্ট বানাতে পারেন। লং বান বা ব্রেড টোস্ট করে নিন। সঙ্গে বানিয়ে ফেলুন বেকড বিনস। সানি সাইড আপ, সোজা ভাষায় ডিমের পোচ, বেকন ভাজা আর হ্যাশ ব্রাউন (আলু কুরিয়ে সিদ্ধ করে মাখা) প্লেটে রাখলেই নিমেষে হাজির হয়ে যাবে গরম গরম ইংলিশ ব্রেকফাস্ট।



লাতিনো এগ-ফাস্ট কম্বো

বাইকার্স কাফের অন্যতম জনপ্রিয় পদ লাতিনো এগ-ফাস্ট কম্বো। বাড়িতে বানাতে চাইলে একটি নন স্টিক প্যানে তেল গরম করুন। ডিম পেঁয়াজকুচি ও টোম্যাটোকুচি দিয়ে ফেটিয়ে প্যানে ছাড়ুন। স্বাদমতো নুন ও গোলমরিচ দিন। ডিম অল্প ভাজা হলে বেকড বিনস ভরে ভাঁজ করে দিন। নামিয়ে মাঝখান থেকে কেটে দু'টুকরো করুন। একটি সার্ভিং প্লেটে ডিম সাজিয়ে রাখুন। একপাশে নাচোস রেখে তার উপর নাচোজ় চিজ় দিন। মেক্সিকান রাইস এবং পিকো দে গায়ো আলাদা আলাদা তিনটি ছোট বাটিতে রেখে প্লেটের একপাশে সাজিয়ে দিন। একপাশে গ্রিল করা টোম্যাটো দিয়ে পরিবেশন করুন।



মুখে দুধ-কর্নফ্লেক্স বা ডিম টোস্টেই শুরু হয় আমাদের সকাল। তবে সুযোগ পেলে বাইরে ব্রেকফাস্ট করতে কার না ভাল লাগে। প্রসঙ্গত মনে পড়ে যাচ্ছে, মুসৌরির এক দারুণ সকালের কথা। মলের উপর এক টুকরো দোকান। আলাদা করে চোখেই পড়ে না। নামও অতি সাধারণ। লাভলি ওমলেট সেন্টার। লাইনে দাঁড়িয়ে প্রকাণ্ড একটা চিজ় ওমলেট খেয়েছিলাম। কী তার স্বাদ! এই ওমলেট একবার খেলে আর ভুলেও চিজ় বার্স্ট পিৎজ়ার দিকে হাত বাড়াতে পারবেন না। এরপর চুমুক মেরেছিলাম ঘন দুধের তৈরি গরমগরম চায়ে। আহা! তার স্বাদ এখনও মুখে লেগে আছে। কলকাতা যে এমন স্বাদরসে বঞ্চিত, তা কিন্তু নয়। এখানেও ব্রেকফাস্টের ফিরিস্তি দেখলে তাক লেগে যায়। ইডলি-দোসা যেমন আছে একদিকে তেমনই আছে টিবেটান বান থেকে শুরু করে সসেজ বা হ্যাশ ব্রাউন। লুচি-পরোটায় অভ্যস্ত বাঙালি জিভ যে এদের সঙ্গে দিব্যি মানিয়ে নিয়েছে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। এমনই কিছু জনপ্রিয় কাফে এবং রেস্তরাঁর খোঁজ দিলাম আমরা।

ফ্লুরিজ়

কলকাতার প্রাতঃরাশ ঐতিহ্যের সঙ্গে ফ্লুরিজ়ের বিন অন টোস্ট-ফ্রায়েড এগের কথা না বললেই নয়। কলকাতায় সর্বপ্রথম ব্রেকফাস্টের চলটা শুরু করে ফ্লুরিজ়ই। ১৯২৭ সালের কথা। তখন পার্ক স্ট্রিট শুধুমাত্র কলকাতা নয়, তামাম ভারতের নাইটলাইফের এপিসেন্টার। সারারাত নাচ-গান-পার্টি লেগেই থাকত। বেশিরভাগ ক্লাবই ছিল ইউরোপিয়ানদের দখলে। খানাপিনার পর্ব মিটতে রোজই রাত দু'টো তিনটে বেজে যেত। তারপর অনেকেই আবার বাড়ি ফিরতেন না। তারপর সকাল হলেই বায়না জুড়ে দিতেন ব্রেকফাস্টের। অথচ ক্লাবগুলোয় প্রাতঃরাশের কোনও ব্যবস্থা থাকত না। এ সময় পরিত্রাতা হিসেবে আবির্ভাব হয় সুইস দম্পতি জোসেফ ও ফ্রিডা ফ্লুরিজ়ের। ছোট্ট একটা টি-রুম আর কনফেকশনারি দিয়ে যাত্রা শুরু করে আজ ৯০ বছর



বাইকার্স কাফে



বাইকার্স কাফের সার্ভিং স্টেশন

বাইকার্স কাফের স্পেশ্যালিটি অমলেট। সম্ভারও বিস্তৃত। রয়েছে গ্রিক অমলেট, স্প্যানিশ অমলেট, মেক্সিকান অমলেট, পার্সি অমলেট, ববি ব্রাউন অমলেট, ফ্রেঞ্চ অমলেট মতো দারুণ সব অপশন।



ভেজ বেনেডিক্ট (বাইকার্স কাফে)

পেরিয়েও ফ্লুরিজ়ের আদর একটুও কমেনি। একটা সময় এখানে ব্রিটিশরা রবিবার সকালের ব্রেকফাস্ট সারতেন। তথাকথিত বড়লোক বাঙালি, জিউ, পার্সিরা চায়ের কাপ আর স্কোনস-সহযোগে আড্ডা, তর্কে মেতে উঠতেন। সময়ের সঙ্গে ছবিটা অনেক বদলে গেছে। এখন সব বয়সের মানুষই ফ্লুরিজ়ে ভিড় জমান। তবে এখানকার ব্রেকফাস্ট আর সুবাসিত সোনালি রঙের টলটলে দার্জিলিং চা এখনও দারুণ জনপ্রিয়। ছুটির দিন তো বটেই অন্যান্য দিনও এখানে সকাল আটটায় জায়গা খালি পাওয়া দুষ্কর। আসলে ফ্লুরিজ় তো শুধুমাত্র একটা রেস্তরাঁ নয়, আমাদের আবেগের সঙ্গেও জড়িয়ে আছে। মনে আছে ২০০৪ সালে রেনোভেশনের পর প্রথম যেদিন ফ্লুরিজ় খোলে সেদিন পুরো পার্ক স্ট্রিটের মোড় পর্যন্ত লাইন হয়েছিল। সকালবেলা ফ্লুরিজ়ের বাইরের দৃশ্যটা দেখলেই বোঝা যায় এত বছরে এত রেস্তরাঁর ভিড়েও এর জনপ্রিয়তা এতটুকু কমেনি। এর একটা বড় কারণ অবশ্যই ফ্লুরিজ়ের স্পেশাল ব্রেকফাস্ট। সত্যি কথা বলতে ফ্লুরিজ়ের হাত ধরেই কিন্তু অধিকাংশ বাঙালি বিন অন টোস্ট কিংবা সসেজ উইথ হ্যাশ ব্রাউন খেতে শিখেছে। এই ইংলিশ ব্রেকফাস্টের রমরমা আজও কমেনি। তবে পুরনো খাবারের সঙ্গে মেনুতে নতুন সংযোজনও হয়েছে। ইংলিশ ব্রেকফাস্টের পাশাপাশি স্প্যানিশ ব্রেকফাস্টের চাহিদাও এখন প্রবল। ডাবল ডেকার স্যান্ডউইচ উইথ ফ্রেঞ্চ ফ্রায়েজ় স্কুল পড়ুয়াদের মধ্যে দারুণ হিট। ফ্লুরিজ়ের ব্রেকফাস্ট সারাদিনই পাওয়া যায়। যাকে বলে অল ডে ব্রেকফাস্ট। দিনে ৭৫-৮০ আর উইকএন্ডে ১৫০-র বেশি ব্রেকফাস্ট প্ল্যাটার বিক্রি হয়। সবচেয়ে সুন্দর বিষয় এর সঙ্গে জড়িয়ে থাকা নস্টালজিয়া। পাঁচ প্রজন্ম ধরে ফ্লুরিজ়ের বিশ্বস্ত অতিথি, এরকম মানুষের সংখ্যা কিন্তু নেহাতই কম নয়। আর এখানেই ফ্লুরিজ়ের আভিজাত্য, গল্প সবার চেয়ে আলাদা।



বাইকার্স কাফে

ব্রেকফাস্টের জন্য ক্রমেই জনপ্রিয় হয়ে উঠছে বাইকার্স কাফে। এর অল্প দূরত্বেই অ্যালেন পার্ক। ভোরবেলা পার্কে



ওয়াইজ় আউল

ইংলিশ আর কন্টিনেন্টাল ব্রেকফাস্টের জন্য অনেকেই সকালবেলা শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা ভুলে চলে আসেন ওয়াইজ় আউলে। সুস্বাদু খাবার ছাড়া এই কাফের খোলামেলা পরিবেশ অবশ্যই বাড়তি পাওনা।

প্রচুর মানুষ জড়ো হন প্রাতঃভ্রমণ কিংবা ওয়র্কআউট করতে। তাঁদের অনেকেরই পোস্ট ওয়র্কআউট রিল্যাক্সেশন এবং ব্রেকফাস্টের জায়গা বাইকার্স কাফে। আবার যাঁরা প্রাতঃরাশে নিত্যনতুন খাবার চাখতে আগ্রহী, তাঁরাও ভিড় জমান এখানে। ২০১৪ সালে যাত্রা শুরু। পাঁচ বছরের মধ্যেই কলকাতার অন্যতম সেরা ব্রেকফাস্টের ঠিকানা হয়ে উঠেছে বাইকার্স কাফে। ব্রেকফাস্ট শুরু হয় সকাল সাড়ে সাতটায়। ভিড়ও হয়ে চোখে পড়ার মতো। প্রতিদিন প্রায় ৫০-৬০ জন মানুষ আসেন এখানকার প্রতরাশ চেখে দেখতে। এরমধ্যে অনেকেই আবার নিয়মিত অতিথি। উইকএন্ডে আরও বেশি ভিড় হয়। এখানকার মেনুর সম্ভার দারুণ লোভনীয়। কন্টিনেন্টাল ইংলিশ ব্রেকফাস্ট, আমেরিকান ব্রেকফাস্টের পাশাপাশি পাবেন দেশি মেনুও। এখানকার স্পেশ্যালিটি অমলেট। সম্ভারও বিস্তৃত। রয়েছে গ্রিক অমলেট, স্প্যানিশ অমলেট, মেক্সিকান অমলেট, পার্সি অমলেট, ববি ব্রাউন অমলেট, ফ্রেঞ্চ অমলেট মতো দারুণ সব অপশন। রয়েছে নানা ধরনের স্যান্ডউইচ, টোস্ট, বেকন অ্যান্ড এগ, রোস্টেড বা গ্রিলড ভেজিটেবলস। ফলে যাঁরা ডায়েটের কড়া অনুশাসন মেনে চলেন, তাঁরাও নিশ্চিন্তে বেছে নিতে পারেন মনের মতো পদ। তবে এখানকার পুরো মেনুই যে কন্টিনেন্টাল তা নয়। বরং স্বাদবদল করতে চেখে দেখতে পারেন পরাঠা হাইওয়ে, মটর কুলচা, স্টাফড পোট্যাটো রোল, সামোসা কচুরি মিক্স। পাবেন প্রদেশিক খাবারও। রয়েছে





ইতালিয়ান স্যান্ডউইচ

সকালে তাড়াহুড়োর মুখে ব্রেকফাস্ট অপশন হিসেবে স্যান্ডউইচ কিন্তু অনেকেরই প্রিয়। আর এই ইতালিয়ান স্যান্ডউইচের লোভে অনেকেই সাত সকালে চলে আসেন ওয়াইজ় আউলে। ইতালিয়ান স্যান্ডউইচ সাধারণত লং বানে হলেও, এটাকে নিজস্ব টুইস্ট দিয়েছে এই কাফে। স্যান্ডউইচ ব্রেডই ব্যবহার করা হয় এক্ষেত্রে। তবে চাইলে ব্রাউন ব্রেডেও বানিয়ে দেন এঁরা এই স্যান্ডউইচ। আর আমিষ বা নিরামিষ, চয়েস ইজ় কমপ্লিটলি ইওরস। জ়ুকিনি, ক্যাপসিকাম, পেঁয়াজ-সহ নানারকম সবজির সঙ্গে মোৎজ়ারেলা চিজ় আর পেস্তো সস মিশিয়ে গ্রিল করা হয়। এটাই স্যান্ডউইচের পুর। এবার চাইলে গ্রিলড চিকেন দিতেই পারেন। বাড়িতেও এই স্যান্ডউইচ কিন্তু অনায়াসেই বানানো যায়।



ননভেজ কম্বো (ওয়াইজ় আউল)

গুজরাতের চিলা, মুম্বইয়ের স্যান্ডউইচ। ববি ব্রাউন আর স্প্যানিশ অমলেটের জনপ্রিয়তা সবচেয়ে বেশি। তবে চা-কফি ছাড়া কি আড্ডা জমে? সেই ব্যবস্থাও রয়েছে এখানে। গ্রিন টি থেকে শুরু করে মশলা টি, দার্জিলিং টি, ক্যাপুচিনো, এসপ্রেসো, লাতে সবই পাবেন এখানে। সল্টলেকে নতুন একটি আউটলেট খোলার পরিকল্পনা রয়েছে বাইকার্সে কাফের। নতুন শাখাটিও এতটাই জনপ্রিয় হয়ে উঠবে বলে আশাবাদী এখানকার কর্মীরা।

ওয়াইজ় আউল

এরপর বলব এক প্যাঁচার গল্প। বড়ই বুদ্ধিমান সেই প্যাঁচা। কলকাতা শহরে যে খুব বেশি সংখ্যক ব্রেকফাস্টের কাফে নেই, তা সে জানত। আর তাই ২০১২-তে আবির্ভাব হয় ওয়াইজ় আউলের। এখানে ব্রেকফাস্ট শুরু হয় সকাল সাড়ে সাতটা থেকেই। দুপুর ১২টা পর্যন্ত চেখে দেখতে পারেন এদের ব্রেকফাস্ট মেনু। তবে অনেকেই তো নাইট আউল, ঘুম থেকে দেরি করে ওঠেন, তাদের জন্য সারাদিনই ব্রেকফাস্টের আয়োজন থাকে অল ডে ব্রেকফাস্টের কনসেপ্ট মেনে। দক্ষিণ কলকাতার এই কাফের জনপ্রিয়তা নিয়ে কোনও সংশয় নেই। কাফের কাছেই লেক। সেখানে ওয়র্কআউট, জগিং করার পর অনেকেই চলে আসেন স্বাস্থ্যকর এবং অবশ্যই সুস্বাদু ব্রেকফাস্টের টানে। এদের ব্রাউন ব্রেড ভেজি স্যান্ডউইচ যে বড্ড ভাল খেতে! ব্যস্ত কর্পোরেটরা অনেকে এই কাফের নিয়মিত খদ্দের। অফিস যাওয়ার আগে টুক করে সেরে নেন সকালের জলখাবার। আর কলেজ পড়ুয়ারা তো আছেই। এমনও অনেকে আছেন যাঁরা ওয়াইজ় আউলের ব্রেকফাস্ট খেয়ে বাড়িতে প্রাতঃরাশের পাটই তুলে দিয়েছেন। ভারী



কারি পাতার ভিতরে



ইডলি

স্বাস্থ্যকর জলখাবার চান? এক্ষেত্রে ইডলির চেয়ে ভাল অপশন আর কী বা হতে পারে? বানানো বেশ সহজ। বিউলির ডাল এবং চাল ভাল করে ধুয়ে আলাদা আলাদা পাত্রে চার ঘণ্টা ভিজিয়ে রেখে মিহি ভাবে বেটে নিন। চালবাটা, ডালবাটা এবং মেথিবাটা মিশিয়ে নিন। সারা রাত রাখুন। সকালবেলা ইডলি বানানোর পাত্রে অল্প করে নারকেল তেল লাগিয়ে নিন। এ বার ইডলির মিশ্রণ ওই মোল্ডে হাতা দিয়ে ঢেলে দিন। স্টিমারে ৭-১০ মিনিটের মধ্যেই তৈরি হয়ে যাবে ইডলি। স্বাদবদল করতে চেখে দেখতেই পারেন।



কাফে আই অ্যাম



কাফে আই অ্যাম-এর কিচেন

ব্রেকফাস্টের উপর জোর দেয় ওয়াইজ় আউল। আমিষ, নিরামিষ প্ল্যাটার বা কম্বো এক কথায় দারুণ। ডিম, সসেজ, বেকন, টোস্ট তো আছেই, সঙ্গে গরম গরম চা, কফি বা ঠান্ডা জুস-যেটা পছন্দ সেটাই পেয়ে যাবেন এখানে। শেষপাতে চেখে দেখতে পারেন তুলতুলে মাফিন। তবে সবচেয়ে বেশি চাহিদা কিন্তু জোয়ি'স প্ল্যাটারের। গরম গরম ফ্রায়েড এগ, বেকড বিনস, মুচমুচে ফ্রেঞ্চ ফ্রায়েজ় সঙ্গে বেকন উইথ টোস্ট... যাকে বলে জলখাবার একেবারে জমে ক্ষীর। সুতরাং ওয়াইজ় আউলের এ হেন ব্রেকফাস্টের প্রলোভন তো সত্যি দূরে ঠেকিয়ে রাখা অসম্ভব।

কারি পাতা

শুধু ইংলিশ ব্রেকফাস্ট কিংবা কন্টিনেন্টাল নয়, জলখাবারে পাতে দক্ষিণ ভারতীয় মেনুও রীতিমতো জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে বাঙালির কাছে। 'কারি পাতা' রেস্তরাঁয় সকালবেলা বাঙালির ভিড় দেখলে তা সহজেই অনুমেয়। সোম থেকে শুক্র ব্রেকফাস্ট শুরু হয় ৯টা থেকে। রবিবার দোকান খুলে যায় সকাল ৮টা তেই। 'কারি পাতা' রেস্তরাঁ সেন্ট জ়েভিয়ার্স স্কুল এবং কলেজের খুব কাছে। ফলে স্কুল পড়ুয়া এবং অভিভাবকদের বেশ ভালই ভিড় হয় এখানে। গড়ে প্রতিদিনই ৩০-৪০ জন মানুষ আসেন ব্রেকফাস্ট সারতে। কখনও সংখ্যাটা বেড়ে দাঁড়ায় ৫০ জনেও। মেনুতে রয়েছে ইডলি, দোসা, বড়া, উপমা, উত্থাপম। রুচি বৈচিত্র্য ঘটাতে কারিপাতা-সরষে-তেঁতুলের অমোঘ রসায়নে দিব্যি মজেছেন তাঁরা। প্লেন ইডলি এবং উপমা এখানকার সবচেয়ে জনপ্রিয় পদ। ফ্রায়েড বড়াও রয়েছে পছন্দের তালিকায়। চা পাওয়া না গেলেও দক্ষিণ ভারতীয় ফিল্টার কফিতে গলা ভেজাতে পারেন। মেনুতে খুব বেশি চমক নেই। পরিচিত পদেরই সমাহারই বেশি। কিন্তু এটাই তাদের ইউএসপি। চেনা পদ, স্বাস্থ্যকর আবার সুস্বাদু হওয়ার সুবাদে জনপ্রিয়তায় নিরিখে কিন্তু কোনও অংশে পিছিয়ে নেই 'কারি পাতা'। কর্তৃপক্ষের মতে খাবারের নির্দিষ্ট মান বজায় রাখতে তাঁরা সবসময় সচেষ্ট থাকেন। এছাড়া মধ্য



টিবেটান বান ব্রেকি

কাফে আই অ্যাম-এর অত্যন্ত জনপ্রিয় এই ডিশ। বান এঁরা নিজেরাই বানান। হোমমেড বান প্রথমে বানিয়ে ছাঁকা তেলে ভেজে নেওয়া হয়। এরপর সমান দু' ভাগে ভাগ করে নেওয়া হয় এই বান। উপরে লাগানো হয় ফিলাডেলফিয়া ক্রিম চিজ় স্প্রেড। মাশরুম গ্রিল করে নিয়ে আলাদা রাখা হয়। ডিম পোচ করে, চিকেন সালামি আর গ্রিলড মাশরুম বানের উপর সমানভাবে সাজিয়ে দেওয়া হয়। উপর দিয়ে আরুগুলা লেটুস ছড়িয়ে গরম গরম সার্ভ করে করা হয় টিবেটান বান ব্রেকি। এটি এক ধরনের ওপেন ফেস স্যান্ডউইচ।



ভারী ব্রেকফাস্টের উপর জোর দেয় ওয়াইজ় আউল। আমিষ, নিরামিষ প্ল্যাটার বা কম্বো এক কথায় দারুণ। অনেকটা চেনা ইংলিশ ব্রেকফাস্টের মতো হলেও এখানে মেনু সাজানো হয়েছে নিজেদের মতো করে।



অসি বিগ ব্রেকি (কাফে আই অ্যাম)



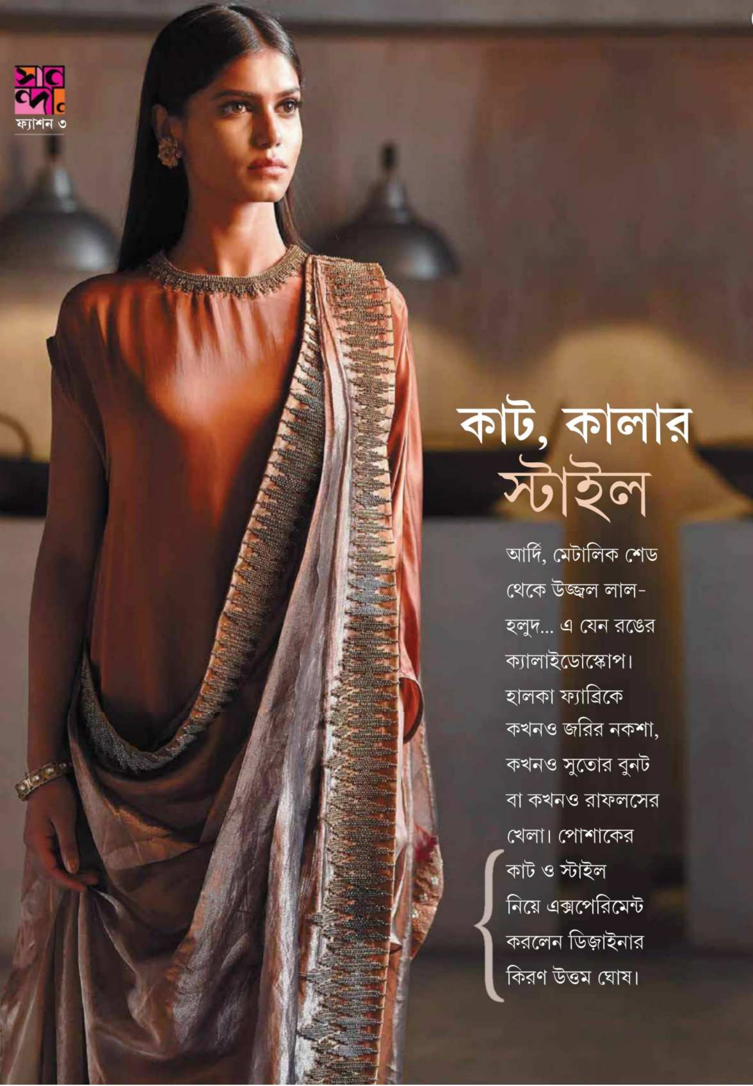
কার্নিভ্যাল প্যানকেক (কাফে আই অ্যাম)

কলকাতায় অবস্থান এবং পার্কিংয়ের সুযোগও এই আকর্ষণের অন্যতম কারণ। খুব তাড়াতাড়ি লেক রোডে নতুন আরও একটি আউটলেট খোলার পরিকল্পনা করছেন 'কারি পাতা'র কর্তৃপক্ষ।

কাফে আই অ্যাম

এ তো গেল আমাদের চেনাপরিচিত ব্রেকফাস্টের কথা। কিন্তু সকাল সকাল যদি পাওয়া যায় বেকন ভরা বাও, সঙ্গে বালিসের মতো নরম অমলেট আর বার-বি-কিউ সসে স্নাত টোম্যাটো? কিংবা কলকাতার গরমে বসে যদি স্বাদ পাওয়া যায় দার্জিলিংয়ের ভুতেকো ভাত, ঝালঝাল আলুরদম আর ডিমের, তা হলে? ঠিক এটাই করছে এই তালিকার কনিষ্ঠতম সদস্য কাফে আই অ্যাম। বয়স নিতান্তই কম। কিন্তু বিগ শটদের সঙ্গে ভালই পাল্লা দিচ্ছে। এদের ব্রেকফাস্ট শুরু হয়ে যায় সকাল আটটায়। অল ডে ব্রেকফাস্টের কনসেপ্ট মেনেই বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত পাওয়া যায় ব্রেকফাস্টের খাবার। আর মেনু দেখলে বেশ সম্ভ্রম হয় বই কী! একদিকে যেমন আছে গোলাপি হ্যাম আর স্পিনাচে মাখোমাখো এগ বেনেডিক্ট, অন্যদিকে আবার পাওয়া যায় সেল রোটি বা টিবেতান বান। খেলে একেবারে দিল খুশ! চকোলেট প্যানকেক, রোস্তি, খাবারের লিস্ট বেজায় লম্বা এদের। ফলে খুব অল্প দিনেই ভোজনরসিকদের খাতায় নাম লিখিয়ে ফেলেছে এই কাফে। কলেজ পড়ুয়া থেকে অফিস কর্মী সকলেই সপ্তাহান্তে তো বটেই, অন্যান্য দিনেও দিব্যি হাজির হয়ে যান সকালবেলা। আর এদের আন্তরিকতা আর অভিনব মেনুকে তো সাধুবাদ জানাতেই হয়।

ছবি: শুভেন্দু চাকী



কাট, কালার স্টাইল

আর্দি, মেটালিক শেড থেকে উজ্জ্বল লাল-হলুদ... এ যেন রঙের ক্যালাইডোস্কোপ। হালকা ফ্যাব্রিকে কখনও জরির নকশা, কখনও সুতোর বুনট বা কখনও রাফলসের খেলা। পোশাকের কাট ও স্টাইল নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করলেন ডিজ়াইনার কিরণ উত্তম ঘোষ।



ড্রেপড ম্যাক্সি শাড়ি। আর্দি কালার টোন। নেকলাইনে জরির সূক্ষ্ম কাজ। আঁচলে এম্বেলিশমেন্ট ও জরির নকশা। মিনিমাল মেক-আপে গর্জাস। (বাঁদিক)

মিন্ট গ্রিন রঙের শাড়ি। জমি জুড়ে একই রঙের সুতোর নকশা। মাঝে সিকুইন ওয়র্ক। ডাস্টি পিঙ্ক চওড়া পাড়ে জরির হালকা কাজ। সঙ্গে তামাটে রঙের হাই নেক ব্লাউজ়। (ডানদিক)



বোল্ড কালার প্যালেট। লাল-কালোর চিরন্তন যুগলবন্দি। ওয়ান সাইড নটেড ড্রেপড শাড়ি। সঙ্গে সেমি শিয়ার কালো ব্লাউজ়। পাড়ে রাফলস।



মেটালিক রঙের সঙ্গে গোলাপি রঙের দারুণ কম্বিনেশন। ড্রেপড লহেঙ্গা শাড়ির সঙ্গে এম্বেলিশড হাই নেক ব্লাউজ়। চওড়া পাড়ে জরির কাজে বড় বড় ফুলের মোটিফ।



গোলাপি রঙের লুজ় ফিটেড প্রিন্টেড অ্যাসিমেট্রিক্যাল ম্যাক্সি টপ। ডিপ ভি নেকলাইনে সেল্ফ টেক্সচার। টিম আপ করা হয়েছে হাই ওয়েস্ট স্ট্রেট প্যান্টসের সঙ্গে।



সেমি শিয়ার লহেঙ্গা স্কার্ট। সোনালি রঙের সুতোয় ফুলের নকশা। সঙ্গে অ্যাসিমেট্রিক্যাল ম্যাক্সি টপ। ভাইব্র্যান্ট নীল কালার প্যালেট। নেকলাইন, স্লিভস ও হেমলাইনে রাফলস।



ডুয়াল টোনের শাড়ি। কটকটে হলুদ আর টুকটুকে লালের দারুণ জুটি। রাফলড শাড়ির চওড়া পাড়ে জরিতে জিওমেট্রিক প্যাটার্ন। সঙ্গে হাই নেক ব্লাউজ়।



হালকা গোলাপি রঙের বিন্যাস। ক্রস ড্রেপ ম্যাক্সি শাড়ির সঙ্গে একই রঙের সিগারেট প্যান্টস। । নেকলাইনে ঘন এম্বেলিশমেন্ট। পাড়ে সিকুইনের ঠাসা কাজ।

মডেল: জুহি, অঙ্কিতা
মেক-আপ: জিতু
ফোন: ৯৭৪৮২১৩৬৮৬
পোশাক: কিরণ উত্তম ঘোষ
ছবি: সোমনাথ রায়





মাছ মাংসের মিলমিশ

যুযুধান প্রতিপক্ষ নয়, বরং এদের গলায় গলায় ভাব। তাই দু'য়ে মিলে স্বাদকোরককে যে স্বর্গীয় অনুভূতির সৃষ্টি করবে, তা বলাই বাহুল্য। মাছ-মাংসের যুগ্ম রসায়নে নববর্ষের জমাটি ভূরিভোজের আয়োজন করলেন ফুড কলামনিস্ট অর্পিতা চক্রবর্তী। রেসিপি সংকলনে তিতাস চট্টোপাধ্যায় এবং সায়নী দাশশর্মা।

খাদ্যরসিক বাঙালির রসনার বাসনা তৃপ্ত করা মোটেও সহজ কাজ নয়। উৎসবে-অনুষ্ঠানে তেল-সম্বলিত রগরগে ঝোলে কবজি না ডোবালে বাঙালির আত্মার সন্তুষ্টি হয় না। অন্তত দু'রকমের মাছ, মাংস তো চাই-ই, সঙ্গে পোলাও, কবিরাজি এবং অবশ্যই শেষপাতে মিষ্টি—এর কমে বাঙালির 'মহাভোজ' জমে না। কিন্তু আজকাল কার হাতেই বা এত আয়োজনের সময় থাকে? কিন্তু তাই বলে তো আর রসনার বাসনা অতৃপ্ত রাখা যায় না। তাই সবদিক ভেবে ভূরিভোজের দুই মুখ্য চরিত্র, মানে মাছ আর মাংসকে একসঙ্গে হাজির করলাম আমরা। মুচমুচে চর্বির কবিরাজির পরতে পরতে তুলতুলে মাছের স্বাদ, কিংবা সরষে-পোস্তয় মাখোমাখো ভেটকির পেটে মশলাদার কিমার চমক, এই আড়ম্বর যে একমাত্র নববর্ষেই মানায়! সকলের নববর্ষ জমিয়ে তুলতে সেরকমই একগুচ্ছ রেসিপি উপহার দিলাম। মাছ-মাংসের ভালবাসায় জমে উঠুক এবারের বর্ষবরণ উৎসব!

মাংসের চর্বির কবিরাজি

উপকরণ: পাতলা জালি চর্বি ২৫০-৩০০ গ্রাম, বাসা মাছের ফিলে ৪টে, ডিম ৩টে, পেঁয়াজবাটা ১ টেবলচামচ, রসুন-আদাবাটা ১ টেবলচামচ, পাতিলেবুর রস ১ টেবলচামচ, কাঁচালঙ্কাকুচি ২ টেবলচামচ, ব্রেডক্রাম ১ কাপ, কর্নফ্লাওয়ার ১/২ কাপ, ধনেপাতা ও পুদিনাপাতাকুচি ১/২ কাপ (মেশানো), ভাজার জন্য তেল ২ কাপ, নুন স্বাদমতো, হলুদগুঁড়ো সামান্য।

প্রণালী: মাছের ফিলেগুলো ভাল করে ধুয়ে নুন ও লেবুর রস মাখিয়ে রাখুন। ১০ মিনিট পর অতিরিক্ত জল ঝরিয়ে শুকনো করে মুছে নিন। এবার মাছের ফিলেগুলোতে স্বাদমতো নুন, পেঁয়াজবাটা, আদা-রসুনবাটা, কাঁচালঙ্কাকুচি, ধনেপাতা ও পুদিনাপাতাকুচি দিয়ে ভাল করে মেখে এক ঘণ্টা ম্যারিনেট করে রাখুন। চর্বির টুকরোগুলো নুন-হলুদ মাখিয়ে রাখুন। চর্বি দিয়ে ফিলেগুলো মুড়ে দিন। অন্য একটি পাত্রে ডিম, কর্নফ্লাওয়ার ও নুন দিয়ে একটি গোলা তৈরি করুন। চর্বি জড়ানো ফিলেগুলো এই গোলায় ডুবিয়ে ব্রেডক্রামে গড়িয়ে ডুবো তেলে ভাজুন। আঙুলের সাহায্যে ডিমের গোলার মিশ্রণ তুলে চর্বির কাটলেটের উপর ছড়িয়ে দিন। দু'পিঠে সোনালি রং ধরলে পুরো ডিমের জালিটি কাটলেটের গায়ে পাটিসাপটার মত পেঁচিয়ে নিন। তেল ছেঁকে তুলে স্যালাড ও কাসুন্দিসহ গরম গরম পরিবেশন করুন।

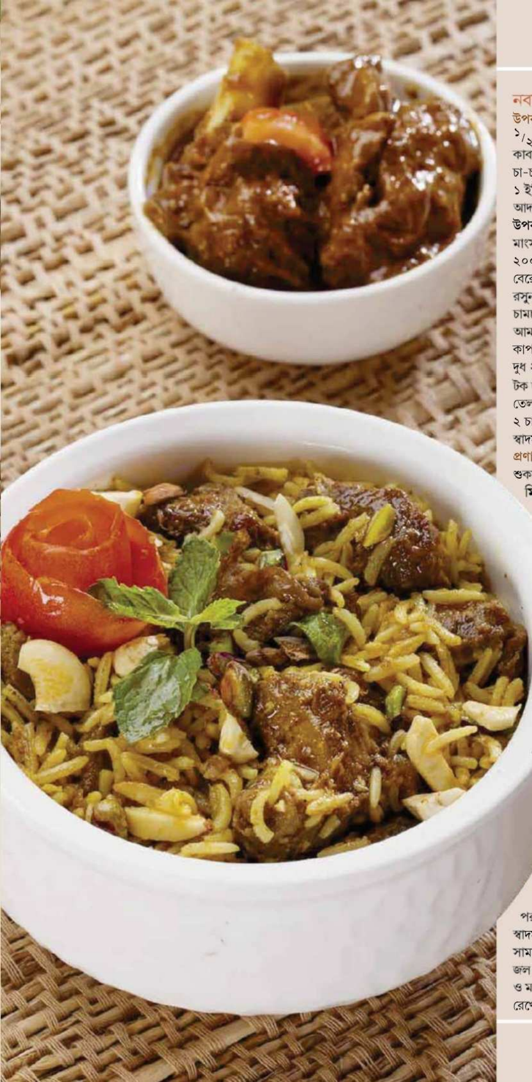


ইচা মাছের রসোল্লাস

উপকরণ: চিংড়ি (ইচা মাছ) বাটা ১ কাপ, পেঁয়াজকুচি ২ টেবলচামচ, আদা-রসুনকুচি ১ টেবলচামচ, লঙ্কাকুচি ১ চা-চামচ, নারকোলকোরা ২ টেবলচামচ, গরমমশলাগুঁড়ো সামান্য, নুন স্বাদমতো, হলুদগুঁড়ো সামান্য। **পুরের জন্য:** মেটের কিমা ১ কাপ, পেঁয়াজ ১টা (কুচোনো), আদা-রসুনবাটা ১ টেবলচামচ, ধনেগুঁড়ো ১ চা-চামচ, জিরেগুঁড়ো ১ চা-চামচ, লঙ্কাগুঁড়ো ১ চা-চামচ, গরমমশলাগুঁড়ো ১/২ চা-চামচ, টোম্যাটো ১টা (কুচোনো), সরষের তেল ২ টেবলচামচ, ঘি ১ চা-চামচ, ধনেপাতাকুচি ২ চা-চামচ, হলুদগুঁড়ো সামান্য, নুন এবং চিনি স্বাদ অনুযায়ী। **গ্রেভি বানানোর জন্য:** ঘন নারকেলের দুধ ১ কাপ, পেঁয়াজবাটা ২ টেবলচামচ, আদা-রসুনবাটা ১ টেবলচামচ, টোম্যাটো ১টা (কুচোনো), গোটা জিরে ১ চা-চামচ, গোটা ধনে ১ চা-চামচ, শুকনোলঙ্কা ২টো, গোটা গরমমশলা ১ টেবলচামচ, তেজপাতা ২টো, সরষের তেল ১/২ কাপ, ঘি ১ টেবলচামচ, নুন ও চিনি স্বাদমতো, হলুদগুঁড়ো সামান্য।



প্রণালী: কড়াইতে খানিকটা তেল গরম করে পেঁয়াজকুচি ছেড়ে ভাজুন। পেঁয়াজে বাদামি রং ধরলে টোম্যাটোকুচি, মেটে, স্বাদমতো নুন, চিনি, ঘি এবং পুরের সব বাটা ও গুঁড়ো মশলা মিশিয়ে নাড়াচাড়া করুন। প্রয়োজনে অল্প গরমজল দিতে পারেন। মেটে সেদ্ধ হলে ধনেপাতাকুচি ছড়িয়ে নামিয়ে নিন। গোটা জিরে, ধনে, শুকনোলঙ্কা ও গরমমশলা একসঙ্গে জলে ভিজিয়ে বেটে নিন। অন্য পাত্রে পেঁয়াজবাটা, আদা-রসুনবাটা, হলুদগুঁড়ো ও খানিকটা সরষের তেল অল্প জলে গুলে রাখুন। চিংড়িবাটা সমস্ত উপকরণ দিয়ে মেখে তাতে মেটের পুর ভরে ছোট বলের আকারে গড়ে ডুবো তেলে ভেজে তুলে নিন। ওই তেলে অল্প চিনি দিয়ে নাড়াচাড়া করে তেজপাতা ও পেঁয়াজবাটার মিশ্রণ ছেড়ে কষুন। টোম্যাটো ও জিরেবাটার মিশ্রণ মিশিয়ে আরও কিছুক্ষন নাড়ুন। মশলা থেকে তেল বেরোলে অল্প গরমজল ও নারকেলের দুধ দিন। ফুটে উঠলে ঘি, স্বাদমতো নুন ও ভাজা চিংড়ির বলগুলি ছাড়ুন। মাখা মাখা হলে নামিয়ে নিন।



নবাবি তেহারি

উপকরণ: **তেহারি মশলার জন্য:** জয়িত্রি $^{1}/_{2}$ চা-চামচ, জায়ফল $^{1}/_{2}$ চা-চামচ, কাবাবচিনি $^{1}/_{2}$ চা-চামচ, শামরিচ $^{1}/_{2}$ চা-চামচ, এলাচ ও লবঙ্গ ৬-৮টি, দারচিনি ১ ইঞ্চি, শুকনোলঙ্কা ৪টে, তেজপাতা ২টো, আদা-রসুনকুচি ১ টেবলচামচ। **অন্যান্য উপকরণ:** ছোট টুকরো করে কাটা খাসির মাংস ১ কেজি, কাটা ছাড়া রুই মাছ ভাজা ২০০ গ্রাম, পোলাওয়ের চাল $^{1}/_{2}$ কেজি, বেরেস্তা ১ কাপ, আদাবাটা ১ টেবলচামচ, রসুনবাটা ১ টেবলচামচ, জিরেগুঁড়ো ১ চা-চামচ, ধনেগুঁড়ো ১ চা-চামচ, পোস্ত-কাজু-আমন্ডবাটা (সমপরিমাণে ভিজিয়ে বাটা) $^{1}/_{2}$ কাপ, গোটা গরমমশলা ১ টেবলচামচ, গুঁড়ো দুধ ২ টেবলচামচ, কিশমিশ ২ টেবলচামচ, টক দই ১ কাপ, চেরা কাঁচালঙ্কা ৪-৬টি, সাদা তেল ১ কাপ, ঘি $^{1}/_{2}$ কাপ, কেওড়ার জল ২ চা-চামচ, হলুদগুঁড়ো সামান্য, নুন ও চিনি স্বাদমতো।

প্রণালী: তেহারি মশলার উপকরণগুলো শুকনো খোলায় ভেজে গুড়িয়ে হলুদগুঁড়ো মিশিয়ে রাখুন। চাল ধুয়ে কিছুক্ষণ ভিজিয়ে জল ঝরিয়ে নিন। খাসির মাংস টক দই, আদা-রসুনবাটা এবং স্বাদমতো নুন দিয়ে এক ঘণ্টা মেখে রাখুন। কড়াইয়ে সমপরিমাণে তেল ও ঘি গরম করে গোটা গরমমশলা ফোড়ন দিন। সুগন্ধ বেরোলে বাদামবাটা, জিরে ও ধনেগুঁড়ো, বেরেস্তা, অল্প চিনি, ২-৩টে চেরা কাঁচালঙ্কা ও সামান্য জল দিয়ে কষুন। মশলা তেল ছাড়লে ম্যারিনেট করা মাংস দিন। কিছুক্ষণ কষিয়ে অল্প চিনি ও তেহারি মশলা মিশিয়ে নাড়াচাড়া করুন। মাংসের উপরে তেল ভেসে উঠলে সামান্য গরমজল দিন। মিশ্রণ ফুটে উঠলে আঁচ কমিয়ে জল শুকোতে দিন। মাংস সেদ্ধ হলে নামিয়ে তেল আলাদা করে নিন। অন্য আঁচে চওড়া মুখের হাড়ি বসিয়ে মাংসের তেল ঢালুন। এতে চাল দিয়ে নাড়াচাড়া করুন। দু' মিনিট ভাজার পর চালের দ্বিগুণ পরিমাণ গরমজল দিয়ে স্বাদমতো নুন, বাকি কাঁচালঙ্কা, কিশমিশ, সামান্য জলে গোলা গুঁড়ো দুধ ও কেওড়ার জল মেশান। ভাত তিন ভাগ সেদ্ধ হলে মাছ ও মাংস মিশিয়ে দমে বসান। ২০ মিনিট দমে রেখে ইচ্ছেমতো সাজিয়ে পরিবেশন করুন।





কই তৈলাব্র

উপকরণ: বড় কই মাছ ৪-৬টা, কুচোনো পেঁয়াজ ১/২ কাপ, আদা-রসুনবাটা ১ টেবলচামচ, ধনেগুঁড়ো ১ চা-চামচ, জিরেগুঁড়ো ১ চা-চামচ, লঙ্কাগুঁড়ো ১ চা-চামচ, কাঁচা আমের আচার ১/২ কাপ, সরষের তেল ১ কাপ, নুন স্বাদমতো, হলুদগুঁড়ো অল্প। **পুরের জন্য:** চিকেন কিমা ১/২ কাপ, পেঁয়াজ ১টা (কুচোনো), আদা-রসুনবাটা ১ টেবলচামচ, ধনেগুঁড়ো ১ চা-চামচ, জিরেগুঁড়ো ১ চা-চামচ, টোম্যাটো ১টা (কুচোনো), আমচুর ২ টেবলচামচ, সরষের তেল ২ টেবলচামচ, কাঁচালঙ্কা ৪টে (কুচোনো), ধনেপাতাকুচি ২ চা-চামচ, হলুদগুঁড়ো সামান্য, নুন ও চিনি স্বাদমতো।

প্রণালী: কড়াইতে খানিকটা তেল গরম করে পেঁয়াজকুচি দিয়ে ভাজুন। বাদামি রং ধরলে এক এক করে পুরের সব উপকরণ দিয়ে অল্প জল দিন। মিশ্রণের জল শুকিয়ে গা মাখা মাখা হলে ধনেপাতাকুচি ছড়িয়ে নামিয়ে নিন। ধনেগুঁড়ো, জিরেগুঁড়ো, লঙ্কাগুঁড়ো ও হলুদগুঁড়ো একসঙ্গে জলে গুলে রাখুন। মাছগুলো ধুয়ে দু'পিঠ চিরে নুন-হলুদ মাখিয়ে রাখুন। আধ ঘণ্টা পরে মাছের মাথায় কাটা অংশ দিয়ে পুর পেটের ভেতরে ভরুন। কড়াইতে তেল গরম করে মাছগুলো হালকা ভেজে তুলে নিন। ওই তেলে পেঁয়াজকুচি দিন। গোলা মশলার মিশ্রণ ঢেলে নাড়াচাড়া করুন। মশলা কষানো হলে আদা-রসুনবাটা ও স্বাদমতো নুন দিয়ে কিছুক্ষণ নেড়ে আমের আচার দিন। ভাজা মাছগুলো ছেড়ে সামান্য জল দিয়ে আঁচটা কমিয়ে রান্না করুন। মাছ সেদ্ধ হলে ও মশলা তেল ছাড়লে ধনেপাতাকুচি ছড়িয়ে গরম ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করুন।







পুরভরা ভেটকি পাতুরি

উপকরণ: ভেটকিমাছের গাদার টুকরো (রিং পিস) ৪-৬টা, পোস্তবাটা ১ টেবলচামচ, সরষেবাটা ১ টেবলচামচ, নারকোলকোরা ১ কাপ, কাঁচালঙ্কাবাটা ১ টেবলচামচ, চেরা কাঁচালঙ্কা ৪-৬টা, সরষের তেল ৪ টেবলচামচ, পাতিলেবুর রস ২ টেবলচামচ, নুন স্বাদমতো, হলুদগুঁড়ো সামান্য, পাতুরির জন্য কলাপাতা ৪-৬টা, বাঁধার জন্য সুতো অল্প। **পুরের জন্য:** মাংসের কিমা ১ কাপ, পেঁয়াজ ১টা (কুচোনো), আদারসুনবাটা ১ টেবলচামচ, ধনেগুঁড়ো ১ চা-চামচ, জিরেগুঁড়ো ১ চা-চামচ, লঙ্কাগুঁড়ো ১ চা-চামচ, গরমমশলাগুঁড়ো ১/২ চা-চামচ, টোম্যাটো ১টা (কুচোনো), সরষের তেল ২ টেবলচামচ, ঘি ১ চা-চামচ, তেজপাতা ২টো, ধনেপাতাকুচি ২ চা-চামচ, হলুদগুঁড়ো ১/২ চা-চামচ, নুন ও চিনি স্বাদমতো।

প্রণালী: কড়াইতে তেল ও ঘি গরম করে তেজপাতা ফোড়ন দিন। পেঁয়াজকুচি দিয়ে ভাজুন। পেঁয়াজে রং ধরলে মাংস, টোম্যাটোকুচি, স্বাদমতো নুন, চিনি এবং পুরের সব বাটা ও গুঁড়ো মশলা মিশিয়ে নাড়াচাড়া করুন। মশলার কাঁচাভাব চলে গেলে সামান্য গরমজল মেশান। মাংস সেদ্ধ হওয়া অবধি ঢাকা বন্ধ করে ঢিমে আঁচে রাখুন। মাংস সেদ্ধ হলে এবং মিশ্রণ শুকনো হয়ে এলে ধনেপাতাকুচি ছড়িয়ে নামিয়ে নিন। অন্য পাত্রে পোস্তবাটা, সরষেবাটা, কাঁচালঙ্কাবাটা, নারকেলকোরা, অল্প সরষের তেল ও সামান্য হলুদগুঁড়ো একসঙ্গে মিশিয়ে রাখুন। ভেটকিমাছের গায়ে পাতিলেবুর রস, স্বাদমতো নুন ও হলুদগুঁড়ো মাখিয়ে আধ ঘণ্টা রাখুন। এরপর মাছের টুকরোগুলোর পেটের ফাঁকা অংশে তৈরি করে রাখা মাংসের পুর ভরুন। পুর ভরা টুকরোগুলো সরষে ও পোস্তর মিশ্রণে ভাল করে মাখিয়ে এক ঘণ্টা রাখুন। কলাপাতার উপর মাছের টুকরোগুলো রেখে উপরে চেরা কাঁচালঙ্কা ও সামান্য সরষের তেল ছড়িয়ে মুড়ে সুতো দিয়ে বেঁধে দিন। ননস্টিক তাওয়ায় মাছের দু'পিঠ ভাল করে সেঁকে নিন। কলাপাতা পোড়া পোড়া হলে নামিয়ে নিন।



কুন্দন কালিয়া

উপকরণ: হাড়ছাড়া ভেড়ার মাংস ১ কেজি (মাঝারি মাপের টুকরো করা), টকদই ১ কাপ, ঝিরিঝিরি করে কুচোনো পেঁয়াজ ১$^{১}/_{২}$ কাপ, আদার রস ২ টেবলচামচ, রসুনের রস ২ টেবলচামচ, কাশ্মীরিলঙ্কাবাটা ১ চা-চামচ, ধনেগুঁড়ো ১ চা-চামচ, হলুদগুঁড়ো ১ চা-চামচ, নুন স্বাদমতো, ঘি ১ কাপ, মালাই $^{১}/_{২}$ কাপ, কেওড়ার জল ১ চা-চামচ, জাফরান ১ চিমটে, ময়দা আধকাপ, সাজানোর জন্য সোনালি তবক অল্প। **গরম মশলার জন্য:** ছোট এলাচ ৬টা, বড় এলাচ ২টো, দারচিনি ১ ইঞ্চি, জয়িত্রি ১টা ফুল, লবঙ্গ $^{১}/_{২}$ চা-চামচ, গোলমরিচ ১ চা-চামচ। **পুরের জন্য:** টুকরো করা ভেটকিমাছের ফিলে ১ কাপ, পেঁয়াজ ১টা (কুচোনো), আদারসুনবাটা ১ টেবলচামচ, ধনেগুঁড়ো ১ চা-চামচ, জিরেগুঁড়ো ১ চা-চামচ, টোম্যাটো ১টা (কুচোনো), আমচুর ২ টেবলচামচ, সরষের তেল ২ টেবলচামচ, কাঁচালঙ্কা ৪টে (কুচোনো), ধনেপাতাকুচি ২ চা-চামচ, হলুদগুঁড়ো $^{১}/_{২}$ চা-চামচ, নুন ও চিনি স্বাদমতো।

প্রণালী: কড়াইতে তেল গরম করুন। মাছের টুকরোতে নুন-হলুদ মাখিয়ে তেলে দিয়ে নাড়াচাড়া করুন। মাছের কাঁচাভাব চলে গেলে পুরের বাকি সব উপকরণ দিয়ে নাড়াচাড়া করুন। অল্প জল দিতে পারেন। মিশ্রণ গা মাখা মাখা হলে ধনেপাতাকুচি ছড়িয়ে নামিয়ে নিন। গরমমশলার সব উপকরণ একসঙ্গে গুঁড়ো করে নিন। অন্য পাত্রে মাংস আধসেদ্ধ করে জল ছেঁকে তুলে রাখুন। স্টক রেখে দিন। মাংসের টুকরো চিরে পকেট বানিয়ে তাতে অল্প করে মাছের পুর ভরুন। খেয়াল রাখবেন, মাংসের টুকরো যেন ভেঙে না যায়। সামান্য জল দিয়ে ময়দা পাতলা করে গুলে মাংসের টুকরোগুলো ডুবিয়ে নিন। ডেকচিতে ঘি গরম করে পেঁয়াজকুচি ছেড়ে হালকা বাদামি ও মুচমুচে করে ভাজুন। ঠান্ডা হলে গুড়িয়ে ২ টেবলচামচ টকদইয়ের সঙ্গে মিশিয়ে রাখুন। ওই ঘিতে পুর ভরা মাংসের টুকরো এবং স্বাদমতো নুন দিয়ে ভাজুন। হালকা বাদামি রং ধরলে দই আর পেঁয়াজের মিশ্রণ দিয়ে নাড়াচাড়া করুন। একে একে আদার রস, রসুনের রস, লঙ্কাবাটা, ধনেগুঁড়ো ও হলুদগুঁড়ো মিশিয়ে আরও কিছুক্ষণ কষিয়ে নিন। মশলা ঘি ছাড়লে বাকি ফেটানো টকদই দিয়ে নাড়ুন। স্টক ও গরম মশলাগুঁড়ো মেশান। ঢাকা দিয়ে মাংস সেদ্ধ হতে দিন। মাংস সেদ্ধ হলে মশলা থেকে তুলে মশলাটা ছাঁকনি দিয়ে ছেঁকে নিন। ডেকচিতে এই ছাঁকা মশলা ও সেদ্ধ করা মাংস দিয়ে মালাই মেশান। মিশ্রণ ফুটতে দিন। ফুটে উঠলে কেওড়ার জল ও জাফরান মিশিয়ে ঢাকা দিয়ে আঁচ বন্ধ করে কিছুক্ষণ রাখুন। তবক দিয়ে সাজিয়ে পরিবেশন করুন।



পুঁটুলি কোরমা

উপকরণ: চিকেন ব্রেস্ট ৫০০ গ্রাম, ভাজা পেঁয়াজবাটা আধকাপ, আদা-রসুনবাটা ১ টেবলচামচ, ধনেগুঁড়ো ১ চা-চামচ, লঙ্কাগুঁড়ো ১ চা-চামচ, গরমমশলাগুঁড়ো ১ চা-চামচ, পোস্ত-কাজু-আমন্ডবাটা ১/২ কাপ (সমপরিমাণে ভিজিয়ে বাটা), জল ঝরানো টক দই ১/২ কাপ, সাদা তেল ১/২ কাপ, ঘি ২ টেবলচামচ, গোটা গরমমশলা ১ টেবলচামচ, তেজপাতা ১টা, চেরা কাঁচালঙ্কা ২টো, পাতিলেবুর রস ১ টেবলচামচ, হলুদগুঁড়ো ১/২ চা-চামচ, নুন ও চিনি স্বাদমতো। **পুরের জন্য:** মাছের ডিম ২০০ গ্রাম, পেঁয়াজ ১টা (কুচোনো), আদা-রসুনবাটা ১ টেবলচামচ, ধনেগুঁড়ো ১ চা-চামচ, টোম্যাটো ১টা (কুচোনো), কাঁচালঙ্কা ৪টে (কুচোনো), ধনেপাতাকুচি ২ চা-চামচ, সরষের তেল ১/২ কাপ, ঘি ২ টেবলচামচ, গরমমশলাগুঁড়ো ১/২ চা-চামচ, হলুদগুঁড়ো ১/২ চা-চামচ, নুন ও চিনি স্বাদমতো।

প্রণালী: কড়াইতে তেল গরম করুন। মাছের ডিম স্বাদমতো নুন, হলুদগুঁড়ো দিয়ে মেখে ভাজুন। একটু ভাজা ভাজা হলে একে একে পুরের বাকি সব উপকরণ দিয়ে নাড়াচাড়া করুন। মিশ্রণ মাখা মাখা হলে ধনেপাতাকুচি ছড়িয়ে নামিয়ে নিন।
মুরগির মাংস পাতলা করে কেটে স্বাদমতো নুন ও লেবুর রস মাখিয়ে রাখুন। ১০ মিনিট পরে শুকনো করে মুছে নিন। প্রতিটি মাংসের টুকরোয় পরিমাণমতো ডিমের পুর ভরে পুঁটুলির মতো গড়ে সুতো দিয়ে বেঁধে গরমজলে ৫ মিনিট ভাপিয়ে নিন। কড়াইতে ঘি ও সাদাতেল গরম করে পুঁটুলিগুলো লালচে করে ভেজে নিন। ওই তেলে অল্প চিনি, গোটা গরমমশলা ও তেজপাতা ফোড়ন দিয়ে আদাবাটা, রসুনবাটা, স্বাদমতো নুন, হলুদগুঁড়ো, লঙ্কাগুঁড়ো ও চেরা কাঁচালঙ্কা দিয়ে নাড়াচাড়া করুন। এতে পেঁয়াজ ও বাদামবাটার মিশ্রণ মিশিয়ে নাড়াচাড়া করে পুঁটুলিগুলো দিন। ধনেগুঁড়ো, গরমমশলাগুঁড়ো, টকদই ও জল দিয়ে কষিয়ে নিন। মিশ্রণ তেল ছাড়লে অল্প গরমজল মেশান। জল শুকিয়ে মিশ্রণ ঘন হলে নামিয়ে পরিবেশন করুন।



যোগাযোগ: ৮৯৬১০১২৩৯৮
ছবি: অয়ন নন্দী





ত্বকের সমুদ্রস্নান

সবে বৈশাখের আগমন ঘটেছে। আকাশে সূর্যের তেজ কিন্তু ইতিমধ্যেই বেশ প্রবল। আর এই খটখটে রোদে ত্বকের অবস্থা ঠিক চাতক পাখির মতো! এমন সময়ে ত্বককে তরতাজা ও প্রাণবন্ত করে তুলতে ভরসা রাখুন মেরিন ফেশিয়ালের উপর। এবারের নববর্ষে এটাই হোক স্কিনকেয়ার ট্রেন্ড! খোঁজ দিলেন সায়নী দাশশর্মা।





রূপচর্চায় সি-সল্ট, সি-উইডের মতো সামুদ্রিক উপাদানের ব্যবহার খুব একটা নতুন ঘটনা নয়। ত্বকের উপকারী ভিটামিন, মিনারেলে সমৃদ্ধ এই উপাদান আধুনিক রূপচর্চাতেও সমান উপযোগী।

নতুন বছর, তবে মরশুম বহু চেনা। সূর্যের কড়া শাসানিতে বাইরে বেরোনো দায়! বাড়িতেও এক মুহূর্ত শান্তি নেই। গরমের দাপটে সর্বত্রই হাঁসফাঁস হওয়ার জোগাড়। এই গরমে সুন্দর থাকা? সে তো সোনার পাথরবাটি! রোদের আগুনে ত্বক ঝলসে একাকার। সেই সঙ্গে তেলতেলে ত্বক, ঘাম জমে অ্যাকনে, র‍্যাশেরও পোয়া বারো। বাড়িতে বসে আয়েস করেও যে যত্ন নেবেন, সেখানেও সমস্যা। অত সময় আজকাল আর কারই বা থাকে! তাছাড়া সময়টাও তো সাধারণ নয়। বাঙালির নতুন বছর। চারদিকে খুশির রেশ। এই সময় ত্বকের সমস্যা নিয়ে জেরবার হতে ভাল না লাগারই কথা। সুন্দর থাকতে এই সময় ত্বকের প্রয়োজন বিশেষ আদর। আজ সেই বিষয়েই কথা বলব। শরীর ঠান্ডা রাখতে যেমন জলের কোনও বিকল্প নেই, ঠিক তেমনই গরমে সুন্দর থাকতেও কাজে লাগাতে পারেন জল। না, সাধারণ জলের কথা মোটেও বলছি না। বলছি সমুদ্রের কথা। সমুদ্রের অতল গভীরে এমন অনেক উপাদান লুকিয়ে রয়েছে, যা আপনার নির্জীব ত্বকের প্রাণ ফিরিয়ে দিতে পারে।





সমুদ্রের জল ছাড়াও সি-উইড, অ্যালগি, মেরিন ক্রিস্টাল, ক্যাভিয়ারের মতো এমন অনেক উপাদান রয়েছে, যা আজকাল রূপচর্চার দরবারে বেশ সুপরিচিত। আর সেই উপকারিতার সূত্র ধরেই বর্তমানে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে মেরিন ফেশিয়াল। বলতে পারেন ত্বকের যাবতীয় সমস্যার অব্যর্থ সমাধান এই আধুনিক ফেশিয়াল রেঞ্জ। সামুদ্রিক উপাদানের গুণে সমৃদ্ধ এই ফেশিয়াল ত্বক ঠান্ডা রাখবে, পাশাপাশি নিষ্প্রভ ত্বকে ফুটিয়ে তুলবে লাবণ্য।

মেরিন ফেশিয়াল কী?

বিগত কয়েক বছরে রূপচর্চার জগতে সমুদ্রজাত বিভিন্ন উপাদান বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। ক্রিম, ফেসপ্যাক, স্ক্রাব তথা ফেসওয়াশে আজকাল সামুদ্রিক উপাদানের ছড়াছড়ি। আর সেই সূত্র ধরেই এসেছে মেরিন ফেশিয়াল। সাধারণ স্কিনকেয়ার প্রডাক্টের তুলনায় ফেশিয়াল ত্বকের অনেক গভীরে গিয়ে কাজ করে বলে ফলও অনেক দ্রুত পাওয়া যায়। তাছাড়া ফেশিয়াল যেহেতু বেশ সময়সাপেক্ষ, তাই এর উপকারিতাও সাধারণ স্কিনকেয়ার রেজিমের থেকে অনেকটাই বেশি। এই ফেশিয়ালের প্রতিটি ধাপেই সমুদ্রজাত বিভিন্ন উপাদান ব্যবহার করা হয়। এক কথায়, নির্জীব, রুক্ষ ত্বকের জিয়নকাঠি এই ফেশিয়াল। ত্বকের সব ধরনের সমস্যার জন্যই একাধিক মেরিন ফেশিয়ালের অপশন রয়েছে এখন। তবে প্রতিটি ফেশিয়ালেরই প্রধান কাজ ত্বকে আর্দ্রতার পরিমাণ সঠিক রাখা। মেরিন ওয়াটার, মাইক্রো অ্যালগি, সি-ক্রিস্টাল, সি-উইডের মতো একাধিক উপাদানের উপকারিতা পাওয়া যায় প্রতিটি ফেশিয়ালে। এই প্রতিটি উপাদানেই ত্বকের উপকারী একাধিক মিনারেল রয়েছে, যা ত্বক স্বাস্থ্যোজ্জ্বল রাখতে সাহায্য করে। সমুদ্রের জল আমাদের স্কিন ব্যারিয়ার মজবুত করতে উপযোগী। এতে ত্বক সহজে আর্দ্রতা হারায় না। ফলস্বরূপ ত্বকের জেল্লা এবং কোমলতা বজায়





সামুদ্রিক নির্যাস যেন ত্বকে ভালভাবে শোষিত হয়, তাই ব্যবহৃত হয় এই ফয়েল র‍্যাপ।



সুদিং ডাবল মাস্ক ত্বক ঠান্ডা ও নরম রাখতে সাহায্য করে।

থাকে। সামুদ্রিক অ্যালগি এবং সি-উইডে প্রায় সব ধরনের ভিটামিন বর্তমান। সেই সঙ্গে রয়েছে জিঙ্ক, পটাশিয়াম, আয়রনের মতো খনিজ, যা ত্বকের কোষ সজীব রাখতে আবশ্যক। উপাদান ছাড়াও এই ফেশিয়ালের অন্যতম বিশেষত্ব এর মাসাজিং পদ্ধতি। সমুদ্রের ঢেউয়ের আন্দোলনের অনুকরণে সৃষ্ট এই মাসাজ মাসল টেনশন কমিয়ে পেশি রিল্যাক্স করতে সাহায্য করে। এতে ত্বক মসৃণ, তরতাজা এবং যৌবনোচ্ছ্বল থাকে। সব মিলিয়ে বলা যেতে পারে স্বাস্থ্যোজ্জ্বল ত্বকের চাবিকাঠি এই মেরিন ফেশিয়াল। নতুন বছরে ট্রাই করে দেখতে পারেন। কথা দিচ্ছি, নিরাশ হবেন না।

থ্রি অ্যালগি মেরিন ফেশিয়াল

বিভিন্ন ধরনের মেরিন ফেশিয়ালের মধ্যে এটি সবথেকে জনপ্রিয়। সব ধরনের ত্বকের জন্য উপকারী এই ফেশিয়ালটির বিশেষত্ব এর উপকরণ। এই ফেশিয়ালের প্রতিটি উপকরণেই রয়েছে বিভিন্ন সামুদ্রিক জীবের নির্যাস। তিন ধরনের সামুদ্রিক অ্যালগির মিশ্রণে তৈরি করা হয় এর প্রধান মাস্ক। পাশাপাশি এতে রয়েছে সি-উইড, যা ত্বকের প্রয়োজনীয় মিনারেলের ব্যালেন্স বজায় রাখে এবং ত্বকের পুনরুজ্জীবনে সাহায্য করে। তবে সবথেকে প্রথমে ব্যবহার করা হয় সামুদ্রিক নির্যাসযুক্ত অ্যাকোয়াটিক এসেন্স এবং মেরিন মিস্ট। এতে ত্বকের হারিয়ে যাওয়া আর্দ্রতা ফিরে আসে। এরপর বিশেষ মাসাজ পদ্ধতিতে ক্লেনজারের সাহায্যে ত্বক



থ্রি অ্যালগি এবং সোর্স মেরিন ফেশিয়ালের বিভিন্ন ধাপ

ভালভাবে পরিষ্কার করে এক্সফোলিয়েট করে নেওয়া হয়। এরপর টোনার এবং ট্রিটমেন্ট জেল লাগানোর পর ব্যবহার করা হয় সি-উইডযুক্ত মাস্ক। মাস্ক ব্যবহার করার পর অ্যালুমিনিয়াম ফয়েলের সাহায্যে মুখ ভালভাবে ঢেকে দেওয়া হয়। এতে মাস্ক ভালভাবে ত্বকের গভীরে প্রবেশ করার সুযোগ পায় এবং এতে মাস্কের কার্যকারিতাও বৃদ্ধি পায়। প্রায় ২০ মিনিট মুখে এই মাস্ক লাগিয়ে রাখার পর বিশেষ মাসাজ ক্রিমের সাহায্যে প্রায় ১৫ মিনিট ধরে ত্বক ভালভাবে মাসাজ করা হয়। এতে ফেশিয়াল মাসল টোনড এবং রিল্যাক্সড হয়। সবশেষে ব্যবহার করা হয় ময়শ্চারাইজ়ার। ত্বকের উপরিভাগে জমে থাকা মৃত কোষের আস্তরণ সরিয়ে ফুটিয়ে তোলে লাবণ্য। ত্বকের আর্দ্রতা বজায় থাকে, ত্বকে জমে থাকা টক্সিন দূর হয়। এতে বিভিন্ন ক্রিম এবং লোশনও ত্বকের অনেক গভীরে প্রবেশ করতে পারে। ত্বক হয়ে ওঠে কোমল এবং স্বাস্থ্যোজ্জ্বল।

সোর্স মেরিন ফেশিয়াল

ত্বক ভাল রাখতে নিয়মিত ময়শ্চারাইজ়ারের ব্যবহার যে কতটা





গ্রীষ্মের রুদ্ররূপে ত্বকের সমস্যা অবশ্যম্ভাবী। শুধুমাত্র ঘরোয়া যত্ন এইসব সমস্যা সমাধানের জন্য যথেষ্ট নয়। ত্বক ঠান্ডা এবং কোমল রাখতে মাসে অন্তত একবার এই ধরনের ফেশিয়াল করাতে পারেন।

গুরুত্বপূর্ণ, তা বলাই বাহুল্য! শরীরের বিভিন্ন অংশের মতো ত্বকেরও জলের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। ত্বক কোমল রাখতে, উজ্জ্বলতা বজায় রাখতে জলের কোনও বিকল্প নেই। আর এই প্রয়োজন শুধুমাত্র শুষ্ক বা স্বাভাবিক ত্বকের জন্যই নয়, তৈলাক্ত এবং মিশ্র প্রকৃতির ত্বকের ক্ষেত্রেও একই। কিন্তু গ্রীষ্মপ্রধান দেশ হওয়ায়, শীতকাল বাদে সারাবছর ত্বকের আর্দ্রতা নিয়ে আমরা কেউই বিশেষ মাথা ঘামাই না। দিনের পর দিন আর্দ্রতার অভাবে ত্বকের শুষ্কতাও বাড়তে থাকে, ত্বক ডিহাইড্রেটেড হয়ে পড়ে। পর্যাপ্ত জলের অভাবে ত্বকের নমনীয়তা কমতে থাকে, ত্বক রুক্ষ এবং নির্জীব হয়ে পড়ে। এতে বলিরেখা, ফাইন লাইনস, এজিং স্পট ইত্যাদিও দ্রুত দেখা দেয়। এই সবকিছু থেকে ত্বককে রক্ষা করতে চাইলে ত্বকের হাইড্রেশন অর্থাৎ আর্দ্রতা বজায় রাখা একান্ত জরুরি। ত্বকের হারিয়ে যাওয়া আর্দ্রতা ফিরিয়ে আনতে আদর্শ এই সোর্স মেরিন ফেশিয়াল। শুষ্ক ত্বকের জন্য এই ফেশিয়াল খুবই উপকারী। এই ফেশিয়ালের প্রতিটি উপাদানই বিশেষ পদ্ধতিতে তৈরি, যা ত্বকে আর্দ্রতার সঠিক পরিমাণ বজায় রাখতে সাহায্য করে। মূলত তিনভাবে এই ফেশিয়াল ত্বকের উপকার করে। এটি ত্বকের জল শোষণ ক্ষমতা বাড়ায়। ফলে ত্বক পরিবেশ থেকে বেশিমাত্রায় আর্দ্রতা শোষণ করতে পারে। পাশাপাশি এটি ত্বকের উপরে আস্তরণের মতো কাজ করে আর্দ্রতা ধরে রাখতে সাহায্য করে। গ্রীষ্মের প্রবল অত্যাচারেও ত্বক সহজে আর্দ্রতা হারায় না। এই ফেশিয়ালের অন্যতম উপাদান মেরিন স্প্রিং ওয়াটার। ম্যাগনেশিয়াম, সিলিসিয়াম, ক্যালশিয়াম, পটাশিয়ামের মতো জরুরি মিনারেলে সমৃদ্ধ এই জল ত্বকের তৃষ্ণা মেটাতে অব্যর্থ। এই ফেশিয়ালে ব্যবহৃত হয় একটি বিশেষ পিল-অফ মাস্ক। এই মাস্কটি ত্বকের অশুদ্ধি দূর করার

পাশাপাশি ত্বককে আর্দ্রতা প্রদান করে। গ্রীষ্মের প্রবল দাবদাহেও এটি ত্বককে নরম ও তরতাজা রাখতে এবং উজ্জ্বলতা বাড়াতে সাহায্য করবে।

কোকুনিং মেরিন ফেশিয়াল

এই মেরিন ফেশিয়ালটি সেনসিটিভ ত্বকের জন্য আদর্শ। বিশেষত গরমকালের জন্য অত্যন্ত সুদিং এবং রিল্যাক্সিং এই ফেশিয়াল। রোদের তাপ থেকে হওয়া লালচেভাব, সানবার্ন, ট্যানিং, র‍্যাশের মতো নানা সমস্যার ক্ষেত্রেও এই ফেশিয়াল দারুণ উপযোগী। স্কিন অ্যালার্জি থেকেও উপশম দেবে এই কোকুনিং ফেশিয়াল। মাসাজ স্ট্রোক থেকে শুরু করে উপকরণ, এই ফেশিয়ালের প্রতিটি ধাপই অত্যন্ত মাইল্ড এবং জেন্টল, যা সেনসিটিভ ত্বকের জন্য আদর্শ। তাছাড়া এতে রয়েছে বিভিন্ন অ্যান্টি-এজিং উপাদান, যা ত্বক দৃঢ় এবং টানটান রাখতে উপকারী। এই ফেশিয়ালের প্রথম ধাপে জেন্টল ক্লেনজ়ার এবং স্ক্রাবের সাহায্যে ত্বক ভালভাবে পরিষ্কার করে নেওয়া হয়। এরপর জেল মাস্ক লাগিয়ে পাতলা কাপড় দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। প্রায় আধ ঘণ্টা এভাবে থাকার পর আঙুলের সাহায্যে খুব আলতোভাবে পুরো মুখ, গলা এবং ঘাড় বিশেষ পদ্ধতিতে মাসাজ করা হয়। ত্বক পরিষ্কার থাকায় খুব সহজেই এই জেল ত্বকের গভীরে প্রবেশ করে। ত্বক ঠান্ডা থাকে, লালচেভাব তথা ইনফ্ল্যামেশন কমে এবং ত্বকের উজ্জ্বলতাও বাড়ে।



পিওর ফ্রেশনেস ফেশিয়াল

যাঁদের ত্বকের ধরন তৈলাক্ত বা মিশ্র প্রকৃতির, তাঁদের জন্য উপযোগী পিওর ফ্রেশনেস ফেশিয়াল। অ্যাকনে, ব্রন, র‍্যাশ, পিম্পল ইত্যাদি যাবতীয় সমস্যার ওয়ান স্টপ সলিউশন এই মেরিন ফেশিয়ালটি। এর বিশেষত্ব এর ডাবল মাস্ক যা ত্বকের ইনফ্ল্যামেশন কমানোর পাশাপাশি অতিরিক্ত তৈলাক্তভাবও কমায়। ত্বকে আর্দ্রতা এবং তৈলাক্তভাবের ভারসাম্য বজায় থাকায়, ত্বক স্বাস্থ্যোজ্জ্বল থাকে। এক্ষেত্রেও প্রথমে ত্বক ভালভাবে পরিষ্কার করে নেওয়া হয়। এরপর ব্যবহার করা হয় মেল্ট-ইন স্ক্রাব। সামুদ্রিক ক্রিস্টালযুক্ত এই স্ক্রাব অত্যন্ত সহজে ত্বকের সঙ্গে মিশে যায় এবং কোমলভাবে ত্বকের জমে থাকা মৃত কোষ এবং টক্সিনের পরত দূর করে। এই স্ক্রাব এক বিশেষ উপাদানে তৈরি, যা ত্বকের রন্ধ্রে জমে থাকা সেবাম দূর করতে অব্যর্থ। রন্ধ্র পরিষ্কার থাকায় অতিরিক্ত তেল ত্বকে জমতে পারে না। ফলে অ্যাকনের সমস্যাও কমে। আবার বিভিন্ন উপাদানও ত্বকের গভীরে প্রবেশ করতে পারে। এরপর ১৫ মিনিট ত্বক মাসাজ করা হয়। ফেশিয়ালের শেষধাপে ব্যবহার করা হয় বিশেষ ডাবল মাস্ক, যা ত্বককে লাবণ্যময় করে তোলে। ত্বক মসৃণ ও সজীব দেখায়।

সুতরাং বুঝতেই পারছেন, ত্বকের হেন কোনও সমস্যা নেই, যার সমাধান এই ফেশিয়ালে পাবেন না। অনেকে হয়তো ইতিমধ্যে নিজের পছন্দের ফেশিয়ালটি বেছেও ফেলেছেন। তবে শুধু সমস্যা থাকলেই নয়, ত্বকে কোনও সমস্যা না থাকলেও একঘেয়ে ফেশিয়ালের পরিবর্তে ট্রাই করে দেখতে পারেন মেরিন ফেশিয়াল। নতুন বছরে রূপচর্চাতেও না হয় একটু নতুনত্ব থাকল, ক্ষতি কী?

তথ্য ও লোকেশন সৌজন্য: সোলেস ডে স্পা অ্যান্ড ওয়েলনেস সেন্টার, বালিগঞ্জ
ফোন: ০৩৩ ৩০৫৩ ৯৩০০/০১/০২, ৮১০০৯৩৯৩০০

মডেল: তরুণিমা
মেক-আপ: ভাস্কর বিশ্বাস
ফোন: ৯০৫১৮২৩৫২৪
ছবি: শুভদীপ ধর





সেনসিটিভ ত্বকের জন্য আদর্শ কোকুনিং ফেশিয়ালের বিভিন্ন ধাপ





চেনা ছকের বাইরে...

ডাক্তার, ইঞ্জিনায়ার কিংবা শিক্ষিকা নন, এঁরা সকলেই বডিবিল্ডার। তথকথিত পুরুষশাসিত দেহসৌষ্ঠবের আসরে তুলে ধরেছেন নিজেদের সদর্প উপস্থিতি। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরে সাফল্য এনেছেন তাঁরা। চার সুপারওম্যানের সঙ্গে কথা বললেন দোলনা রায় ও সৌমী ঘোষ।

তথাকথিত টিনসেল টাউনের সেলেব না হলেও গ্ল্যামারে, লাবণ্যে, দেহসৌষ্ঠবে তাঁরা বহু বড় বড় 'তারকা'দের টেক্কা দিতে পারেন। এঁরা সকলেই মহিলা বডিবিল্ডার। এক পুরুষশাষিত ইন্ডাস্ট্রিতে নিজেদের দমে, নিজেদের প্রচেষ্টায় এঁরা রীতিমতো রাজত্ব করছেন। তাঁদের দেহসৌষ্ঠব দেখে চমক লাগে অনেকেরই। কিন্তু এই পেশিবহুল নির্মেদ চেহারার পিছনে রয়েছে অনেক সংগ্রাম, অনেক আত্মত্যাগ। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ আজ সেলেব ট্রেনার। কেউ বা শখের ডিস্কো জকি। আবার কেউ খুলে ফেলেছেন জিম। বহু বাধা-বিঘ্ন এবং প্রতিকূলতা অতিক্রম করে সাফল্যের মুখ দেখেছেন। একই সঙ্গে সংসারের যাবতীয় দায়দায়িত্বেও কোনও খামতি রাখেননি। এমনই চার জনপ্রিয় মহিলা বডি বিল্ডারের সঙ্গে আলাপ জমালাম আমরা।



সোনালি স্বামী

"এজ ইস জাস্ট আ নাম্বার"—এমনটাই মনে করেন ভারতের অন্যতম সেরা মহিলা বডি বিল্ডার সোনালি স্বামী। ছোটবেলা থেকে নাচ এবং খেলাধুলোর প্রতি উৎসাহ থাকলেও শরীরচর্চার কথা সেভাবে কখনও ভাবেননি। বিয়ের পর আর পাঁচটা মেয়ের মতোই ওজন বেড়ে যাওয়ায় তিনি হাঁটাহাঁটি শুরু করেন। কিন্তু কাঙ্ক্ষিত ফল

মিলছিল না। দ্বিতীয় সন্তান হওয়ার পর জিমে ভর্তি হন সোনালি। উদ্দেশ্য ছিল বাড়তি মেদ ঝরিয়ে ছিপছিপে হয়ে ওঠা। কে জানত জিম করতে আসা সেই মেয়েটাই একদিন দেশের অন্যতম সেরা মহিলা বডি বিল্ডার হয়ে উঠবেন! ‘‘আসলে আমি যে কোনও কাজই প্যাশন নিয়ে করি। জিম করতাম খুব মন দিয়ে।’’ তাঁর উৎসাহ এবং পর শুভাকাঙ্ক্ষীদের উৎসাহে তিনি ২০১৪ সালে ভারতে আয়োজিত ‘ফিট ফ্যাক্টর’ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। ‘‘এটাই ছিল আমার প্রথম দেহসৌষ্ঠবের প্রতিযোগিতা। ফলে আমি বেশ ভয়ে ভয়েই ছিলাম। অন্যান্য প্রতিযোগীরা প্রায় সকলেই ছিলেন বয়সে আমার চেয়ে ছোট। উপর্যুপরি আমি তখন দুই সন্তানের মা।’’ দু’তরফ থেকে বাধার মুখে পড়তে হয়।’’ এইদিক থেকে সোনালি ছিলেন ভাগ্যবান। ‘‘ আমার সবচেয়ে বড় সাপোর্টার ছিলেন আমার স্বামী। তিনি আমায় সবসময় উৎসাহ দিয়েছেন। শ্বশুরবাড়ির সদস্যরাও আমার পাশে থেকেছেন। পরিবারকে পাশে না পেলে আমি হয়তো এতদূর আসতে পারতাম না।’’ সংসার, সন্তানের দায়িত্ব







উদ্দীপনা দেখে সোনালির ইনস্ট্রাকটর তাঁকে কিছু কোর্স করতে বলেন। জহুরির চোখ সোনালিকে চিনে নিতে ভুল করেননি। কিছুদিনের মধ্যেই সোনালি বেশ কিছু সার্টিফিকেট কোর্স পূরণ করে সেই জিমে সার্টিফায়েড ইনস্ট্রাকটর হিসেবে কাজ করতে শুরু করেন। এরপর ইনস্ট্রাকটরদের জন্য আয়োজিত এক বিশেষ কোর্সে প্রথম সোনালি ওয়েট ট্রেনিং শুরু করেন। ‘‘এই ট্রেনিং ছিল প্রচণ্ড কষ্টসাধ্য। অনুশীলনের পর সারা শরীরে প্রচণ্ড যন্ত্রণা হত। তার ফলও পেয়েছিলাম। মাত্র এক মাসের মধ্যে আমি নিজের মধ্যে এক আমূল পরিবর্তন দেখতে পাই।’’ সোনালির বয়স তখন প্রায় চল্লিশ ছুঁই-ছুঁই। এই বয়সে এসে অনেকেই নতুন কিছু করতে বিশেষ করে বডিবিল্ডিংয়ের কথা ভাবতেই পারেন না। কিন্তু সোনালি চেয়েছিলেন চেনা ছক ভাঙতে। ট্রেনিংয়ের



কিন্তু এই সমস্যাগুলি কোনও বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি সোনালির সাফল্যের পথে। এই প্রতিযোগিতায় বাকি সমস্ত প্রতিযোগীকে পিছনে ফেলে সোনালি সোনা জিতে নেন। ‘‘আমি ভাবতে পারিনি আমি জিতব। এই সাফল্য ছিল আমার কাছে এক বিরাট অনুপ্রেরণা।’’ ওই একই বছর ভারতের ‘মাসল ম্যানিয়া’ প্রতিযোগিতাতেও বিজেতা হন তিনি। এরপর আর তাঁকে ফিরে তাকাতে হয়নি। একের পর এক সাফল্য আসতে শুরু করে তাঁর ঝুলিতে। ২০১৫ সালে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে সেরা প্রথম দশ অ্যাথলিটের তকমা পান তিনি। ২০১৬ সালে এশিয়ান বডিবিল্ডিং চ্যাম্পিয়নশিপে ব্রোঞ্জ মেডেল জিতে নেন। ২০১৭ সালে একই প্রতোযগিতায় ষষ্ঠ স্থান অধিকার করেন তিনি। এই সাফল্যের পিছনে পরিশ্রমের পাশাপাশি ছিল ট্যাবু ভেঙে বেরিয়ে আসার সাহস। সোনালি জানালেন, ‘‘মহিলাদের বডিবিল্ডিং নিয়ে সমাজে নানারকম ট্যাবু রয়েছে। এই প্রতিযোগিতায় স্বল্পবাসে শরীর প্রদর্শন করতে হয়, তাছাড়া শরীরে পেশির বাহুল্যের ফলে তথাকথিত ‘মেয়েলি’ ভাব থাকে না। ফলে পরিবার এবং সমাজ

পাশাপাশি নিজের শরীরচর্চা, অনায়াসেই সামাল দেন সোনালি। ‘‘কাজের সূত্রে বাইরে যেতে হলে সংসারের কাজ স্বামী অনেকটাই সামলে নেন,’’— হেসে জানালেন তিনি। ভবিষ্যতের জন্য নানারকম পরিকল্পনা রয়েছে সোনালির। তিনি চান শরীরচর্চার ক্ষেত্রে আরও বেশি করে মহিলারা এগিয়ে আসুক। বর্তমানে তিনি দেশের নানা প্রান্তে সেমিনার এবং ওয়র্কশপের মাধ্যমে সুস্থ ও ফিট হয়ে ওঠার মন্ত্র শিখিয়ে চলেছেন। তাঁর কথায়, ‘‘নিজে সুস্থসবল না হলে সংসারের দায়িত্ব সামলাবেন কীভাবে?’’ সাময়িক ব্রেক নিলেও সোনালি আবার ফিরে আসতে চান স্টেজে। সেই প্রস্তুতিও চলছে পুরোদমে।



অশ্বিনী ওয়াসকার

তাঁর নির্মেদ, পেটানো, পেশিবহুল শরীরটি একবার চোখে পড়লে চোখ ফেরানো মুশকিল। তাঁকে দেখলে প্রথম দর্শনেই মনে কতকটা ঈর্ষা এবং অনেকটা সম্ভ্রম জাগে। কিন্তু মজার ব্যাপার, একটা সময় ‘বডিবিল্ডিং’ নামক শব্দটির থেকে শত ক্রোশ দূরে থাকতেন অশ্বিনী ওয়াসকর! অকপট স্বীকারক্তি তাঁর, ‘‘একটা







এই প্রতিবেদনটাই ছিল আমার প্রথম অনুপ্রেরণা। যেটা পড়ার পর আমার মনে হল উনি যদি পারেন তবে আমি কেন পারব না?'' করুণা সিদ্ধান্ত নিলেও এই পথে এগিয়ে যাওয়া ছিল বেশ কঠিন। সেই সময় একজন মহিলা বডিবিল্ডিং করবেন, এটা অনেকেই ভাবতে পারতেন না। অনেকেই তাঁকে বলেছিলেন বডিবিল্ডিং করলে তিনি পুরুষালি হয়ে যাবেন, গোফদাড়ি উঠবে। যদিও এই ধরনের নঞর্থক কথা করুণাকে তাঁর সিদ্ধান্ত থেকে টলাতে পারেনি। যদিও একজন কোচ পেতে করুণাকে প্রায় দু'বছর অপেক্ষা করতে হয়েছিল। এরপর প্রায় দু'বছরের কঠিন পরিশ্রমের পর তিনি দেহসৌষ্ঠবের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে শুরু করেন। সামাজিক প্রতিকূলতার মধ্যেও পরিবারকে তিনি পাশে পেয়েছিলেন। যদিও করুণার বাবা ছিলেন কড়া ধাতের মানুষ। তিনি মনে করতেন একমাত্র শিক্ষকতা মেয়েদের জন্য আদর্শ পেশা। তাই করুণা যখন বডিবিল্ডিং শুরু করেন তখন বাড়িতে তাঁর মা ছাড়া এই ব্যাপারে আর কেউই কিছু জানতেন না। ''প্রতিযোগিতায় সফল হলেও আমি বাড়িতে জানাতাম না। একদিন একজন রিপোর্টার আমার বাড়িতে আসেন আমার সাক্ষাৎকার নিতে। সেই প্রথম আমি বাবাকে আমার কম্পিটিশনের ছবি দেখাই। আমি ভেবেছিলাম বাবা বুঝি আমাকে চড় মারবেন, কিন্তু তিনি আমার সাফল্যে দারুণ খুশি হয়েছিলেন। আমার বর্তমান স্বামীও আমাকে সবসময় উৎসাহ দেন।'' তবে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে ছবিটা ছিল অন্যরকম। ''কম্পিটিশনে আমাকে গাইড করার মতো কেউ ছিল না। বিভিন্ন ফেডারেশন থেকে আমাকে সাহায্য করা তো দূরের কথা উলটে নানা ভাবে মিসগাইড করেছিল।''করুণার গলায় অভিমানের সুর স্পষ্ট। তবে করুণা তাঁদের কথায় বিভ্রান্ত না হয়ে নিজেই নিজেকে গাইড করতে শুরু করেন। ইন্টারনেটে পড়াশোনা করে, ভিডিও দেখে প্রস্তুতি নিতে শুরু করেন। ''বডিবিল্ডিংয়ের ক্ষেত্রে প্রস্তুতি ছাড়াও প্রয়োজন ফান্ড। এছাড়া একজন মহিলা স্বল্পবাসে স্টেজে উঠবেন এটা সমাজ সহজে মেনে নিতে চায় না। এইভাবে প্রস্তুতি থেকে শুরু করে প্রতিটা পদক্ষেপে আমায় লড়াই করতে হয়েছিল।'' তাঁর লড়াই বৃথা হয়নি। তাঁর প্রথম বড় সাফল্য আসে ২০১২ সালে। তিনি জিতে নেন 'মিস ইন্ডিয়া ফিটনেস ফিজ়িক'—এর খেতাব। ওই একই বছর 'ওয়র্ল্ড বডিবিল্ডিং ফিটনেস অ্যান্ড ফিজ়িক চ্যাম্পিয়নশিপ'-এ তিনি চতুর্থ স্থান অধিকার করেন। এরপর ২০১৫, ২০১৬ এবং ২০১৮ তেও 'মিস ইন্ডিয়া ফিটনেস ফিজ়িক'-এর পদক জেতেন তিনি। ২০১৬ সালে হংকং-এ অনুষ্ঠিত অলিম্পিক অ্যামেচার ইন্টারন্যাশনাল চ্যাম্পিয়নশিপে তিনি ষষ্ঠ স্থান অধিকার করেন। তিনিই ছিলেন প্রথম ভারতীয় মহিলা যিনি এই প্রতিযোগিতায় পদক জিতেছিলেন। ''দেশের জন্য পদক জেতার অনুভূতি সত্যিই অনবদ্য। এই অভিজ্ঞতার কোনও তুলনা হয় না।'' তৃপ্ত গলায় জানালেন করুণা। আগামী দিনে আবার দেশের জন্য পদক আনার প্রস্তুতিতে মগ্ন তিনি।

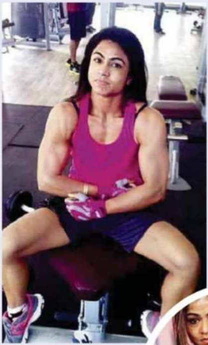




কিরণ ডেমল্লা

কিরণ ডেমল্লা ভারতের সর্বপ্রথম সিক্সপ্যাক লেডি। সামনাসামনি কথা না হলেও ছবিতে তাঁর ঝকঝকে, হাসিখুশি, প্রাণবন্ত মূর্তিটি দেখে মনে হয়েছিল এই নামকরণ তাঁর ক্ষেত্রে একেবারেই সার্থক। বয়স চল্লিশ পেরোলেও শরীরে, মনেপ্রাণে তিনি আজও তরতাজা। তাঁর ছিপছিপে, মেদহীন, পেশিবহুল শরীরটি







আজও যে কোনও বলিউড সেলেবকে ছাপিয়ে যাবে। সেলেবের কথা যে অচিরেই উঠে আসবে তা জানাই ছিল, কারণ কিরণ ডেমব্লা শুধু স্টার অ্যাথলিট নন, একজন জনপ্রিয় সেলেব ফিটনেস ট্রেনারও বটে! একসময় ওয়র্ল্ড বডিবিল্ডিং চ্যাম্পিয়নশিপে ভারতের প্রতিনিধি হওয়া থেকে আজ টিনসেল টাউনের তাবড় তাবড় সেলেবদের সঙ্গে কাজ করা, এক জীবনেই সঞ্চয় করা বিভিন্ন বিচিত্র অভিজ্ঞতার পুঁজি থেকে স্মৃতিচারণার পালায় নামলেন তিনি। বর্তমানে তাঁর বৃহস্পতি তুঙ্গে থাকলেও এই সাফল্যের মুখ দেখতে তাঁকে কম কাঠখড় পোড়াতে হয়নি। আর পাঁচটা সাধারণ গৃহবধূর মতোই এক সময় সংসারের ফাইফরমাশ সামলানোই ছিল তাঁর রোজনামচা। কিরণ জানালেন, ''স্বামীর (অজিত ডেমব্লা) সঙ্গে হায়দরাবাদে চলে আসি ২০০৬ সালে। সেখানে আমার দুই সন্তানের জন্মও হয়। কয়েক বছর চুটিয়ে সংসার করবার পর বুঝতে পারি সংসারের দায়বদ্ধতা সামলাতে গিয়ে কোথাও যেন নিজের শিল্পীসত্তাকে উপেক্ষা করেছিলাম। ছোট থেকে গানবাজনায় রীতিমতো তালিম নিয়েছিলাম। আগ্রা ঘরানার শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে পারদর্শী ছিলাম। কিন্তু বিয়ের পর গানবাজনার পাঠ চুকে গেল।'' উদাস কণ্ঠে স্বীকারক্তি তাঁর। বডিবিল্ডিং এ তাঁর হাতে খড়ির গল্পটি চমকপ্রদ। ''ভেবেচিন্তে, পরিকল্পনা করে যে এই পেশায় এসেছিলাম, তা কিন্তু নয়। তখন আমার বয়স তেত্রিশ। একদিন আচমকা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চমকে উঠি। ৭৫ কিলো ওজনের, বেঢপ চেহারার এই মহিলার মধ্যে যেন কিরণকে খুঁজেই পাচ্ছিলাম না! প্রথমেই সিদ্ধান্ত নিলাম যেমন করেই হোক মেদমুক্ত হব। সময় নষ্ট না করে একটি জিম ভর্তি হয়ে গিয়ে সাতমাসের মধ্যে ২৪ কেজি ওজন ঝরিয়ে ফেলেছিলাম।'' তার কয়েকদিন বাদেই জীবনের আরও একটি মাইলস্টোন পার করেন তিনি। ইন্ডিয়ান ফেডারেশন অফ বডিবিল্ডিং থেকে তাঁর তলব আসে। সেখান থেকেই ওয়র্ল্ড বডিবিল্ডিং চ্যাম্পিয়নশিপে অংশগ্রহণ করবার সুযোগ পান। উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে ওঠেন কিরণ, ''এই সুযোগ পেয়ে সত্যিই মনে হয়েছিল যেন হাতে চাঁদ পেয়েছি! নিজের প্রতি আত্মবিশ্বাস বেড়ে গেছিল। তারপর থেকে আর পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি।'' তবে পথ যে সবসময় মসৃণ ছিল তাও নয়। একান্ত আপনজনের কাছ থেকেই এসেছিল বাধাবিপত্তি। ''আমার পরিবারের অনেক সদস্যই আমার এই সিদ্ধান্তে বেঁকে বসেছিলেন। তার একটা কারণ এই চ্যাম্পিয়নশিপে অনেক খোলামেলা পোশাকে ফোটোশুট করার ব্যাপার ছিল। আমি ধীরেসুস্থে তাঁদেরকে রাজি করাই। দেহসৌষ্ঠব প্রতিযোগিতায় একজন মেয়ে হিসেবে যে অন্যের চেয়ে বেশি বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে আমায় এগোতে হবে, তা অনেক আগে থেকেই জানতাম।'' এরপরে তাঁর জীবনে আসে আর এক অধ্যায়। তাঁর মুকুটে যোগ হয় আরও একটি পালক। মাত্র ৩৭ বছর বয়সেই তিনি ভারতের সর্বপ্রথম 'ফিমেল সিক্সপ্যাক অ্যাব'—এর অধিকারী হন। ''জানেন, দীর্ঘদিন ধরেই সিক্সপ্যাক বানাবার সাধ ছিল। একটু চেষ্টা করলে সহজেই মেদ ঝড়ানো যায়, কিন্তু পেশিবহুল চেহারা বানাতে গেলে, বডিবিল্ডিং-এর কাছে জীবনকে উৎসর্গ করতে হয়। 'সিক্স প্যাক অ্যাব' বানাতে ৭-৮ মাস সময় লেগেছিল। এই ক'মাসে নিজের শরীরকে ভেঙেছি, গড়েছি। কিন্তু কোনওরকম শর্টকাট (স্টেরয়েড) ছাড়াই স্রেফ শরীরচর্চার জোরে এই শখ পূরণ করলাম।'' শুধুমাত্র স্টার অ্যাথলিটই নন, স্টার ট্রেনার হিসেবেও তাঁর নাম রয়েছে। তাপসী পন্নু, তমন্না এবং রাজামৌলির মতো বহু সেলেবদের পার্সোনাল ট্রেনারও তিনি। শরীরচর্চা ছাড়াও, জনপ্রিয় ডিস্কো জকি হিসেবেও নামডাক রয়েছে কিরণের। ''ডিজেকেডিবেলে' নামে আমি হায়দরাবাদে বেশ বিখ্যাত। ২০১৭ সালে 'টিসিইআই'-এর তরফ থেকে শ্রেষ্ঠ 'ডেবিউ ডিজে' হিসেবে পুরস্কৃতও হই।' শরীরচর্চা হোক বা সঙ্গীত, কিরণ ডেমব্লা নানাভাবে যে নিজেকে আবিষ্কার করেছেন এবং শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছেন তা বলাই বাহুল্য।





আরাম-আয়েসের আয়োজন

তিন তলা সুবিশাল বাড়ি জুড়ে সুরুচির স্বচ্ছন্দ আয়োজন। নান্দনিক ব্যবস্থাপনায় চোখের আরাম। মার্জিত রুচির প্রতিফলন ঘরের কোণায় কোণায়। ব্যক্তিগত মুহূর্তের কোলাজে রঙিন এই অন্দরমহল। অনিন্দিতা ও অম্বরীশ দাশগুপ্তর বাড়ির অন্দরসাজ। ঘুরে এলেন ঋতুপর্ণা রায়।

ধবধবে সাদা বাড়ি। আধুনিক কাঠামো। দূর থেকে দেখলেই চেনা যায়। গাছ-গাছালিতে ঘেরা শহুরে বাড়ি খুব একটা দেখা যায় না বলেই হয়তো। প্রবেশপথ থেকেই এই বাড়ির গল্প শুরু। চারদিকে সাদা পাঁচিলে নরম হলুদ আলোর উষ্ণ অভ্যর্থনা। কালো গেট পেরিয়ে একফালি ড্রাইভওয়ে। আগে এখানে একটা দু'তলা বাড়ি ছিল। রীতিমতো জীর্ণ-দীর্ণ অবস্থায় দিন গুজরান করত। অনিন্দিতা আর অম্বরীশের হাতে আসতেই একেবারে ভোল বদলে হাজির হয়েছে নতুনরূপে। আগে বাইপাস সংলগ্ন একটি কমপ্লেক্সে বাংলো ধাঁচের বাড়িতে থাকতেন ওঁরা। এই বাসস্থান হালের। একেবারে গোড়া থেকেই তৈরি করেছেন সাধের এই আস্তানা। পুরনো বাড়ি ভেঙে নতুন বেশ অন্যরকম স্ট্রাকচার গড়ে তুলেছেন



দাশগুপ্ত দম্পতি। দু'জনেই ব্যস্ত মানুষ। কাজের অন্ত নেই। কিন্তু তার মাঝেও বাড়ি সাজাতে যে ভালবাসেন, তা অন্দরমহলে ঢুকলেই বোঝা যায়। আর তাই তো সারাদিনের ক্লান্তির পর বাড়ি ফিরলেই মন ভাল হয়ে যায়। আরামের আশ্বাস পাওয়া যায়। তাই তো এই বাড়ি বড়ই সুন্দর। সাজানোগোছানো ঠিকই,





গ্রাউন্ড ফ্লোরের অন্যতম ফর্মাল ড্রয়িং এরিয়া। সোফা ছাড়া প্রতিটা আসবাবই কাস্টমাইজ় করে বানানো হয়েছে। অফ হোয়াইট গা ডোবানো সোফায় নীল আর ছাই রঙের কুশনের জ্যামিতিক বিন্যাস। দেওয়ালে ফ্রেমবন্দি করা পেন্টিং। হালকা হলুদ আলোয় মায়াবি পরিবেশ। কাঠের চৌকো সেন্টার টেবলে একগুচ্ছ লাল গোলাপ যেন সাদর অভ্যর্থনা জানায়। ড্রয়িং রুমের সঙ্গেই লাগোয়া ডাইনিং রুম। সুরুচির ছাপ সেখানেও।



কিন্তু হোটেলের মতো নয়। হাঁটতে অস্বস্তি হয় না। মনে হয় না কিছুতে হাত দিলেই তা ভেঙে যাবে। বেশ একটা লিভড-ইন মেজাজ আছে। আর সত্যিই তো বাড়ি এমনই হওয়া উচিত। অন্দরমহল তো আর শুধুই আসবাব-ডেকরের সমষ্টি বা ইট-বালি, কাঠ, সিমেন্টের শুষ্ক কাঠামো নয়। যে অন্দরমহল তার বাসিন্দাদের অন্তরমহলের প্রতিরূপ, যে অন্দরমহল সহজ, স্বাভাবিক, সেটাই তো সুন্দর। নিখুঁত হতে হবে না, প্রাণের স্পর্শ থাকলেই হল। এই বাড়ি ঠিক তেমনই। আর তার কৃতিত্ব অবশ্যই সদস্যদের প্রাপ্য। নিজেরা যেমন আন্তরিক, খোলা মনের মানুষ বাড়ির মধ্যেও সেই উদারতার আভাস পাওয়া যায়। স্বামী-স্ত্রী যে খুব যত্ন, খুব আদরে গড়ে তুলেছেন তাঁদের এই বাড়ি। আমার সবসময়ই মনে হয় বাড়ি সাজানোটা আসলে একটা আর্ট। পরিসর বড় হলে ভাল, না হলেও কোনও অসুবিধে নেই। অন্দরসাজের সবটাই কিন্তু নির্ভর করে আপনার রুচি এবং ইচ্ছের উপর। একটা সাদা ক্যানভাস যেমন রঙের আঁচড়ে জীবন্ত হয়ে ওঠে, বাড়িও কিন্তু তার সাজপোশাকের গুণে হয়ে উঠতে পারে অনন্য। আর এমনটাই মনে করেন এই দম্পতি। আয়তনে ৫০০০ স্কোয়্যার ফিট হলেও অতিরিক্ত জিনিসপত্র দিয়ে বোঝাই করা হয়নি। প্রায়োগিক ভাবনার পরিচয় যেমন পাওয়া যায়, তেমনই সুরুচিসম্মত। অন্দরসাজের মূলমন্ত্রই কিন্তু তাই, ফাংশনালিটি আর সৌন্দর্যের যথাযথ ব্যালেন্স, যোগ্য মেলবন্ধন।

আর্কিটেক্ট দুলাল মুখোপাধ্যায় মূলত এই বাড়ির নকশা তৈরি করেছেন। তবে বাইরের ও অন্দরের ব্লু-প্রিন্টের কারিগর উনি হলেও বাড়ির প্রাণপ্রতিষ্ঠা কিন্তু হয়েছে বাসিন্দাদের হাত ধরেই। তাদের ভাললাগা, পছন্দ-অপছন্দ সবই ব্যক্ত হয়েছে অন্দরমহলের ভাষায়। স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই ওল্ড ওয়র্ল্ড চার্মের ভক্ত। পুরনো মানেই ফেলনা, এমন ধারণায় মোটেই বিশ্বাস করেন না। তাই তো বহু ভিক্টোরিয়ান আসবাবে সেজে উঠেছে অন্দরমহল। ঐতিহ্য আর আধুনিকতার যে কোনও বিরোধ নেই, প্রাচীনের সঙ্গে নতুন যে এক জায়গায় সহাবস্থান করতে পারে, তা এই অন্দরমহল দেখলেই বোঝা যায়। এখানে বাড়ি সাজানোর মুনশিয়ানা। সৃজনশীল দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায় অনায়াসেই। বাগানেরও ভারী শখ অনিন্দিতার। সেই ছোটবেলা থেকেই। তাই তো বাড়ির আনাচেকানাচে, বারান্দায়, ছাদে সর্বত্রই এঁদের নিত্যদিনের সঙ্গী আদরযত্নে বেড়ে ওঠা নানা প্রাকৃতিক গাছ। এই আদরযত্নের ছাপ পুরো বাড়িতেই। ভাল থাকার আশ্বাস জোগায় যে এই অন্দরমহল।



দোতলায় আর একটি বসার ব্যবস্থা করে রেখেছেন দাশগুপ্ত দম্পতি। এটাকে অবশ্য ইনফর্মাল সিটিং এরিয়া বলাই যায়। মূলত অতিথিদের আরামের কথা ভেবেই এই আয়োজন। জলপাই রঙের গদি আঁটা কাঠের সোফা একই রঙের কুশনের বিস্তৃতি। আপহোলস্ট্রির কালারস্কিমে সামঞ্জস্য চোখে পড়ে।



এক তলায় একমাত্র মেয়ের বেডরুম। তার পছন্দ হালকা রং। তার ইচ্ছে অনুযায়ী সাজানো হয়েছে ঘর। এখানে সব আসবাবই কাঠের। খাটের হেডবোর্ড বেশ অভিনব। দেওয়ালের সঙ্গে রং মিলিয়ে বেডস্প্রেড, আপহোলস্ট্রির রং। একদিকে পুরনো দিনের কাউচের মতো পুরু গদিআঁটা বসার ব্যবস্থা।



বাড়িতে ঢুকেই প্রধান ফর্মাল সিটিং এরিয়া। খুব বেশি আসবাব নেই। ঠিক যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই রাখা হয়েছে। দু'দিকে লেদারের লম্বাটে সোফা। আর একদিকে সিঙ্গল সিটার কাউচ। মাঝখানে গ্লাস টপড সেন্টার টেবল। বেশ কিছু পেন্টিং, ছবি আছে এই ঘরে। ঝারবাতির নরম আলোয় মন নিমেষে ভাল হয়ে যায়।

গ্রাউন্ড ফ্লোরের ফর্মাল ড্রয়িং এরিয়ার সঙ্গে লাগোয়া ডাইনিং রুম। লম্বাটে টেবল ঘিরে আটজনের বসার ব্যবস্থা। আগেকার দিনের বাড়িতে ঠিক যেমন চেয়ার দেখা যেত, অনেকটা সেই ধাঁচেই বানানো হয়েছে এই এগুলি। ঘরের রং হালকা। চোখের আরাম হয় বই কী!





ডাইনিং এরিয়ার একদিকে লম্বাটে ক্রকারি ইউনিট। কাঠের তৈরি আলমারির আদলটা অনেকটা পুরনো দিনের জাল আলমারির মতো। পাশেই ত্রিকোণ ফুলদানিতে সাজানো রয়েছে ফুল।



এক তলার স্টাডি রুম। নিজেদের দরকারি কাজ, পড়াশোনা এখানেই সারেন দু'জনে। বই পড়তে যে ভালবাসেন, তা এই ঘরে ঢুকলেই বোঝা যায়।



এক তলার মাস্টার বেডরুমে মার্বলের মেঝে। এই ঘরের আসবাব বিশেষভাবে ডিজ়াইন করা হয়েছে। ফোর পোস্টার বেডের অনুকরণে খাটটা বানিয়েছেন অনিন্দিতা। হেডবোর্ডের ডিজ়াইনও ভারী সুন্দর। টিউবলাইটের সাদা আলো একেবারেই না পসন্দ। নরম হলুদ আলোয় ঘরের উষ্ণ পরিবেশ।





দোতলায় বাবা-মায়ের ঘর। ছিমছাম পরিপাটি করে সাজানো ঠিক যেমনটা তাঁদের পছন্দ। এখানেও কালার স্কিম একেবারেই হালকা। কাঠের আসবাবেই সাজানো ঘর। একদিকে খাট ও সাইড টেবল। অন্যদিকে ড্রেসার, টিভি ইউনিট ও বসার ছোট্ট আরামদায়ক ব্যবস্থা।

বাড়ির প্রতিটা কোণা যে সুন্দরভাবে সাজানো যায় তা জানেন দাশগুপ্তরা। ডাইনিং রুমে যাওয়ার একফালি প্যাসেজও কী সুন্দরভাবেই সাজিয়েছেন। মার্বলটপ পুরনো দিনের টেবলের উপর সুন্দর ডেকর আইটেম। দেওয়ালে শোভা পেয়েছে দুটি সুন্দর হাতে আঁকা ছবি।

ছবি: অমিত ঘোষ দস্তিদার

দই চাই গো...

চাই তো! চিজ়কেকেও চাই, মুজ়েও চাই আবার ব্রাউনিতেও চাই। কারণ সে তো এতটাই ভার্সেটাইল যে সব রূপেই দারুণ সাবলীল। চকোলেটের সঙ্গেও ভাব করতে পারে আবার স্ট্রবেরির সঙ্গেও বেজায় বন্ধুত্ব। শেষপাতের এই প্রিয় খাবারটি এবার হাজির একেবারে নতুন কলেবরে। কেতাবি বিদেশি ডেসার্টের সঙ্গে দইয়ের মিতালি পাতালেন দেবারতি রায়। সংকলনে ঋতুপর্ণা রায়।



প্যান কটা

পোলাও, মাছের কালিয়া, মাংসের কোর্মা, সবই হল, কিন্তু শেষপাতে ইনি না থাকলে পুরো ভোজনপর্বই যেন মাটি। আগেকারদিনে বিয়েবাড়িতে সবাই অপেক্ষা করে থাকত, কখন ইয়া পেল্লাই লাল হাঁড়ি করে আসবে সেই মহার্ঘ্য বস্তুটি। বাড়িতেও উৎসব, শুভ অনুষ্ঠানেও এর থাকা চাই-ই-চাই। দেখতে কিন্তু নেহাতই সাধারণ। একেবারে নিপাট ভালমানুষ যেন। কিন্তু মুখে দিলেই মন একেবারে আহ্লাদিত। ঠিকই বুঝেছেন, দই-এর কথা বলছি। ভোজনরসিক বাঙালির কাছে দইয়ের আবেদন চিরন্তন। আর শুধুই কী স্বাদ, তার গুণও নেহাত কম নয়। এই যেমন ধরুন টক দই। ক্যালশিয়ামে ঠাসা এই দই আবার শরীর ঠান্ডা রাখতেও ওস্তাদ। মনে পড়ে প্রখর গরমে যখন স্কুল থেকে বাড়ি ফিরতাম, ঠাকুরমা সবার আগে এগিয়ে দিতেন এক গ্লাস ঠান্ডা দইয়ের ঘোল। একটু মিষ্টি, একটু নোনতা। গলায় ঢালতেই প্রাণটা একেবারে জুড়িয়ে যেত যেন। কখনও আবার খাবার পর হাজির হয়ে যেত রায়তা। কখনও শসার, কখনও পেঁয়াজ তো কখনও আবার বোঁদের। তবে মূল উপকরণ এখানেও সেই দই। অনেকেরই আবার টক দইতে হালকা চিনি দিয়ে খেতে দারুণ লাগে। কিটকিটে মিষ্টি নয়, আবার টকভাবটাও কেটে যায়। ঠাকুরমা আমাদের জন্যেই নিয়ম করে বাড়িতে দই পাততেন। ছোটদের শরীরের উপরে কড়া নজরদারি ছিল। এখন সেই পাট উঠে গেলেও, দইয়ের প্রতি প্রীতি কিন্তু আমাদের একই ভাবে রয়ে গেছে। আর শুধু কি খাওয়ার জন্য? দই দিয়ে যে কতশত রান্না হয়, তার ইয়ত্তা নেই। আমিষ থেকে নিরামিষ, আলুরদম থেকে কষা মাংস সব রান্নাতেই তার জোরদার উপস্থিতি। এর সামান্য প্রলেপেই যে কোনও খাবারের স্বাদ বদলে যেতে পারে। আর এটাই কিন্তু দইয়ের ইউএসপি।

এতটাই যে বহুমুখী, তার ইতিহাসটাও যে মনে রাখার মতো হবে, তা তো স্বাভাবিক। কিন্তু জানেন কি, দই কিন্তু আসলে দুর্ঘটনাবশত তৈরি হয়েছিল, প্ল্যানমাফিক নয়। অনেক গবেষকরাই মনে করেন প্রায় ১০ হাজার খ্রিষ্ট পূর্বাব্দে নব্য প্র রযুগে ছাগল ও ভেড়ার দুধ সংরক্ষণ শুরু করা হয়। হঠাৎই দুধে ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণের ফলে তরল দুধে জমাট বাঁধে। আর এর ে কে তৈরি হয় পৃথিবীর ইতিহাসের প্রথম দই। তবে তখনই কিন্তু দই আজকের এই বিশ্বব্যাপী পরিচিতি পাইনি। শো া যায় একাদশ শতকে তুর্কি ভাষার একটি বইয়ে প্রথম দইয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। তুরস্কের হাত ধরেই দই প্রথমে ইউরোপ ও পরে ভারতীয় উপমহাদেশে এসে পৌঁছয়। আর তারপর তো বাকিটা সত্যি ইতিহাস। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অবশ্য তারও পরে দইয়ের আবির্ভাব।

এ তো গেল শুষ্ক তত্ত্বকথা। তবে এতক্ষণে নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন দইয়ের ব্যাপ্তি কতটা। তাই তো জিভের তোয়াজে এর সব সময় সাদর আমন্ত্রণ। তবে এবারে আর বাঙালি ঘরোয়া রান্না নয়। সে তো আপনারা ভালই জানেন। নিত্যদিন করেনও। তবে বাঙালি খাবারদাবার নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করবে না, তা কি কখনও হতে পারে? আমরা হলাম গিয়ে বেজায় খাদ্যরসিক। ভোজনবিলাসী বলা যেতে পারে আমাদের মধ্যনাম। ইতালিয়ান, মোগলাই, চাইনিজ়, কন্টিনেন্টাল সব রকমের খাবারেই আমাদের জিভ ভালই অভ্যস্ত হয়ে গেছে। আর আমাদের মিষ্টিপ্রীতি নিয়ে নতুন কিছু বলার নেই। তা নিয়ে লিখতে বসলে পাতার পর পাতা শেষ হয়ে যাবে। যেমন অনেকেই আছেন যাঁদের আবার ডিনারের পর মিষ্টি না খেলেই নয়। কেউ কেউ আবার ব্রেকফাস্ট যাই খান না কেন, মিষ্টি ছাড়া মোটে চলে না। আর তাই তো আমরা হাজির হয়েছি

তাতলিসি আসলে তুরস্কের এক জনপ্রিয় ডেসার্ট। তুরস্কে খাওয়াদাওয়ায় দই বহুলভাবে ব্যবহৃত। হায়দারি, ইওগার্ট স্যুপও মানুষদের খুব প্রিয়। তুরস্কের হাত ধরেই দই ইউরোপ ও ভারতীয় উপমহাদেশে এসে পৌঁছেছিল।


তাতলিসি

দই দিয়ে তৈরি লোভনীয় সব ডেসার্ট নিয়ে। চিজ়কেক, মুজ়, টার্ট নিশ্চয় আগেও খেয়েছেন, কিন্তু এবারে পরতে পরতে থাকবে দইয়ের চমক। ব্রাউনিতে চকো চিপস থাকলেও মুখ্য চরিত্র কিন্তু এই দই-ই। বুঝতেই পারছি আর লোভ সংবরণ করতে পারছেন না। তা হলে আর দেরি কেন, শিখে নিন রেসিপিগুলো। এই গরমে প্রাণ জুড়োতে আর কী চাই!



পপসিকল



চিজ়কেক

ম্যাঙ্গো ইয়োগার্ট প্যানাকোটা

উপকরণ: জিলেটিন ৩ চা-চামচ, দইয়ের ঘোল ৩/৪ কাপ, ক্রিম ১ কাপ, চিনিগুঁড়ো ১/৪ কাপ, ম্যাঙ্গো ক্রাশ ৩ টেবলচামচ।

প্রণালী: অর্ধেক পরিমাণ চিনিগুঁড়োর সঙ্গে জিলেটিন আর অর্ধেক পরিমাণ দই মিশিয়ে নিন। সসপ্যানে ক্রিম, জিলেটিন মিশিয়ে ফুটতে দিন। আঁচ কমিয়ে ২-৩ মিনিট নাড়াচাড়া করে নিন। আঁচ বন্ধ করে দইয়ের মিশ্রণ দিয়ে নাড়তে থাকুন। একটা বাটি বা গ্লাসে খুব তাড়াতাড়ি ঢেলে ফ্রিজে ৩ ঘণ্টা রেখে সেট হতে দিন। প্যানাকোটা বাটিতে ঢেলে ম্যাঙ্গো ক্রাশের সঙ্গে সার্ভ করুন।

ইয়োগার্ট তাতলিসি

উপকরণ: ময়দা ১০০ গ্রাম, চিনি ১০০ গ্রাম, ডিম ৩টে, বেকিং পাউডার আধ চা-চামচ, দই ৫০০ গ্রাম, অরেঞ্জ জুস।

সিরাপের জন্য: চিনি, কমলালেবুর রস, জল (সব পরিমাণমতো)।

প্রণালী: চিনি, জল আর কমলালেবুর রস একসঙ্গে মিশিয়ে সিরাপ বানিয়ে নিন। চিনি আর ডিম একসঙ্গে ভাল করে ফেটিয়ে নিন। এতে ময়দা, বেকিং পাউডার মিশিয়ে নিন। ভাল করে নাড়ুন। দই আর কমলালেবুর রস মিশিয়ে নিন। বেকিং পাত্রে তেল ব্রাশ করে মিশ্রণটা ঢেলে দিন। ১৮০° সেন্টিগ্রেডে ২০ মিনিট বেক করুন। উপর থেকে অরেঞ্জ সিরাপ ছড়িয়ে দিন।

রোজ় সিরাপ উইথ ইয়োগার্ট পপসিকল

উপকরণ: জল ঝরানো টক দই ১ কাপ, দুধ ১ কাপ, চিনি ২ টেবলচামচ, রোজ় সিরাপ ২ টেবলচামচ, গোলাপের পাপড়ি কয়েকটা।

প্রণালী: প্রথমে দুধ, দই, চিনি একসঙ্গে মিক্সিতে ব্লেন্ড করে নিন। তাতে অল্প অল্প করে রোজ় সিরাপ মিশিয়ে নিন। এবার পুরো মিশ্রণটা পপসিকল মোল্ডে ভরে দিন। পপসিকল মোল্ড না থাকলে যে কোনও পাত্রে মিশ্রণ ঢেলে দিয়ে ফয়েল দিয়ে মুড়ে কাঠি গুঁজে দিন। আট ঘণ্টা ফ্রিজে জমতে দিন। বার করে ঠান্ডা ঠান্ডা পরিবেশন করুন ইয়োগার্ট পপসিকল। বাচ্চাদের খুব ভাল লাগবে।

দইয়ের চিজ়কেক

উপকরণ: ডাইজেস্টিভ বিস্কুট ১০-১২টা, মাখন ১ টেবলচামচ, চকোলেট ২০ গ্রাম, জল ঝরানো টক দই ১ কাপ, চিনিগুঁড়ো ৪



দই নলেন গুড়ের মুজ়

টেবলচামচ, জিলেটিন দেড় চা-চামচ, (৪ টেবলচামচ জলে ভেজানো), ফেটানো ক্রিম ৪ টেবলচামচ।
প্রণালী: প্রথমে জিলেটিন ১০ মিনিট জলে ভিজিয়ে রাখুন। একটা ছোট আভেনপ্রুফ পাত্রে চকোলেট ও মাখন ২০-৩০ সেকেন্ড মাইক্রোআভেনে দিয়ে গলিয়ে নিন। বিস্কুট ব্লেন্ডারে গুঁড়ো করে নিন। এতে চকোলেটের মিশ্রণ মিশিয়ে নিন। একটা পাঁচ ইঞ্চির গোল টিনে বাটার পেপার রেখে বিস্কুটের মিশ্রণ আঙুল দিয়ে সেট করে নিন। জল ঝরানো টক দই ও চিনিগুঁড়ো মিশিয়ে নিন। ক্রিম ভাল করে ফেটিয়ে নিন। জিলেটিনের মিশ্রণ ১০ সেকেন্ড হাই পাওয়ারে মাইক্রো করে গলিয়ে নিন। এটা দইয়ের মিশ্রণে ভাল করে মিশিয়ে নিন। ক্রিম মিশিয়ে পুরো মিশ্রণ বিস্কুটের উপর ছড়িয়ে দিন। ফ্রিজে এক ঘণ্টা বা তার বেশি সময় রেখে দিন। সেট হয়ে গেলে বের করে ঠান্ডা ঠান্ডা সার্ভ করুন।

দই নলেন গুড়ের মুজ়

উপকরণ: জল ঝরানো দই ২ কাপ, ক্রিম ২ টেবলচামচ, ডিমের সাদা অংশ ২টো, চিনি ৩ টেবলচামচ, নলেন গুড় ৪ টেবলচামচ।
প্রণালী: জল ঝরানো টক দই ভাল করে ফেটিয়ে নিন। ডিমের সাদা অংশ ও চিনি ভাল করে ফেটিয়ে নিন। ফোমের মতো হবে। ক্রিম ফেটিয়ে দইয়ের সঙ্গে মিশিয়ে নিন। সবশেষে নলেন গুড় ঢেলে মিশিয়ে নিন। সার্ভিং গ্লাসে পুরো মিশ্রণটা স্তরে স্তরে সাজিয়ে ফ্রিজে রেখে ঠান্ডা করে নিন। ফ্রিজ থেকে বের করে সিগার ওয়েফার আর আখরোট দিয়ে সাজিয়ে ঠান্ডা ঠান্ডা পরিবেশন করুন।

এখন দই শুধু আর একটাই স্বাদে সীমাবদ্ধ নেই। ফ্লেভারড ইওগার্টের রমরমা। আম, স্ট্রবেরি, আনারস সব স্বাদেই পাওয়া যায়। বাড়িতেও ফ্লেভারড দই বানাতে পারেন। বাড়িতে দই পাতার সময় ফলের নির্যাসটা মিশিয়ে নিলেই হল।

বেকড ইয়োগার্ট টার্ট

উপকরণ: টার্টের জন্য: ময়দা ১০০ গ্রাম, মাখন ৫০ গ্রাম, বরফঠান্ডা জল পরিমাণমতো
বেকড দইয়ের জন্য: দই ২০০ গ্রাম, ফ্রেশ ক্রিম ১০০ গ্রাম, কনডেন্সড মিল্ক ২০০ গ্রাম, এলাচগুঁড়ো ১/৪ চা-চামচ, শুগার ফ্রি পাউডার ২০ গ্রাম।
প্রণালী: ক্রিম আর কনডেন্সড মিল্ক ভালভাবে মিশিয়ে নিন। টক দই আর এলাচ মিশিয়ে তাতে আর্টিফিশিয়াল সুইটনার দিন। পুরো মিশ্রণটা ভাল করে ফেটিয়ে নিন। টার্ট বেসের জন্য ময়দা ও মাখন ভালভাবে মিশিয়ে নিন। তাতে অল্প অল্প করে বরফঠান্ডা জল দিয়ে শক্ত করে মেখে নিন। এবার গোল করে বেলে নিন। টার্টের মোল্ডে ভরে কাঁটা দিয়ে ছোট ছোট ফুটো

করে নিন। ২০০ ° সেন্টিগ্রেডে ১২-১৫ মিনিট বেক করে নিন। ঠান্ডা হলে কেস থেকে বার করে নিন। আবার ভরে দই-এর মিশ্রণ উপর দিয়ে ছড়িয়ে দিন। আরও ১০ মিনিট বেক করে নিন। ফ্রিজে রেখে দিন। ঠান্ডা হলে বের করে সার্ভ করুন।

ফাজি ইয়োগার্ট ব্রাউনি

উপকরণ: মাখন ৫০ গ্রাম, ব্রাউন শুগার ৫০ গ্রাম (আধ কাপ), ময়দা ৭৫ গ্রাম, কোকো পাউডার ২ টেবলচামচ, দইয়ের ঘোল দেড় কাপ, চকোলেট চিপস বা ডার্ক চকোলেট ১০০ গ্রাম, বেকিং সোডা আধ চা-চামচ, ক্রিম ২ টেবলচামচ, বাদামকুচি আধ কাপ।

প্রণালী: ময়দা, কোকো পাউডার, বেকিং সোডা মিশিয়ে নিন। ক্রিম ও চকোলেট ৩০ সেকেন্ড মাইক্রো করে গলিয়ে নিন। একটা পাত্রে মাখন ও চিনি ভালভাবে ফেটিয়ে নিন। এতে গলানো চকোলেট আস্তে আস্তে মিশিয়ে দিন। এবার দইয়ের ঘোল মিশিয়ে নিন। ময়দার মিশ্রণ দিন। পুরোটা ভাল করে মিশিয়ে নিন। ওপরে চকোলেট চিপস ও বাদামকুচি ছড়িয়ে দিন। একটা চৌকো পাত্রে মাখন গ্রিজ় করে পুরো মিশ্রণটা ঢেলে দিন। ১৮০° সেন্টিগ্রেডে ২০ মিনিট বেক করুন।

দই স্ট্রবেরি রিং কেক

উপকরণ: ময়দা: ১ কাপ, বেকিং পাউডার ১ চা-চামচ, স্ট্রবেরিকুচি ১ কাপ, চিনিগুঁড়ো আধ কাপ, ডিম ১টা, দই আধ কাপ, ভ্যানিলা এসেন্স ১ চা-চামচ।

প্রণালী: ময়দা, বেকিং পাউডার মিশিয়ে নিন। স্ট্রবেরি কুচিয়ে ময়দার সঙ্গে মেখে নিন। ১টা পাত্রে চিনিগুঁড়ো ও ডিম ভাল করে ফেটিয়ে নিন। এতে দই, দুধ, ভ্যানিলা মিশিয়ে আবার ফেটিয়ে নিন। এতে স্ট্রবেরিকুচি দিন। ময়দার মিশ্রণ দিয়ে ভাল করে কাট অ্যান্ড ফোল্ড করুন। রিং মোল্ডে ঢেলে ১৮০° তাপমাত্রায় প্রি-হিটেড আভেনে ২৫-৩০ মিনিট বেক করে নিন।

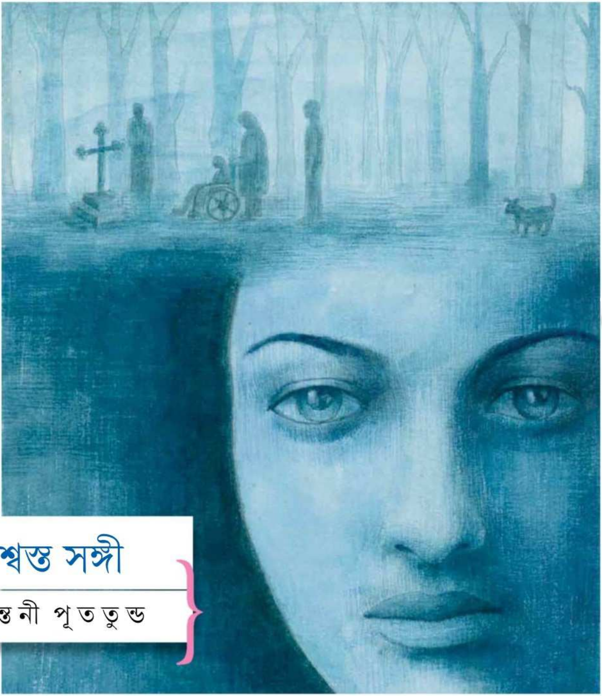

টার্ট


ব্রাউনি


গরমে শরীর ভাল রাখতে, ওজন কমাতে টক দইয়ের কোনও বিকল্প নেই। শুধু তো খেতেই পারেন, রায়তা বা ঘোলও ভাল অপশন।


দই স্ট্রবেরি রিং

যোগাযোগ: ৯৪৩৩৬১০৩৮৩
ছবি: শুভদীপ ধর



বিশ্বস্ত সঙ্গী

সায়ন্তনী পূততুন্ড

২২ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৫

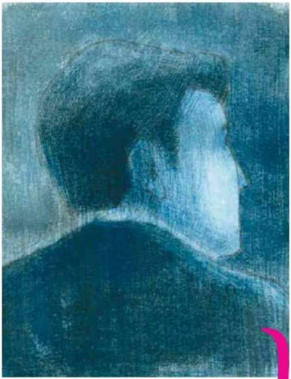
তখন সাদা বকের দীঘল ডানার ছন্দে ছন্দে সন্ধ্যা নামছে। সাদা রঙের ডানাগুলো সূর্যাস্তের শেষ রক্তিম আলোটুকু মেখে ছড়িয়ে দিচ্ছে গুঁড়ো গুঁড়ো সিঁদুরে অভ্র। অন্ধকার এখনও গাঢ় হয়ে ওঠেনি। আধা অস্বচ্ছ পরদার মতো নির্লিপ্ততায় ছড়িয়ে আছে চতুর্দিকে। ঝিলের জল থেকে উঠে আসছে বাষ্প-ধোঁয়াশা। হঠাৎ দেখলে মনে হয় কোনও ছায়ামূর্তি বুঝি চুপিচুপি উঠে আসছে জলের বুক থেকে।

এই মুহূর্তে কান পেতে শুনলে দু'টি শব্দই শোনা যাবে। শিশিরের অস্ফুট টুপটাপ। আর একটা অত্যন্ত চাপা শিশু কণ্ঠের কান্না! শিশিরের শব্দ যতটা সন্ত্রস্ত, কান্নার শব্দটাও ততটাই সাবধানী। যেন বুকের ওপর এক চরম ভার নিয়ে কাঁদতে চাইছে কেউ। কিন্তু কান্নাটা সেই প্রচণ্ড ভারের তলায় চাপা পড়ে হারিয়ে যাচ্ছে এক অনাবিল অসহায়তায়।

"জ্যানেট, প্লিজ় ডোন্ট ক্রাই বেবি"।

মেয়েটা বড্ড কষ্ট পেয়েছে। কান্নার দমকে তার পিঠ ফুলে ফুলে উঠছে। দু'হাতে জড়িয়ে ধরে আছে একটি নিথর দেহকে। একটু পরেই কবরস্থ করা হবে মৃতদেহটিকে। তা সত্ত্বেও বুকে আঁকড়ে ধরে আছে। এমনভাবে ফুলে ফুলে কাঁদছে, যেন বুকের শিরা ছিঁড়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তারই দেহের অংশকে। কিছুতেই বুঝি যেতে দেবে না তার একমাত্র বন্ধুকে! একমাত্র বিশ্বস্ত সঙ্গীকে। মেয়েটির ঠাকুরমার মুখের বলিরেখায় স্পষ্ট সন্ধ্যার আলোর গাঢ় তামাটে আঁকিবুঁকি। মুখখানা কিছুটা ব্রোঞ্জ মূর্তির মতো। মাথার কাঁচাপাকা চুলগুলো বিস্রস্ত। তিনি নাতনিকে জড়িয়ে ধরে বললেন—"জ্যানেট। কেঁদো না। ও খুব কষ্ট পাচ্ছিল। গড

ওর কষ্ট দূর করেছেন। ওকে ছেড়ে দাও।"
জ্যানেট নামের শিশুকন্যা অতিকষ্টে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল ঠাকুরমার দিকে। শিশুর সরল দৃষ্টি সন্ধ্যার নরম আলোয় আরও মায়াবি দেখাচ্ছিল। চোখদুটোয় একরাশ অশ্রু নিয়ে ভীষণ সরলতায় বলল,—"তবে আমার সঙ্গে কে খেলা করবে গ্র্যানি?"
ঠাকুরমা, অর্থাৎ গ্র্যানি স্মিত হাসলেন—"কেন? আমি খেলব তোমার সঙ্গে।"
জ্যানেট বিষণ্ণ মুখে চোখ মুছল। গ্র্যানি কী করে খেলবে ওর



সেই মোমবাতির ভীরু শিখার স্তিমিত আলো এসে পড়ছিল শিশুকন্যার মুখের একদিকে। আরেকটা দিক অন্ধকার। যেন ও পাশের মুখ আঁধার দিয়েই গড়া।

সঙ্গে! গ্র্যানির তো পায়ে, কোমরে ব্যথা! সংসারের কাজেই সবসময় ব্যস্ত। তার খেলা করার সময় কই? একমাত্র ও-ই তো ছিল যে সবসময়ই ওর সঙ্গে খেলা করত। এক শিশুর অন্যতম বিশ্বস্ত সঙ্গী!
গ্র্যানি মৃদুকণ্ঠে আবার বললেন—"জ্যানেট, প্লিজ"।
অবুঝ শিশু মৃতদেহটিকে আরও সজোরে আঁকড়ে ধরে। যাঁরা দেহটিকে কবরস্থ করবেন, তাঁরাও অধৈর্য হয়ে উঠেছেন। আর কাঁহাতক অপেক্ষা করা যায়! ক্রমেই অন্ধকার নেমে আসছে। আর কিছুক্ষণ পরে নিজের হাত পা-ও ঠিকমতো দেখা যাবে না। অথচ মেয়েটি কিছুতেই মরদেহটিকে ছাড়তে চাইছে না। আর পাঁচটা সাধারণ বাচ্চার মতো হলে ধমকধামক দিয়ে হয়তো জোর করে ছাড়ানোও যেত। কিন্তু একেই বাপ-মা মরা শিশু, তার ওপর জন্ম থেকেই পঙ্গু। তার দুনিয়া শুধু হুইলচেয়ারেই সীমাবদ্ধ। হয়তো সেজন্যই একটু বেশি জেদি। লাশটাকে বুকে জড়িয়ে ধরে ক্রমাগত কেঁদেই চলেছে।

বেগতিক বুঝে গ্র্যানিই এবার এগিয়ে এলেন। মেয়েটার মন বড় নরম। ভীষণ মায়াবি মনের শিশু জ্যানেট। মৃত্যুর কঠিন বাস্তবতাকে ঠিকমতো বোঝার বয়স এখনও ওর হয়নি। তিনি আলতো করে জ্যানেটের কাঁধে হাত রেখে বললেন—"বেবি, ডোন্ট ক্রাই। ও তোমার আশেপাশেই আছে। কোথাও যায়নি। কখনও যাবেও না।"
জ্যানেট ভেজা চোখের পাতা তুলে বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকায়—"ও যায়নি?"
"না!" গ্র্যানি তার রেশমের মতো চুলে হাত বুলিয়ে বললেন—"ওর শুধু জায়গা বদল হয়েছে। এখন তো ও আমাদের বাড়ির পেছনে, এই বাগানেই শুয়ে থাকবে। আগে তো ছুটে ছুটে এদিকে ওদিকে চলে যেত। দুষ্টুমি করত। তোমাকে ফেলে নেবারদের সঙ্গে খেলা করত। তুমি ওকে ধরতে পারতে না, কাঁদতে! খুঁজে খুঁজে বেড়াতে। এখন ও পুরোপুরি তোমার ওবিডিয়েন্ট হয়ে এখানেই শুয়ে থাকবে। তোমায় ফেলে ও কোথাও যেতেই পারবে না। তাই না?"
জ্যানেট ফোলা ফোলা রক্তাভ চোখদুটো মুছে নিয়ে বলল—"ও আর কখনও আমাকে ফেলে এমিলিদের সঙ্গে খেলা করবে না? কখনও আমাকে একা ফেলে রেখে যাবে না?"
গ্র্যানির মুখের হাসিটা যেন সন্ধ্যার আতুর রশ্মির চেয়েও বেশি রহস্যময় ঠেকল—"না। কোথাও যাবে না। যেতেই পারবে না। এখন শুধু ও এখানেই শুয়ে থাকবে। তুমি যা বলবে, সব চুপ করে শুনবে। আর কারও কথা শুনবে না।"
জ্যানেট কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে মৃতদেহটিকে ছেড়ে দিল। গর্ত আগেই খোঁড়া হয়ে গিয়েছিল। সকলে মিলে ধরাধরি করে শবটিকে কবরস্থ করে দিল। যখন সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি সমাপ্ত হল, তখন গ্র্যানি একটা সাদা গোলাপের তোড়া রেখে দিল সমাধির বুকে। অন্ধকার গুঁড়ি মেরে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ধরছিল কবরটিকে। জ্যানেট দেখল গ্র্যানি একটা ধবধবে সাদা মোমবাতি জ্বালিয়ে দিয়েছে। সেই মোমবাতির ভীরু শিখার স্তিমিত আলো এসে পড়ছিল শিশুকন্যার মুখের একদিকে। আর একটা দিক অন্ধকার। যেন ও পাশের মুখ আঁধার দিয়েই গড়া। সেখানে কোনওদিন কোনও আলো এসে পড়েনি। মাঝেমধ্যেই একটা ঠান্ডা হাওয়া বয়ে যাচ্ছে। নিস্তব্ধ বাগানে শুধু একটা দুটো গাছের পাতা ঝরানোর টুপটাপ শব্দ। আর নারকেল পাতার শিরশিরানি। সবুজ নারকেল পাতাগুলো জ্যোৎস্নায় নীলাভ! সেই নীলচে পাতার ফাঁক দিয়ে উঁকি মারছে গোল রুপোর থালার মত চাঁদ। আশেপাশের ছোট ছোট ফুলের গাছ, ঝোপ থেকে একটা মনকেমন করা গন্ধ ভেসে আসছে। টুপটুপ করে জোনাকিরা গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে নক্ষত্রের মতো জ্বলে উঠছে অদ্ভুত ইশারায়।
জ্যানেট বিষণ্ণ চোখে একবার গ্র্যানির দিকে তাকাল। আর একবার কবরের দিকে। ওখানেই শুয়ে আছে তার চিরসাথি। বিশ্বস্ত সঙ্গী। যে আগে কখনও কখনও ভুলবশত বিশ্বাসভঙ্গ করেছিল। কিন্তু আজ আর ভুল করেও তার সে উপায় নেই। আজ সে আর কোনও এমিলি বা প্যাট্রিকের কাছে যেতে পারবে না।
এখন সে শুধুমাত্র জ্যানেটের। আর তার ওপরে অন্য কারও দাবি নেই! এখন সে সম্পূর্ণ বিশ্বস্ত ও অনুগত!

২

২১ জুলাই, ২০১৯
"আমি বুঝতে পারছি না আর্থার, তুমি ওই জ্যানেটের মধ্যে কী

দেখেছ!"
একটু অসহিষ্ণুভাবেই কথাটা বলল ক্যারোলিন। সে অত্যন্ত সুন্দরী ও সুতনুকা। কালো জর্জেটের শাড়িতে আরও বেশি আকর্ষণীয় আর আবেদনময়ী লাগছে তাকে। কিন্তু মুখ দেখলেই বোঝা যায়, তার মেজাজ মোটেও ভাল নেই। নাকের পাটা রক্তাভ। নীলাভ চোখদুটি উত্তেজনায় ঈষৎ বিস্ফারিত। স্ফুরিত অধরে সে জানায়—"কী আছে ওর যে তুমি আমায় ছেড়ে ওকে বিয়ে করতে চাইছ? একটা থলথলে মোটা শরীর, গোলগোল চোখ! নিজের পায়ে হাঁটার ক্ষমতাটুকুও নেই! সর্বক্ষণ হুইলচেয়ারে ঘুরে বেড়ায়! এমনকী তোমার চেয়ে বয়সেও বড়। ওই আধবুড়ি কুচ্ছিত পঙ্গুটা তোমায় কোনওরকম সুখ দিতে পারবে না! ওর জন্য তুমি আমায় ডাম্প করছ! ড্যা—ম ই—ট!"
শেষ শব্দটা উচ্চারণ করেই সে হাতের টিসু পেপারটা এমন ভাবে ছুঁড়ে দিল, যেন অবিকল সেভাবেই আর্থার তাকে ডাস্টবিনে ছুঁড়ে ফেলেছে! তার রাগের বহর দেখে আর্থার মিটিমিটি হাসছে। রেস্তরাঁর বাকি লোকেরা সামান্য কৌতুহলীদৃষ্টিতে তাদের একবার দেখে নিয়ে পরক্ষণেই নিজেদের মধ্যে আলাপচারিতায় ডুবে গেছে। সচরাচর নামী ও অভিজাত রেস্তরাঁয় দৃশ্যটা এমনই হয়। এখানে কেউ কারও ব্যাপারে কৌতুহল দেখায় না। প্রত্যেকেই নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত থাকে।
আর্থার অত্যন্ত সুদর্শন যুবক। তার ব্যাকব্রাশ করা চুল, টিকলো নাক, ধারালো চোয়াল, সুগভীর দুটি হাসিমাখা চোখ ও টানটান পুরুষালি দেহ—সব মিলিয়ে আভিজাত্যের প্রতীক। পরনের গাঢ় নীল রঙের স্যুটটা সামান্য ভাঁজও খায়নি। হাবেভাবেই বোঝা যায় যে অত্যন্ত গোছালো স্বভাবের ঠান্ডা মাথার মানুষ। সে টেবিলে রাখা টিসু পেপারের প্যাকেট থেকে একটি তুলে নিয়ে এগিয়ে দেয়। নম্র অথচ গম্ভীর স্বরে বলে—"হয়েছে? না আরও সিন ক্রিয়েট করতে চাও?"
ক্যারোলিন এবার প্রায় কেঁদেই ফেলে—"কী পেয়েছ তুমি ওই বুড়িটার কাছে যে আমায় ছাড়তে চাইছ? যখন ডিনারে ডাকলে তখন ভেবেছিলাম এবার অফিশিয়ালি প্রপোজ করবে। অথচ তুমি কিনা বলছ— তুমি ওই জ্যানেটকে বিয়ে করছ! এর মানে কী?"
"বিয়ে করছি না। অলরেডি বিয়ে করেছি।" সে স্মিত হাসল— "আমাদের রেজিস্ট্রি ম্যারেজ হয়ে গিয়েছে। শুধু চার্চে গিয়ে আনুষ্ঠানিক বিয়েটাই বাকি আছে। তবে আইনত, আমি এখন জ্যানেটের স্বামী।"
ক্যারোলিন বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে আর্থারের দিকে, যেন কথাটা বিশ্বাস করতেই পারছে না! এ কি সেই আর্থার যার সঙ্গে এতদিন ধরে ঘনিষ্ঠতম মুহূর্তগুলোও কাটিয়েছে অবলীলায়? যাকে বিশ্বাস করে দেহ মন সর্বস্ব দিয়েছে—সেই পুরুষই কি এই মুহূর্তে তার সামনে বসে আছে? নাকি এ অন্য কেউ!
তার চোখ বেয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় অশ্রুবিন্দু চুঁইয়ে পড়ছে—"আর্থার! তুমি বোধহয় ঠান্ডা মাথায় মানুষ খুনও করতে পারো!"
আর্থার ফের শান্ত হাসি হাসল। আস্তে আস্তে বলল— "সরি ক্যারোলিন। জ্যানেটকে তুমি অনেকক্ষণ ধরেই উলটোপালটা বলছ। মানুষের বাহ্যিক রূপটাই সব নয়। মানছি, জ্যানেট ছোটবেলা থেকেই হাঁটতে চলতে পারে না। ওর পায়ের হাড় সম্পূর্ণভাবে গড়ে না ওঠার কারণেই এই অবস্থা। কিন্তু এটা তো ওর দোষ নয়।"
"কিন্তু ও তোমার থেকে আট বছরের বড়!" ক্যারোলিন ফের উত্তেজিত— "যখন ওর জন্ম হয়েছিল তখন তোমার মা-বাবার বিয়েও হয়নি!"
"সো হোয়াট!" সে কাঁটাচামচ দিয়ে রোস্টেড ল্যামের মাংস কাটতে ব্যস্ত— "এটাও ওর দোষ নয়। আমার থেকে আট বছরের বড় বলে সে আমার যোগ্য নয়! সাউন্ডস ইললজিক্যাল।"
"তাহলে তোমার কাছে লজিকটা কী?" ক্যারোলিনের নাকের পাটা ফুলে ওঠে— "কেন ঐ কুচ্ছিত মেয়েটাকে বিয়ে করলে? আর আমাকে জানানোর প্রয়োজনও বোধ করোনি! তোমার কাছে আমার কোনও মূল্য নেই!"
কথাটা কানে যেতেই চিবোনো বন্ধ করল আর্থার। টিসু পেপারে মুখ মুছে বলল— "মাইন্ড ইওর ল্যাঙ্গোয়েজ ক্যারল। যাকে তুমি বারবার কুচ্ছিত, কদাকার, বুড়ি—এইসব উলটোপালটা বলে যাচ্ছ সে আমার স্ত্রী। সে একজন নামকরা বিজনেসওম্যানও বটে। কলকাতার ফুড বিজনেসের আনক্রাউনড কুইন। তোমার আমার মতো একশোটা মানুষকে কলার পরিয়ে পুষতে পারে ও। আমরা ওর সামনে জাস্ট ভিখিরি!"
সযত্নে চোখের জল মুছতে মুছতে ক্যারোলিন বলল—"ও! তাহলে লজিকটা এই! তুমি সোনার কলার পরতে চাও!"
আর্থার তার দিকে কিছুক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে। এর একটা মারাত্মক কঠিন উত্তর দেওয়া যেত। কিন্তু মেয়েদের সঙ্গে নাকে নাক লাগিয়ে ঝগড়া করা তার স্বভাববিরুদ্ধ। আপাদমস্তক ভদ্রতায় মোড়া মানুষের পক্ষে সেটা সম্ভবও নয়। সে আলতো করে ওয়াইনের গ্লাসটা এগিয়ে দিল ক্যারোলিনের দিকে। ক্যারোলিন তখন কোনওক্রমে কান্না চাপার চেষ্টা করছে।
মাঝে মাঝে আর্থারের মনে হয় মেয়েরা ভারী অদ্ভুত জীব! কখন কী করে বসবে তার ঠিক নেই। আজকাল এমনও ধারণা হচ্ছে যে নারীরা বোধহয় পুরুষদের চেয়েও কুকুরদের বেশি ভালবাসে। ঠিক এই মুহূর্তেই ক্যারোলিন তাকে ঘুরিয়ে কুকুর বলে দিল! অন্যদিকে জ্যানেটের কুকুর 'ফেথ'এর গল্প শুনতে শুনতে তার পাগল হওয়ার উপক্রম! জ্যানেট বোধহয় তাকেও এত ভালবাসে না যতটা ফেথকে ভালবাসে। যতক্ষণ তারা দুজনে একসঙ্গে থাকে ততক্ষণ শুধু ফেথেরই গল্প চলতে থাকে। যদিও আর্থার তাকে এখনও স্বচক্ষে দেখেনি। কিন্তু জ্যানেটের কাছেই শুনেছে যে ফেথ জাতে ল্যাব্রাডর। সে অসম্ভব বুদ্ধিমতী। জ্যানেট হাঁটতে চলতে পারে না বলে ফেথ নাকি সবসময়ই তাকে চোখে চোখে রাখে। সকালবেলায় খবরের কাগজ মুখে করে নিয়ে ছুটে আসে। টুকিটাকি কাজও করে দেয়। কখনও চশমার বাক্স নিয়ে আসে, কখনও বা জলের বোতল, চিরুনি। তবে সবচেয়ে আশ্চর্য তার একাগ্র ভালবাসা! দিন নেই, রাত নেই—সে শুধু জ্যানেটের দিকেই সতর্ক নজর রাখছে। অবসর সময়ে খেলা করে। কিন্তু এমন কিছু করে না যাতে চলৎশক্তিহীন মানুষটার কোনও কষ্ট হয়।
"এরপর তো ফেথের ছুটি হয়ে যাবে।" আর্থার হেসে জ্যানেটের হাতদুটো নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে বলে—"কারণ এরপর তো শুধু আমিই তোমার খেয়াল রাখব। তাই না?"
জ্যানেট স্মিত হেসেছে—"তুমি ফেথের মত পারবে না। ও একদম আলাদা। আমি কিছু বলার আগেই সব বুঝে যায়। তোমার ভালবাসায় সামান্য খাদ থাকলেও থাকতে পারে। কিন্তু ফেথের ভালবাসা একদম নিখাদ।" বলতে বলতেই

তার চোখে কৌতুক নেচে ওঠে—"তুমি আমায় ছেড়ে যেতেই পারো—কিন্তু ফেথ যাবে না।"

বোঝো! কথা নেই বার্তা নেই, শেষে কিনা কুকুরের সঙ্গে তুলনা টেনে দিল! আর্থারের এরকম উদ্ভট কথা শুনে রাগ করাই উচিত ছিল। মনে মনে গরগরও করেছিল। কিন্তু মুখে প্রকাশ করেনি। বরং একটু দেঁতো হাসি হেসে বলেছে—"কিন্তু আমি ফেথের ভালবাসায় ভাগ বসালে ওর হিংসে হবে না তো?"

"একদম না।" জ্যানেট ওর আঙুল নিয়ে খেলছে—"বরং ও তোমাকে আমায় ভালবাসতে সাহায্য করবে। আমি যাকে ভালবাসি, তাকে ফেথও খুব ভালবাসে।"

"তা তোমার এই বিশ্বস্ত সঙ্গীটির দেখা পাচ্ছি কবে?" সে হাসতে হাসতেই বলে—"তার গল্প শুনতে শুনতেই যে উইকেন্ডগুলো কেটে যাচ্ছে। এবার তো এই প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে দেখা করতেই হয়!"

"উঁহু!" জ্যানেট মাথা নাড়ল—"অপোনেন্ট নয়—শি ইজ় ইওর সিস্টার ইন ল'।"

আর্থার এসব শুনে মনে মনে হেসেছিল। মেয়েদের যে কত রকমের অদ্ভুত অদ্ভুত ধারণা থাকে! একটি কুকুর কিনা তার শ্যালিকা! এরকম উদ্ভট কথা জীবনে কেউ শুনেছে? অন্য কেউ একথা বললে হয়তো সজোরে হেসে উঠত আর্থার। কিন্তু যেহেতু কথাটা জ্যানেটের মুখ থেকে বেরিয়েছে, সেহেতু হেসে ওঠার সাহস পায়নি।

এমন নয় যে আর্থার জ্যানেটকে ভয় পায়! কিন্তু জ্যানেটের মধ্যে এমন কিছু একটা রয়েছে যাকে ঠিক অবহেলা করা যায় না। শুধু ব্যক্তিত্ব নয়, তার মধ্যে একটা অদ্ভুত ঠান্ডা দৃঢ়তা আছে যাকে এড়িয়ে যাওয়া অসম্ভব। হাস্যকর কথাটাও এমন দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে বলে যে, সেটাকেও সত্যি বলেই মনে হয়। তাই ফেথের ব্যাপারটা একরকম মেনেই নিয়েছে সে।

"তা এই শ্যালিকার সঙ্গে দেখা কবে হচ্ছে?" সে মৃদু হেসে জানতে চায়।

"তুমি আমার ফ্যামিলি মেম্বার হলেই ওকে দেখতে পাবে।" মুচকি হাসল জ্যানেট—"আফটার অল, শি ইজ় মাই ফ্যামিলি। ওর সঙ্গে দেখা তো করতেই হবে তোমাকে।"

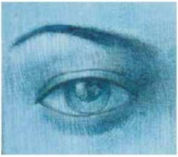
এরপর আর কথা বাড়ায়নি আর্থার। কারণ জ্যানেট সেটা আদৌ পছন্দ করবে না। এমনিতেই মেয়েটা ভারী অদ্ভুত। কোন কথায় কীভাবে রিঅ্যাক্ট করবে তা বোঝাই দায়। নিজের বিষয়ে সে অত্যন্ত স্পর্শকাতর। একেই ছোটবেলাতেই একটি অ্যাক্সিডেন্টের দরুণ মা-বাবার স্নেহচ্ছায়া হারিয়েছে। মূলত ঠাকুরমা, তথা 'গ্র্যানি'র কাছেই মানুষ। তার ওপর শারীরিক দিক দিয়েও ভগবান মেরে রেখেছেন। চলাফেরার ক্ষমতা না থাকার ফলে এবং খানিকটা ভোজনপ্রিয়তার দরুণ অত্যন্ত পৃথুলাও বটে। সে বিষয়ে সে নিজেও যথেষ্টই সচেতন। নিজের রূপ নিয়ে ভীষণ হীনমন্যতায় ভোগে। একমাত্র আপনজন গ্র্যানিও কয়েকবছর আগে দেহ রেখেছেন। তবে পৈতৃক সম্পত্তির একচ্ছত্র উত্তরাধিকারসূত্রে তার যত্ন নেওয়ার লোকের অভাব নেই। আর আছে 'ফেথ'। তার ক্ষুধিত হৃদয় সমস্ত স্নেহ, ভালবাসা, মায়া-মমতা উজাড় করে দিয়েছে এই প্রাণীটিকেই। এখন 'ফেথ'ই জ্যানেটের গোটা দুনিয়া। তাকে ঘিরেই গড়ে উঠেছে ওর পৃথিবী।

প্রায় ছ'মাস হল আর্থার আর জ্যানেটের সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। একটি পার্টিতে প্রথম দেখা ও প্রেম। কিন্তু জ্যানেট যেন এখনও কিছুতেই নিজের হৃদয় আর্থারের সামনে মেলে ধরতে চায় না। সে অনেকবার অনুনয় করেছে,"প্লিজ় জ্যানেট, ওপেন ইওর হার্ট টু মি! মাঝেমধ্যে মনে হয়, আমি বোধহয় এখনও তোমার কাছে স্ট্রেঞ্জার!"

জ্যানেট তার স্বয়ংক্রিয় হুইলচেয়ারে এগিয়ে যেতে যেতে বলেছে,"স্ট্রেঞ্জার নও, কিন্তু ফ্যামিলি মেম্বারও নও।"

আর্থার জ্যানেটের মেদবহুল চেহারা, ড্যাবড্যাবে চোখের দিকে সস্নেহে তাকিয়েছিল। বুঝেছিল, এই নারী আদৌ সহজলভ্য নয়। জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত তাকে এক অদ্ভুত স্বতন্ত্র সত্তা দিয়েছে, যা অনেকটা হিমশৈলের মতো! কিছুটা দেখা যায়, কিছুটা যায় না! শীতল অথচ কঠিন। তাকে জয় করা অত সহজ নয়। দুর্বার গতিতে তার দিকে ধেয়ে গেলে শুধু আহতই হতে হবে।

আর্থার জ্যানেটের মেদবহুল চেহারা, ড্যাবড্যাবে চোখের দিকে সস্নেহে তাকিয়েছিল। বুঝেছিল, এই নারী আদৌ সহজলভ্য নয়।



তাই জ্যানেটকে প্রয়োজনীয় সময় দিয়েছিল সে। এই ছ'মাসে একবারও জ্যানেট তাকে নিজের বাড়িতে ডিনারে বা লাঞ্চে ডাকেনি। দু'জনের দেখা কখনও চার্চে হয়েছে, কখনও রেস্তঁরা, আবার কখনও বা সিনেমাহলে। সামনে ঈশ্বর থাকুন, সুখাদ্য থাকুক কিংবা কোনও হিরো বা হিরোইন, দুজনের মাঝখানে সবসময়ই এক অদৃশ্য মধ্যবর্তিনীর উপস্থিতি প্রকট, যার নাম 'ফেথ'। প্রথম প্রথম আর্থার অস্বস্তি বোধ করত। এখন খানিকটা মানিয়ে নিয়েছে। আর ফেথকে মেনে নিয়েছে বলেই আজ সে জ্যানেটের আইনত জীবনসঙ্গী।

জ্যানেটের কথা ভাবতে ভাবতেই খানিকটা অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল আর্থার। সম্বিত ফিরল ক্যারোলিনের প্রবল কাশির শব্দে! তার গলায় কিছু একটা আটকে যাওয়ার ফলে প্রবল বিষম খেয়েছে সে। আর্থার তার দিকে উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে চকিতে তাকায়,"কী হল! আর ইউ অলরাইট ক্যারল!"

বিষম খেয়ে ক্যারোলিনের ফরসা মুখ লাল হয়ে গিয়েছে। সুন্দর মুখ বিকৃত। সে কোনওমতে সামলে নিয়ে বলে,"ওয়াইনের গ্লাসে কিছু একটা ছিল। আর একটু হলেই গিলে ফেলছিলাম...!"

বলতে বলতেই নানারকম মুখভঙ্গি করতে করতে বিষম খাওয়ার এক ও অদ্বিতীয় কারণটিকে মুখ থেকে বের করে আনল সে। তার গোলাপি ঠোঁট বেয়ে জিনিসটা বাইরে বেরিয়ে আসতেই অদ্ভুত এক দ্যুতিতে চোখ ধাঁধিয়ে গেল! রেস্টুরেন্টের মায়াবি আলোয় বাদশাহি জেল্লা নিয়ে ঝিকিয়ে উঠেছে একটা নিটোল হিরের আংটি! পরম উত্তাপে, প্রচণ্ড কামনায় ধিকিধিকি আগুনের মতো জ্বলছে।

"আ—র্থা—র!"

ক্যারোলিন স্তম্ভিত! সে যেন কথা বলতে ভুলে গিয়েছে! কেমন যেন বোকা বোকা ঠেকল তার সুন্দর মুখখানা। ওয়াইনের

গ্লাসে হিরের আংটি! এর অর্থ বোঝার জন্য অবশ্য খুব বেশি বুদ্ধির প্রয়োজনও হয় না। বিস্ময়ের অভিঘাতে সে শুধু একটা শব্দই উচ্চারণ করতে পারল।

"ওঃ!"

শব্দটার মধ্যে তার হৃদয়ের সমস্ত প্রেম ঝরে পড়ে। আর্থার তার দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসছে।

"তুমি আমার সঙ্গে প্র্যাঙ্ক করছিলে—তাই না?" ক্যারোলিন উচ্ছ্বসিত—"ওহ্ মাই গড! ইউ আর ডেঞ্জারাস! সত্যি, তুমি বোধহয় হাসতে হাসতেই খুন করতে পারো! আর্থার, আই লাভ ইউ!"

আর্থারের কপালে সামান্য ভাঁজ পড়ল। ক্যারোলিন তো ওয়াইনের গ্লাসে হিরের আংটি পেল। এখন দেখা যাক, আগামীকাল জ্যানেট তার গ্লাসে কী পায়!

৩

২২ জুলাই, ২০১৯

রুপোর দামি কাটলারি সেটটা টেবলের ওপরে সাজাতে সাজাতে ঘড়ির দিকে তাকাল জ্যানেট। ঘড়ির কাঁটা প্রায় আটটা ছুঁই ছুঁই। আজ বৃষ্টি আসবে বলেই মনে হয়। বিকেল থেকেই ঈশান কোণে একদল জলভরা কালো মেঘ থম মেরে দাঁড়িয়ে আছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ক্রুদ্ধ মহিষের পালের মতো ক্রমাগতই ভয়ঙ্কর রূপ ধরছিল। এখন তো থরে থরে সাজানো কালো মেঘের স্তূপের বুকে রুপোলি চমক ঝলসে ঝলসে উঠছে। তার সঙ্গে ক্রুদ্ধ গর্জন! যেন মহাকালের ডমরু বাজছে। তাণ্ডব শুরু হল বলে।

জ্যানেটের কপালে চিন্তার ভাঁজ। ঝড় আসবে বলেই মনে হয়। কিন্তু আর্থার কখন আসবে? আজই সে প্রথম এ বাড়িতে আসছে। এর আগে কখনও তাকে বাড়িতে ডাকেনি জ্যানেট। অনেকবারই মনে মনে আমন্ত্রণ জানিয়েছে। কিন্তু মুখ ফুটে বলতে পারেনি। অদ্ভুত একটা ভয়, সঙ্কোচ, একটা লজ্জা তাকে বারবার পেয়ে বসেছে। কিছুতেই সে বাধা অতিক্রম করা যায়নি। কিন্তু আজ সব অপেক্ষার অবসান। এখন আর লজ্জা পাওয়ার কোনও জায়গা নেই। এখন আইনত আর্থার শুধুমাত্র তারই!

"ম্যাডাম?"

এতক্ষণ তার সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে টেবল সাজাচ্ছিল তার বিশ্বস্ত ভৃত্য জর্জ। এবার মুখ তুলে বলল,"মাইকেলকে ডিনার গরম করতে বলব?"

অনেকদিনের পুরনো মানুষ জর্জ, ড্রাইভার জ্যাক, সেক্রেটারি ক্রিস্টাবেলা, সুদক্ষ বাটলার জেমস আর তুখোড় কুক মাইকেলকে নিয়েই জ্যানেটের সংসার। ওরা প্রত্যেকেই খুব ভাল। কিন্তু কখনও কখনও ওদের যন্ত্র বলে মনে হয় ওর। ওরা বুঝি দম দেওয়া কতগুলো রোবট, যারা এক নির্দেশেই সুসম্পন্ন করে ফেলবে সমস্ত কাজ। ভিতরে ভিতরে অস্থির হয়ে ওঠে জ্যানেট। ওরা প্রয়োজনের বাইরে একটা কথাও বলে না! শুধু নিশ্চুপে সমস্ত নির্দেশ পালন করে যায়। ওদের কাজে সামান্যতমও ত্রুটি পেলে খুশি হত সে। অন্তত বোঝা যেত, যে ওরা যন্ত্র নয়—দোষগুণসম্পন্ন মানুষ। কিন্তু এতটাই নিখুঁত ওদের কাজ যে, কোনও ভুল ধরাই মুশকিল।

জ্যানেট একটা শ্বাস টেনে নেতিবাচকভাবে মাথা নাড়ে। ওইটুকু ইশারাতেই জর্জ বুঝে গেল যে মাইকেলকে কী বলতে হবে। ওরা সবাই জানে যে স্যার আজ প্রথম এ বাড়িতে আসছেন। ম্যাডাম যখন খাবার গরম করতে বারণ করছেন, তখন স্যার আসার পরই সেই কাজটা করার নির্দেশ স্পষ্ট। সে মাথা ঝাঁকিয়ে নিঃশব্দে চলে যাচ্ছিল, জ্যানেট কী মনে করে যেন ডাকল,"শোনো, হোয়াইট মিট..."

"ইয়েস ম্যাডাম,"। সে কথাটা শেষ করার আগেই জর্জ বলে উঠল, "মাইকেল জানে যে হোয়াইট মিট স্যার বেশি পছন্দ করেন। তবে ব্ল্যাকও সঙ্গে আছে। আর ভিন্টেজ ওয়াইনও বের করেই রেখেছি।"

এরা তো সবাই সব কিছুই জেনে বসে আছে! মুখ খোলার আগেই হড়হড়িয়ে সব কিছু বলে গেল। অগত্যা মাথা নাড়া ছাড়া আর কোনও উপায় নেই। সে বিরস বদনে বলল,"ওকে। থ্যাঙ্কস।"

জর্জ মৃদু হেসে বেরিয়ে গেল। জ্যানেট চুপচাপ হুইলচেয়ারটাসমেত নিজেকে টেনে নিয়ে গেল বেডরুমে। আজকাল বড় ক্লান্তি বোধ হয় তার। গ্র্যানির মৃত্যুর পর তার সঙ্গে কথা বলার একটা লোকও নেই! এমন একটা মানুষও নেই যার জ্যানেটকে কিছু বলার থাকতে পারে। সে পঙ্গু হলেও স্বয়ংসম্পূর্ণ। মাথার ওপরে এতবড় বিজনেসটা তো একাই সামলাচ্ছে। গ্র্যানি তাকে সুকৌশলে নিজের কাজ নিজে করতেই শিখিয়েছে। অথচ ক্রিস্টাবেলা তাকে পুতুপুতু করবেই। তাও ভাল আজ তাকে আগেভাগেই ছুটি দিয়ে দিয়েছে। নয়তো এখনও নির্ঘাত চশমা-আঁটা দিদিমণির মত ডায়লগবাজি করে বলত "ম্যাডাম, আপনার ওয়াইন খাওয়া উচিত নয়! আপনি সহ্য করতে পারেন না।"

বেডরুমের বড় আয়নাটায় নিজেকে ভালভাবে দেখছিল সে। নিজেকে অত্যন্ত কুৎসিত এক প্রৌঢ়া ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না তার। যদিও বয়স এমন কিছু বেশি না, তবু এই অপ্রয়োজনীয় চর্বির কারণে তাকে অনেক বেশি বয়স্ক দেখায়। আয়নায় নিজের প্রতিবিম্বই অসহ্য লাগছিল জ্যানেটের। একটা সাদা ময়দার বস্তার মত চেহারা! গালের পাশের মাংস ঝুলে পড়েছে! গোল গোল চোখ দুটো অবিকল প্যাঁচার মত। দাঁতের সেটিং অবশ্য চমৎকার। কিন্তু দাঁতের সৌন্দর্যে কী আসে যায়!

সে ফের একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। এই মুখ দেখলে যে কোনও পুরুষের মনের প্রেম ও কামভাব তিরোহিত হতে বাধ্য! অথচ আর্থার যে কী দেখল! অমন সুন্দর তরুণ শেষপর্যন্ত তার মত একটা মেয়ের প্রেমে পড়ল! ভাবলে একদিকে আপশোস হয়, আবার অন্যদিকে রোমাঞ্চও অনুভব করে। তার জীবনে এমন একটা মানুষেরই তো দরকার ছিল। এরকম একটা বিশ্বস্ত জীবনসঙ্গীর প্রয়োজনীয়তা চিরকালই ছিল। ফেথ অবশ্য আছে। কিন্তু সে আর কতটুকু শূন্যতা ভরাতে পারে!

জ্যানেট নিজের প্রতিবিম্বের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল। পরক্ষণেই মনে হল প্রতিবিম্বটা ভেংচি কাটছে। সে ফিক করে হেসে বলল, "তুমি যতই রাগ করো—আমি আজ জীবনের তলানি পর্যন্ত পান করব। ওয়াইন খাব। আই অ্যাম ম্যারেড। চিয়ার্স!"

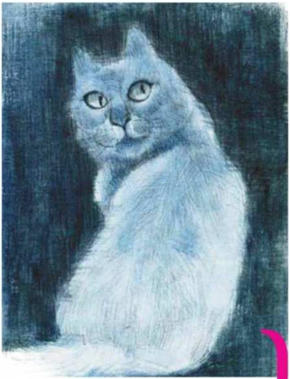
তার পেছন থেকে একটা ছায়া যেন চকিতে সরে গেল। জ্যানেট অনুভব করল, একটা সদাসতর্ক দৃষ্টি তার ওপর ক্রমাগত লক্ষ রেখে চলেছে। সে এবার সজোরে হেসে ওঠে,"ওহ্ ফেথ! ইউ জেলাস গার্ল! মাম্মা ইজ় কামিং টু ইউ...!"

৪

"ফেথকে দেখছি না তো?"

ডিনার টেবলে বসে খুব সন্তর্পণে প্রশ্নটা করল আর্থার।

অন্যদিনের তুলনায় আজ সে যেন একটু বেশিই সতর্ক। মাঝেমধ্যেই একটা হাত সবার অগোচরে ব্লেজ়ারের পকেটে ঢুকে যাচ্ছে। অন্যান্য দিন সে যতটা হাসিখুশি থাকে, আজ যেন সেই হাস্যময় মুখটা একটা পিঙ্গল মুখোশের পেছনে লুকিয়ে পড়ছে বারবার। জ্যানেট ব্যাপারটা লক্ষ করে বেশ কয়েকবার জিজ্ঞাসাও করেছে,"কী হয়েছে? এনি প্রবলেম আর্থার?" সে মৃদু হেসে প্রসঙ্গটা এড়িয়ে গিয়েছে। উলটে মুখে একটা জোরদার আকর্ণবিস্তৃত প্লাস্টিক হাসি এনে



একটা শিরশিরে অনুভূতি আর্থারের পিঠ বেয়ে চলে গেল। সে একটু সন্ত্রস্তভঙ্গিতে আশেপাশে তাকায়। কোথায় সেই জ্বলজ্বলে অতিমানবীয় দৃষ্টি?

বলেছে,"নো! নাথিং সিরিয়াস।"

আর্থার সতর্ক দৃষ্টিতে ফেথকে খুঁজে বেড়াচ্ছিল। এই মুহূর্তে তার অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী সে-ই। এ বাড়ির মালকিন যদি হঠাৎ করে মারা যায়, তবে চাকরবাকরেরা বড়জোর কান্নাকাটি করবে। পৃথিবীতে শোকের আয়ু মাত্র বাহাত্তর ঘণ্টা। বাহাত্তর ঘণ্টা পরে ওরা জ্যানেটের শোক ভুলে অন্য চাকরি খুঁজতে ব্যস্ত হয়ে পড়বে। জ্যানেটের জন্য আর কেউ শোকপালন করবে না।

কিন্তু ব্যতিক্রম শুধু ফেথ। একেই সে মানুষের চেয়ে অনেক বেশি প্রভুভক্ত ও বিশ্বস্ত। তার ওপর ল্যাব্রাডর অত্যন্ত বুদ্ধিমান প্রজাতি। দক্ষ স্নিফার ডগও বটে। তার ওপর তার যেসব কীর্তিকলাপ শোনা যায়, তাতেই স্পষ্ট, সে ওয়েল ট্রেনড। আর্থার আর কাউকে ভয় পায় না। কিন্তু ফেথকেও আন্ডারএস্টিমেট করাটা বোকামি। সায়ানাইডের গন্ধ খুবই ক্ষীণ। কিন্তু যেখানে অপরপক্ষে দুনিয়ার সবচেয়ে বেশি ঘ্রাণশক্তিসম্পন্ন প্রাণীটির উপস্থিতি রয়েছে, সেখানে একটু সমঝে চলাই বাঞ্ছনীয়।

ফেথের উপস্থিত থাকার সম্ভাবনা আর্থারকে এতটাই বিচলিত করছিল যে বারবার হাতটা পকেটের মধ্যে থাকা সায়ানাইডের অ্যাম্পুলটাকে অজান্তেই স্পর্শ করছে। ফেথ তাকে আপাদমস্তক একবার শুঁকে দেখলেই সে ধরা পড়ে যাবে। এই ভয়টাই বারবার তাকে তটস্থ করে তুলছিল। এ বাড়িতে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই একটা অদ্ভুত অনুভূতি ঘিরে ধরেছে তাকে। সে অনুভব করছে যে এই বিরাট প্রাসাদের কোনও প্রান্তে, কোনও অলিন্দে একজোড়া আপাত অদৃশ্য চোখ জরিপ করছে তাকে। আর্থার বেশ কয়েকবার সেই তীক্ষ্ণ দৃষ্টির মালিককে খোঁজার চেষ্টা করেছে। কিন্তু এখনও তার দেখা পায়নি। ইতিমধ্যে বাড়ির ভৃত্যদের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে ঠিকই, কিন্তু আসল বিশ্বস্ত সঙ্গীটির দেখা মেলেনি এখনও। তাই শেষপর্যন্ত লজ্জার মাথা খেয়ে প্রশ্নটা করেই বসল।

জ্যানেট স্মিত হাসল—"ফেথ নিজের মর্জির মালকিন। যখন সময় হবে, তখন ঠিকই দেখা দেবে।" বলতে বলতেই সে হেসে যোগ করল, "তুমি ওকে এখনও দেখনি ঠিকই, কিন্তু ও তোমায় দেখেছে।"

কথাটা শুনেই একটা শিরশিরে অনুভূতি আর্থারের পিঠ বেয়ে চলে গেল। সে একটু সন্ত্রস্ত ভঙ্গিতে আশেপাশে তাকায়। কোথায় সেই জ্বলজ্বলে অতিমানবীয় দৃষ্টি? ঠিক কোথায় লুকিয়ে থেকে লক্ষ রাখছে তার ওপর?

"ও একটু লাজুক," জ্যানেট খাওয়া শেষ করে ওয়াইনের গ্লাস তুলে নিয়েছে,"এমনিতে ওর সাড়াশব্দ তুমি পাবে না। এতক্ষণ যে এখানে আছ, একবারও ওর ডাক শুনতে পেয়েছ কি?"

সত্যিই! প্রায় দেড় ঘণ্টা হতে চলল আর্থার এ বাড়িতে ঢুকেছে। অথচ একবারও কোনও সারমেয়র গর্জন শুনতে পায়নি। এমনিতেই ল্যাব্রাডররা শান্তই হয়। কিন্তু তা বলে এত শান্ত! অদ্ভুত কুকুর তো!

আর্থার আড়চোখে তাকায় জ্যানেটের দিকে। এই নারীকে সহ্য করা যে কী কঠিন, তা শুধু সে-ই জানে। এই কুৎসিত রমণী যখন তার বক্ষলগ্না হয়, তখন রীতিমত বমি পায়। ঘেন্না করে। তবু মুখে মিষ্টি হাসি রেখে সহ্য করে চলেছে শুধু এই দিনটার জন্য! এখন সে আইনত জ্যানেটের স্বামী। স্বাভাবিকভাবেই জ্যানেটের মৃত্যুর পর এই অতুল সম্পত্তির অধিকারী হবে আর্থার। বিলাস-ব্যসন-আরামের কোনও অভাব থাকবে না। সে তো ইতিমধ্যেই ভেবে রেখেছে যে প্রথমেই জ্যানেটের সব বিশ্বস্ত চাকরবাকরদের তাড়াবে। তারপর ও আর ক্যারোলিন নিজেদের সংসার পাতবে। জ্যানেটের মৃত্যু নিয়ে তদন্ত অবশ্য একটা হবেই। কিন্তু একজন একা ক্রোড়পতি নারী নতুন স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া হওয়ার দরুণ অবসাদে আত্মহত্যা করতেই পারে। বাকিটা টাকা থাকলেই ম্যানেজ করা যায়। এখন শুধু একটা সুযোগ পেতে হবে ওয়াইনের গ্লাসে জিনিসটা মিশিয়ে দেওয়ার। তারপর অ্যাম্পুলটা সযত্নে জ্যানেটের ব্যাগে ঢুকিয়ে দিতে হবে। অ্যাম্পুলের গায়ে ওর ফিঙ্গারপ্রিন্ট একবার বসিয়ে দিলেই...!

"কে...!"

পায়ের কাছে রোমশ কী যেন একটা দ্রুত সরসর করে চলে গেল! আর্থার প্রায় লাফিয়েই ওঠে,"কে! টেবলের নীচে কে!"

আতঙ্কে সে তখন প্রায় কাঁটা হয়ে উঠেছে। ফেথ কি তবে এতক্ষণে চলে এল! সবার অগোচরে টেবলের তলায় ঢুকে আর্থারকে শোঁকার চেষ্টা করছে নাকি! অ্যাম্পুলটা এখনও

পকেটে! তার হালকা বাদাম তেলের মতো গন্ধ কোনও মানুষের পক্ষে পাওয়া সম্ভবই নয়। কিন্তু ফেথ! তার ঘ্রাণশক্তির কাছে যে কিছুই লুকোনো থাকে না।
"ভয় পেও না," জ্যানেট মৃদু হাসল,"ও হোপ। জর্জের পোষা বিড়াল। কিছু করবে না। জাস্ট ডিনার টেবলে একটা রাউন্ড দিতে এসেছে।"
একা ফেথ কি কম ঝামেলা ছিল যে হোপও এসে জুটেছে! আর্থার প্রায় দরদর করে ঘামছে। এ বাড়িতে মানুষ কম, কুকুর বিড়াল বেশি! এবং সম্ভবত তারা প্রত্যেকেই এইমুহূর্তে বিপজ্জনক। সে কোনওমতে সামলে নেয়,"সরি। আমার আবার বিড়ালে অ্যালার্জি আছে।"
"ও-হো!"
জ্যানেট একটু আফশোসজনক আওয়াজ করে। তারপর হুইলচেয়ারটাকে একটু পিছিয়ে নিয়ে মিষ্টি সুরে ডাকল,"হোপ। প্লিজ় কাম হিয়ার বেবি।"
সেকেন্ডের ভগ্নাংশ নীরবতা। পরক্ষণেই একটা সাদা ধবধবে তুলোর বল লাফিয়ে উঠে পড়ল জ্যানেটের কোলে। বেশ থাবা গেড়ে বসে, বিরাট মোটা লেজটা তার মুখে অবলীলায় বুলিয়ে গর্বিত ভঙ্গিতে বলল,"মিঁয়াও।"
"এক্সকিউজ় মি," জ্যানেট অটোম্যাটিক হুইলচেয়ারটাকে চালিয়ে নিয়ে ঘরের বাইরে বেরিয়ে যেতে যেতে বলল—"মহারানিকে একটা রসালো মাছের পিস গিফট করে আসি। ফেথের মত ইনিও আবার আমার হাতে খেতেই পছন্দ করেন।"
"নো প্রবলেম।" আর্থার পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখ মুছতে মুছতে বলল,"টেক ইওর টাইম।"
"থ্যাঙ্কস"।
জ্যানেট বিড়ালটাকে নিয়ে আস্তে আস্তে বেরিয়ে যেতেই তড়িৎগতিতে চতুর্পাশটা একবার দেখে নিল আর্থার। না, কোথাও কেউ নেই। এই প্রাসাদের চতুর্দিকে সিসিটিভি ক্যামেরা রয়েছে। কিন্তু ডাইনিং হলে কোনও ক্যামেরা নেই। সম্ভবত খাওয়ার সময় মানুষ একটু প্রাইভেসি চায়। সেজন্যই কোনও ক্যামেরা বসানো হয়নি। এই সুবর্ণ সুযোগ!
আর্থার বিদ্যুৎগতিতে উঠে দাঁড়িয়ে পকেট থেকে সায়ানাইডের অ্যাম্পুলটা বের করে আনল। মুহূর্তের ভগ্নাংশে সায়ানাইড মিশে গেল জ্যানেটের গ্লাসে! সে এবার নিশ্চিন্ত হয়ে নিজের চেয়ারে বসতেই যাচ্ছিল, তার আগেই ফের একটা অস্বস্তিকর অনুভূতি! যেন একজোড়া চোখ নিষ্পলকে দেখছে তাকে। সে চোখ দুটো তার সমস্ত কীর্তি দেখে নিয়েছে। দপদপিয়ে জ্বলছে সেই চোখ। কিন্তু কোথায়!
আর্থার টের পেল সে প্রচণ্ড ঘামছে! পাগলের মত একবার এদিক ওদিক তাকাল। অসহ্য রাগে দাঁতে দাঁত পিষল সে! কোথায় সেই শয়তান! কোথায় বসে নিঃশব্দে ভয় দেখাচ্ছে! হাতের কাছে পেলে ওই নীরব, বিশ্বস্ত দৃষ্টি কেড়ে নিত ও। কিন্তু তার যে দেখাই নেই! কোথায় ফেথ?
আচমকা একটা অস্ফুট শব্দ পেয়ে পিছনে ফিরল সে! তার হৃৎপিন্ড তখন বেসামাল হয়ে উঠেছে। মনে হচ্ছে বুকে একটা অদ্ভুত যন্ত্রণা। উত্তেজনায় মুখ আরক্তিম।...
"সরি আর্থার! একটু দেরি হল।" জ্যানেট মিষ্টি হেসে হুইলচেয়ার নিয়ে এদিকেই এগিয়ে আসছে। মৃদু হেসে বলল—"হুইলচেয়ারে আসার একটাই সুবিধা। কোনও শব্দ হয় না। বেশ নিঃশব্দেই চলাফেরা করা যায়।"
আর্থারের নিঃশ্বাস প্রায় বন্ধ হয়ে আসছে। দরদর করে ঘামছে। বুকের ব্যথাটা আরও প্রবল। সে টের পেল, কেমন যেন অবশ হয়ে আসছে শরীর। চতুর্দিক যেন অন্ধকার হয়ে আসছে। শুধু কোনমতে বলল,"ফেথ?"
জ্যানেট ফের হাসল, "শিগগিরিই দেখা পাবে তার। তাড়া কীসের?"

৫

আবার একটা বিষাদঘন রাত্রি। আবার সেই চাপা কান্নার সুর! সেই ভারাক্রান্ত কান্না! দু'হাতে আপনজনকে জড়িয়ে ধরে কাঁদছে সেই মানুষটা। চোখ বেয়ে ব্যথা গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে। সে যন্ত্রণাকাতর ক্রন্দন বাগানের চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে নারকেলগাছের শিরশির শব্দের সঙ্গে। শিগগিরিই ঝড় আসবে। তারই জোরালো হাওয়ায় বাগানের গাছগুলো দুলে দুলে উঠছে।
"আই অ্যাম সরি আর্থার! আই অ্যাম সরি।" নিথর আর্থারকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে ক্রন্দনবিকৃত স্বরে বলল জ্যানেট,"তুমি এত বোকা কী করে হতে পারো? বুঝতে পারলে না যে, যে পঙ্গু মানুষটা এত বড় একটা ব্যবসা চালায়, সে অন্ধ নয়! নিজের প্রেমিকের সব খবরই সে রাখবে! কেন তুমি ক্যারোলিনের কাছে গেলে? কেন সায়ানাইডের অ্যাম্পুল কিনলে? কেন বুঝলে না যে আমি ঠিকই জানতে পারব! সব বুঝতে পারব। কেন বিশ্বাসঘাতকতা করলে? নয়তো আমিও কি তোমার স্যুপের মধ্যে...!"
"ম্যাডাম।"
এক দীর্ঘ ছায়ামূর্তির মতো জর্জ এসে দাঁড়াল তার সামনে। ওই একটি শব্দ ছাড়া তার মুখে আর কোনও কথা নেই। বাগানের অন্ধকার গায়ে মেখে দাঁড়িয়ে রয়েছে আরও তিনটে ছায়াদেহ। জেমস, জ্যাক আর মাইকেল। ওরা কোনও প্রশ্ন করে না। শুধু যন্ত্রের মত হুকুম তামিল করে। কোনও কাজে কোনওরকম খুঁত পাওয়া যায় না। আজও যাবে না।
কান্নামাখা গলায় বলল জ্যানেট,"ও আর কোনওদিন ক্যারোলিনের কাছে যাবে না জর্জ! ও এখন শুধুই আমার! আর কারও নয়...!"
জর্জ শুধু অস্ফুটে আবার উচ্চারণ করল,"ম্যাডাম!"
"ওকে ফেথের কাছেই রাখো," অশ্রুমাখা সজল চোখ তুলে তাকায় জ্যানেট,"ও ফেথের সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিল। এখনই ওদের দেখা হবে। ফেথ ওকে ভালবাসতে শেখাবে, বিশ্বস্ত হতে শেখাবে! ফেথের মতই ও আর আমায় ছেড়ে কখনও আর কোথাও যাবে না।"
ইঙ্গিতটা বুঝতে পেরেই চারজন মানুষ চৌত্রিশ বছর আগেকার ছোট্ট কবরটা খুঁড়তে শুরু করল। জ্যানেট মরদেহটাকে আস্তে আস্তে ছেড়ে দিল নিজের বাহুবন্ধন থেকে।
একটু পরেই কাজ সমাপ্ত হয়ে গেলে কবরের ওপরে মোমবাতি জ্বালিয়ে দিল জর্জ। তার আলো জ্যানেটের মুখের একপাশে এসে পড়েছে। আর একপাশ অন্ধকার।
যেন ও পাশের মুখ আঁধার দিয়েই গড়া। সেখানে কোনওদিন কোনও আলো এসে পড়েনি!

অলংকরণ: অসীম হালদার



গুম্ফার শহরে

ধূসর পাহাড়, অবিরাম গতিতে বয়ে চলা স্পিতি নদী আর অজস্র বৌদ্ধ গুম্ফা, এই নিয়েই কাজ়া। পুরনো আর নতুনের সহাবস্থান শহরের অলিগলিতে। হিমালয়ের কোলে অবস্থিত সুন্দরী কাজ়ায় প্রকৃতির অমোঘ রূপ দর্শন করলেন শান্তনু চক্রবর্তী।

কল্পা পার হতেই পথের চালচিত্র কেমন যেন বদলে গেল। আকাশ নীলে নীল, দুধসাদা মেঘের ভেলা। রুখাশুখা পাহাড়ের গা ঘেঁষা সরু একফালি পথ আর পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে খরস্রোতা স্পিতি নদী। গোটা স্পিতি ভ্যালিটাই ট্রান্স হিমালয়ান কোল্ড ডেজ়ার্ট, ভয়ংকর সুন্দর। স্পিতির উত্তরে তিব্বত আর পশ্চিমে লাদাখ। রাস্তায় জনমনিষ্যি নেই, মাঝে মাঝে ছোট ছোট জনপদ— আকপা, মোরাং, স্পোলো, পুহ, খাব, খা। ঝুরো পাহাড়ের কোলে গুটিকয়েক মানুষের বসবাস। এক সময় সবই চোখসওয়া হয়ে গেছে।
নাকোতে এসে গাড়ি থামল। গাড়ি থেকে নামতেই টের পেলাম ঠান্ডা কাকে বলে। চারিদিকে উইলো গাছের সারি, উপত্যকা জুড়ে অদ্ভুত নিস্তব্ধতা। হাংরাং উপত্যকার এই গ্রামের মূল আকর্ষণ নাকো লেক। উইলো ঘেরা গোলাকৃতি লেকে নীল আকাশের প্রতিচ্ছবি মুগ্ধ করল। পায়ে পায়ে চলে এলাম লোসটাবা। মনাস্ত্রি দেখে নিলাম। এখান থেকে নাকোর ভিউ অসাধারণ। ঠিক

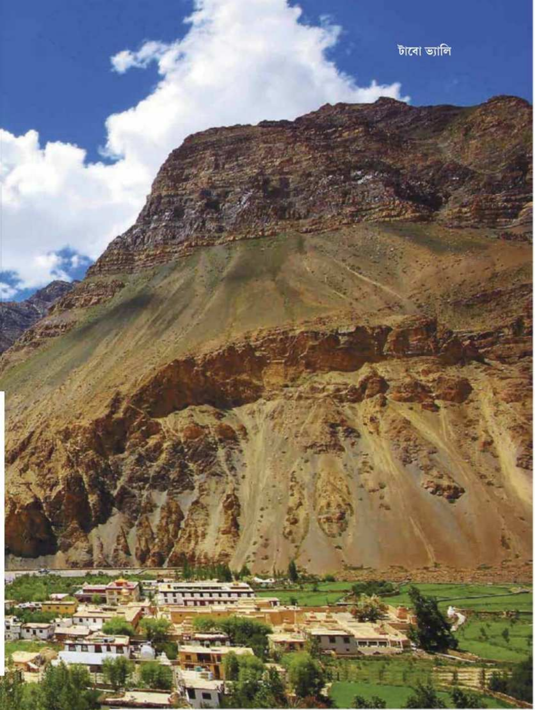


টাবো মনা



যেন কোনও জাদুমন্ত্রবলে ঘুমিয়ে থাকা এক নগরী। নাকোতে থাকার কোনও প্ল্যান ছিল না। মধ্যাহ্নভোজ সেরে আবার বেরিয়ে পড়লাম। এবারের গন্তব্য টাবো। রাস্তায় বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হল। ধ্বসপ্রবণ এলাকা, সকালেই বড় ধ্বস নেমে গিয়েছে। তাই জ্যাম। চাঙ্গো, সিলকার, সুমদো আসতেই সন্ধে নেমে এল। আর মাত্র ৫ কিমি দূরে টাবো। রাতের কালচে নীল আকাশে লক্ষ নক্ষত্রকে সঙ্গী করে টাবো পৌঁছতে রাত সাড়ে আটটা হয়ে গেল। পরদিন ভোরে টাবো দেখতে বেরিয়ে পড়লাম। রুক্ষ গেরুয়া পাহাড়, নীল আকাশের নীচে টাবোকে অনেকেই 'হিমালয়ের অজন্তা' বলে থাকেন।

প্রচণ্ড খিদে পেয়ে গিয়েছে। রেস্তরাঁয় ঢুকে খাবারের মেনুতে দেখি ইজ়রায়েলি পদের ছড়াছড়ি। চোখ আটকাল শাকশুকাতে। সঙ্গে টিবেটিয়ান ব্রেড। রেস্তরাঁর মালকিন বললেন, ''চেখে দেখতে পারেন''। 'জয়কালী' বলে অর্ডার দিয়ে ফেললাম। বিশাল ট্রেতে চলে এল শাকশুকা। পেঁয়াজ, ক্যাপসিকাম, বিনস, আলু, ফুলকপি আর মাটনসেদ্ধ। টোম্যাটো পিউরি দিয়ে ভাজা, উপরে ডিমের দু'টি পোচ। কী দারুণ স্বাদ! আজও সেই স্বাদের সুখস্মৃতি তাজা। কাজ়ায় যে ক'দিন ছিলাম, আমরা এই শাকশুকাতেই মজে ছিলাম। এখানে আকাশ ঘন নীল। মিশকালো পিচ রাস্তার ধার ঘেঁষে পিঙ্গল, ধূসর বর্ণের ন্যাড়া পাহাড়ের সারি। রুক্ষতার মাঝে সবুজের বিদ্রোহ। অনেকেই একে ভারতের 'মিনি টিবেট' বলে থাকেন। ঠিক যেন শিল্পীর নিপুণ হাতে আঁকা কোনও জলছবি। ৩৬০০ মিটার উচ্চতায় এক

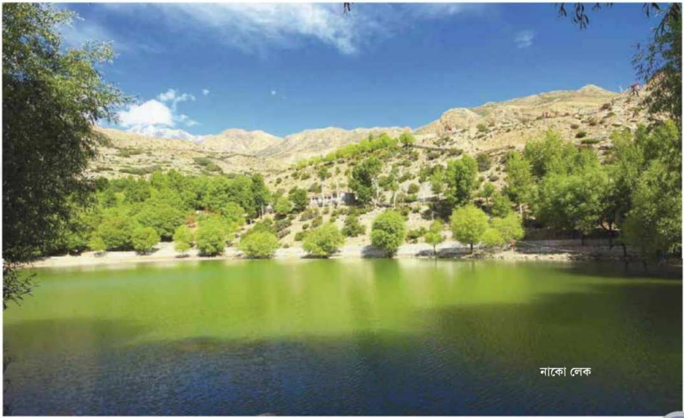


টাবো ভ্যালি

শীতল মরু পর্বতের দেশ, যা বছরের পাঁচ মাস পুরু বরফের আস্তরণে মুড়ে থাকে। টাবো, পু, সিচলিং থেকে মাত্র ৮ কিমি এগোলেই চোখে পড়বে, ধানকার মনাস্ট্রি। পিঙ্গলরঙা পাহাড়ের গায়ে আটকে আছে প্রায় এক হাজার বছরের প্রাচীন ধানকার গুম্ফা। গুম্ফার মূলত দু'টি ভাগ, লা ওড পাইলাখাং আর লোব লাবা সা খাং। অন্দরমহলের চিত্রকলা ও শিল্পকর্ম অনবদ্য। তীব্র বাতাসের দাপটে পাহাড় আর মাটির ক্ষয় অপরূপ শিল্পনিদর্শনের সৃষ্টি করেছে। সময় এখানে এসে যেন থমকে দাঁড়ায়। সংস্কারের কাজ চলার কারণে খুব ভাল করে দেখা যায়নি।
কাজ়ায় প্রবেশের অনেক আগে থেকেই সঙ্গী হয় স্পিতি নদী। পাহাড়ের গায়ে সাঁটা ছোট ছোট গ্রাম পেরিয়ে ঢুকে পড়তে পারেন কাজ়ায়। পুরো শহর আর সংলগ্ন গ্রামগুলো ঘুরে দেখতে চাইলে হাতে অন্তত দিন তিনেক সময় রাখা ভাল। এখানে আসার সেরা সময় জুন থেকে অক্টোবর মাস। এই শহরের দু'টো ভাগ আছে— কাজ়া খাশ আর কাজ়া সোমা। দুই প্রান্তেই রয়েছে নানা হোটেল। আমাদের হোটেল অবশ্য আগেই বুক করা ছিল, নতুন কাজ়ার দিকটায়। রুমে লাগেজ রেখে পুরনো কাজ়ার দিকে চললাম। বিকেল পাঁচটাতেও দেখি সূর্যের আলো প্রখর।
পুরনো কাজ়ার অলিগলির কলেবরটা ঠিক যেন তিব্বতের ফ্রেম থেকে উঠে আসা। নানা হোটেল, রেস্তরাঁ, সেলুন, হুক্কা বার, দোকানপাট, কী নেই! এত আধুনিকতার মধ্যেও কোথাও যেন পুরাতন ছাপ রেখে গিয়েছে শহরের এই প্রান্তে। দিনের চেয়ে রাতের কাজ়া আরও রোম্যান্টিক। কালচে নীল আকাশ জুড়ে তারার ভিড়। সে এক



কিব্বেরের পথে



নাকো লেক

মায়াময় পরিবেশ। তবে তীব্র হাওয়ার দাপটে বাইরে বেশিক্ষণ থাকা গেল না। রুমে ফিরে ডিনার সেরে শুয়ে পড়লাম।

পরদিন সকাল সকাল বেরিয়ে পড়লাম। পথের ধারে অনাদরে ফুটে থাকা বাহারি ফুলের ডালি সাজিয়ে আমাদের উষ্ণ অভ্যর্থনা জানাল কাজ়া। এবারের গন্তব্য শহর থেকে ২২ কিমি দূরে এবং প্রায় ৪১১৬ মিটার উচ্চতায় অবস্থিত 'কি মনাস্ট্রি'। পাহাড়ের চূড়ায় দুর্গ তথা তিনতলা গুম্ফা, বাঁদিকে অবিরাম বয়ে চলা স্পিতি নদী। তেরো শতকের গেলুকপা বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের এই গুম্ফায় ছোট, বড়, মেজো সব লামাদেরই দেখা মিলবে।



স্পিতি নদী

তবে ছবি তোলার আগে তাঁদের সম্মতি নিয়ে নেওয়া ভাল। অন্দরমহলের প্রধান আকর্ষণ বিশাল বিশাল থাঙ্কা আর ফ্রেসকো চিত্রপট। পানছেন লামার জীবনী তাতে বর্ণিত রয়েছে। সেই সঙ্গে রয়েছে প্রাচীন তানচোর গ্রন্থ, পাণ্ডুলিপি এবং নানা অপরিচিত বাদ্যযন্ত্র। সেখান থেকে চলে এলাম জিম চু, কি গুম্ফার উচ্চতম স্থান। এখান থেকে স্পিতি উপত্যকাকে অসাধারণ লাগে।

৮ কিমি উত্তর-পূর্বে অবস্থিত কিব্বের গ্রাম। কিব্বের গ্রামের বাসিন্দারা এখন চাষবাসে ব্যস্ত। প্রায় ৪২০৫ মিটার উচ্চতায় ধূসর পাহাড়ের খাঁজে অবস্থিত এই গ্রামে যাতায়াত ব্যবস্থা বলতে মোটরবাইকই ভরসা। শীতে তাপমাত্রা হিমাঙ্কের নীচে প্রায় ৪০ ডিগ্রি পর্যন্ত চলে যায়। বরফ গলে গেলে রুক্ষমাটিতে ফসল ফলানো আর পশুপালন এদের প্রধান জীবিকা। শীতে চারদিক বরফের আস্তরণে ঢাকা পড়ে গেলে এখানকার মানুষজন কাজ়ায় নেমে আসেন। কিব্বের থেকে এবার আরও চড়াই পেরোতে হবে। পাকা রাস্তা না থাকলেও এ রাস্তায় গাড়ি চলে। গাড়ি স্টার্ট নিতেই দূরের কিব্বের ছোট হতে হতে একেবারে উধাও হল। পাহাড় আরও রুক্ষ, নির্জন রূপ ধারণ করল। মাঝে মাঝে কিছু মেষপালক ছাড়া কোথাও জনমনিষ্যি বা জনপদের দেখা পেলাম না। গাড়ি চলতে লাগল পাহাড় ভেঙে। কনকনে হিমেল বাতাসকে সঙ্গী করে আরও ২০ কিমি অতিক্রম করার পর অবশেষে পৌঁছলাম 'গেটে'-তে। ৪২৭০ মিটার উচ্চতায় অবস্থিত অদ্ভুত নামের এই গ্রামটির বাসিন্দা সর্বসাকুল্যে মাত্র ২টি

কীভাবে যাবেন

কলকাতা থেকে ট্রেনে বা বিমানে দিল্লি বা চণ্ডীগড় থেকে মানালি হয়ে বাসে বা গাড়িতে সরাসরি কাজ়া আসা যায়। মানালি থেকে কাজার দূরত্ব ২১০ কিমি।

কোথায় থাকবেন

কাজ়ায় থাকার প্রচুর হোটেল। ল্যাংজ়া, হেকিম, কিব্বেরে থাকার হোমস্টে রয়েছে।

পরিবার। একর একর জমি আর পাহাড় আগলে পড়ে আছেন তাঁরা। খেত বলতে শুধু ভুট্টা। আর কিছু শাক সবজির ফলন হয়। মোবাইল টাওয়ার নেই। বাঁচতে গেলে যে নূন্যতম সামগ্রীর প্রয়োজন, তার সবকিছুও নেই। সম্বল বলতে পাথরের ঘর। গেটে সফর শেষে ফিরে এলাম কাজ়ায়।

তৃতীয় দিন কাজ়া থেকে বেশ ভোরে রওনা দিলাম। রোদ ঝলমলে আকাশ আর দু'পাশে বরফিলা পাহাড়কে সাক্ষী রেখে মসৃণ পথ ধরে গাড়ি ছুটল ল্যাংজ়া গ্রামের উদ্দেশ্যে। মূল শহর থেকে প্রায় ১৫ কিমি দূরে ১৪০০০ ফুট উচ্চতায় অবস্থিত এই গ্রামকে মালভূমিও বলা চলে। চারদিক ঘিরে আছে বাদামিরঙা পাহাড়, তাদের মাথায় আধখাওয়া কুলফির মতো বরফের আস্তরণ মুকুটের মতো শোভা পাচ্ছে। উপত্যকার মাঝে বিশাল বুদ্ধের ধ্যানস্থ মূর্তি, দেখলে মনে হবে তাঁর সজাগ দৃষ্টি এই গ্রামের



ল্যাংজ্বা গ্রাম



কাজ়া মনাস্ট্রি

দিকেই নিবদ্ধ। প্রায় ৩০-৪০টি পরিবারের বাস এখানে। আশেপাশে রয়েছে প্রচুর ফসিল। এগুলো দেখতে ভুলবেন না। ল্যাংজ্বাকে বিদায় জানিয়ে এগিয়ে চললাম। আরও ১৫ কিমি অতিক্রম করার পর পেলাম ১৫০০০ ফুট উচ্চতায় স্থিত কমিক গ্রাম। এই গ্রামের মূল আকর্ষণ শাক্য তাংইয়ুদ গুম্ফা। পৌঁছে দেখি ভগবান বুদ্ধের পুজো চলছে সেখানে। শনশনে হাওয়ায় গুরুগম্ভীর মন্ত্রধ্বনি পিঙ্গলবর্ণা পাহাড়ের গায়ে অনুরিত হয়ে সৃষ্টি করেছে এক স্বর্গীয় পরিবেশের। কাছেই সুন্দর রেস্তরাঁতে ঢুকলাম। নীল আকাশে সাদা মেঘের ভেলা দেখতে দেখতে ভাত, ডাল, আলু-ফুলকপির সবজি আর চাটনি দিয়ে মধ্যাহ্নভোজ সারলাম।

এবার যাব হিকিম গ্রাম। উচ্চতা ১৪০০০ ফুট। বিশ্বের উচ্চতম ডাকঘরটি এখানেই অবস্থিত। পোস্টমাস্টারের কাছ থেকে পোস্টকার্ড কিনে তখনই পোস্ট করলাম। আমার মত অনেকেই যাঁরা চিঠি লেখার অভ্যেস হারিয়ে বসেছেন, হিকিমের এই পোস্ট অফিসের সামনে দাঁড়িয়ে প্রিয়জনকে চিঠি পোস্ট করুন। এ এক অমূল্য উপহার।

এবার আবার কাজ়ায় ফেরার পালা। পরদিন ভোরবেলায় সুন্দরী কাজ়াকে বিদায় জানিয়ে ফিরে এলাম মানালিতে।

ছবি: লেখক



চুল তার কবেকার...

বনলতা সেন যে আপনাকে হতেই হবে তার কোনও মানে নেই। কিন্তু একঢাল রেশমি চুলকে মনের মতো সাজিয়ে তুলতে ক্ষতি কী? সাবেকি ফুলের সাজ থেকে ট্রেন্ডি হেয়ার অ্যাকসেসরিজ় দিয়ে গরমের কয়েকটি ফ্যাশনেবল হেয়ারস্টাইল শেখালেন তিতাস চট্টোপাধ্যায় ও সৌমী ঘোষ।



উৎসবের সাজ

লম্বা চুলে পরিপাটি হাত-খোঁপা। বেলফুলের মালা আর খোঁপার কাঁটায় সাবেকি সাজ। লাল শাড়ি এবং সোনার গয়নার সঙ্গতে উৎসবের আমেজ।

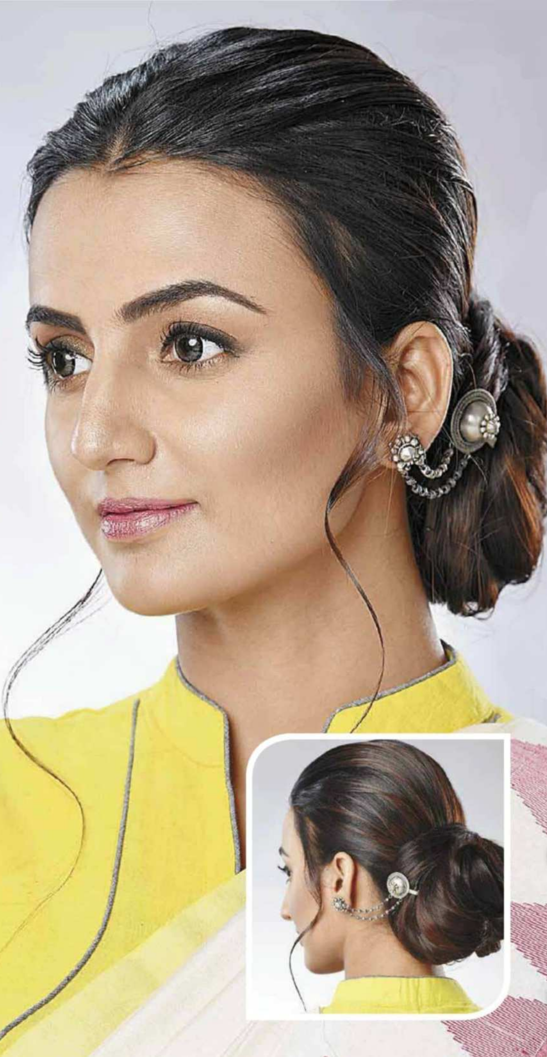
শাড়ি: অরণ্য, দক্ষিণাপণ
ফোন: ০৩৩ ২৪২৩৬০১১
গয়না: গহনে
ফোন: ৯৪৩৩১৪৬৭৬৯



ব্রাঞ্চ মিট

লম্বা চুল ফ্রেঞ্চ রোল করে খোঁপা করা। পিঙ্ক রঙা শর্ট ড্রেসের সঙ্গে রং মিলিয়ে মাথায় বো-ব্যান্ড। সামনে সাইড পার্ট করে ব্যাংস। ব্রাঞ্চের সাজে আদর্শ।

পোশাক:
ওয়েস্টসাইড,পার্ক স্ট্রিট



সকালের সাজে

হালকা সাজে চুলে ইনওয়ার্ড রোল করে খোঁপা। সঙ্গে রুপোর টানা দুল নজর কাড়বেই। সিম্পল অথচ ট্রেন্ডি লুকে সাজ সম্পূর্ণ।

শাড়ি: কমলা
ফোন: ২২৮২০৭৬৩
ব্লাউজ়: অরণ্য, দক্ষিণাপণ
গয়না: করিশমা
ফোন: ৯০৩৮৭৪৫৭৪৮

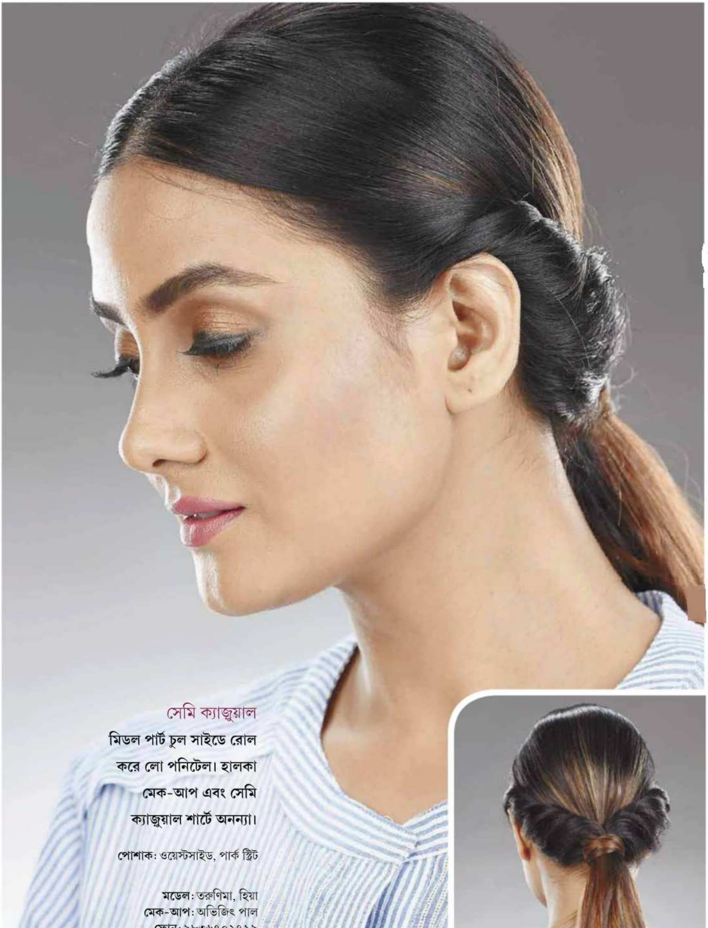


পার্টি লুক

সামনের চুলে ফ্রেঞ্চ ব্রেড করে ক্যাজুয়াল টপ বান। ফ্লোরাল হেয়ার অ্যাকসেসরিজ়ের ব্যবহারে গ্ল্যামারাস লুক।

পোশাক: নিভৃতি
ফোন: ৯৮৩৬০৮৯৩৫৫
ই-মেল:
nivriti_16@hotmail.com





সেমি ক্যাজুয়াল

মিডল পার্ট চুল সাইডে রোল করে লো পনিটেল। হালকা মেক-আপ এবং সেমি ক্যাজুয়াল শার্টে অনন্যা।

পোশাক: ওয়েস্টসাইড, পার্ক স্ট্রিট

মডেল: তরুণিমা, হিয়া
মেক-আপ: অভিজিৎ পাল
ফোন: ৯৮৩৬৭০২৭১৯
ছবি: সোমনাথ রায়

সলিড v/s স্ট্রাইপস

কাকে ছেড়ে কাকে দেখব! ফ্যাশন ক্যানভাসে রং, রেখা, প্যাটার্নের এমনই জ্যামিতিক বিন্যাস। কখনও এক রঙের খেলা, কখনও আবার অ্যাসিমেট্রিক্যাল স্ট্রাইপের মায়াজাল। সাহসী পোশাক ও মেক-আপে দুরন্ত স্টাইল স্টেটমেন্ট। আপনার পছন্দ বেছে নিন।



পোশাক জুড়ে ভার্টিক্যাল স্ট্রাইপসের খেলা। নীল, সাদা, হলুদ, সি-গ্রিন আর গোলাপির ঝলমলে কম্বিনেশনে স্ট্র্যাপি জাম্পস্যুট। ভিড়ের মাঝে স্ট্যান্ড আউট করার জন্য পারফেক্ট!

পোশাক: ওয়েস্টসাইড, পার্ক স্ট্রিট



মনে সাহসের অভাব
নেই। পোশাক এবং
কালার প্যালেট
যেন সেই সাহসেরই
প্রতিচ্ছবি। কটকটে
কোরাল রঙের
বডিসুটে লাস্যময়ী।

পোশাক: নিভৃতি
ফোন: ৯৮৩৬০৮৯৩৫৫
ই-মেল: nivriti_16@hotmail.com



কালারফুল সামার সিলুয়েট। লাল কাফ লেংথ ফ্লেয়ার্ড প্যান্টসের সঙ্গে ভাইব্র্যান্ট নিওন গ্রিন অ্যাসিমেট্রিক্যাল টপ। হেমলাইনে রাফলসের ঢেউ।

পোশাক: নিভৃতি



পোশাক জুড়ে নানা রং আর প্যাটার্নের খেলা। পিচ, বেজ, মেরুন আর সাদার কম্বিনেশনে নি-লেংথ শিফট ড্রেসে বোট নেকলাইন।

পোশাক: ওয়েস্টসাইড, পার্ক স্ট্রিট



কালো আর নীলের
গর্জাস কম্বিনেশন।
ঘন নীল কাফ লেংথ
লেয়ার্ড জাম্পস্যুট।
উপরের অংশে ক্রিসক্রস
ডিজ়াইন। কাট অ্যান্ড
স্টাইলের দারুণ কেমিস্ট্রি।

পোশাক: নিভৃতি



সলিড কালার আর অ্যাবস্ট্র্যাক্ট প্যাটার্নে অ্যাসিমেট্রিক্যাল বক্সি টপ। লাল, নীল আর সাদার কালারফুল কম্বিনেশন। টিম-আপ করা হয়েছে সিম্পল ব্ল্যাক ডেনিমের সঙ্গে।

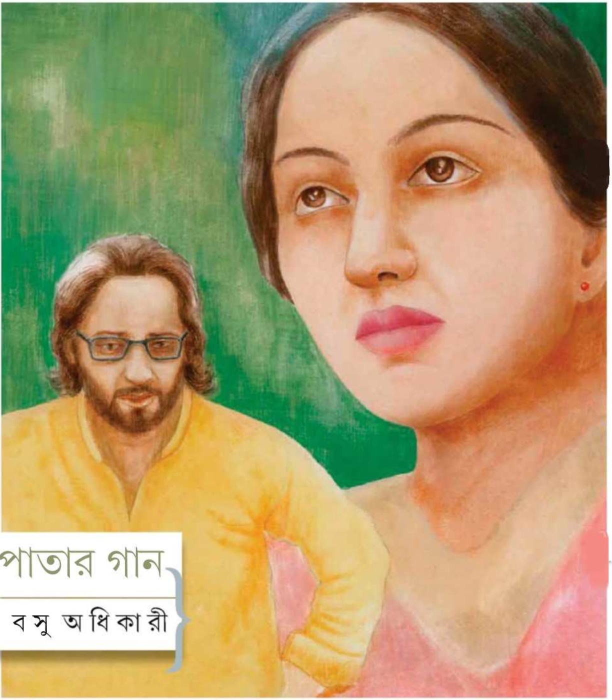
পোশাক:
ওয়েস্টসাইড, পার্ক স্ট্রিট



ডাংরির আদলে স্ট্র্যাপি জাম্পসুট। অল ওভার লাল, নীল, সাদা স্ট্রাইপস। টিম আপ করা হয়েছে লাল রঙের সিম্পল টি-শার্টের সঙ্গে।

পোশাক:
ওয়েস্টসাইড, পার্ক স্ট্রিট

মডেল: দময়ন্তী
মেক-আপ: অভিজিৎ পাল
ফোন: ৯৮৩৬৭০২৭১৯
ছবি: সোমনাথ রায়



ঝরা পাতার গান

রাজশ্রী বসু অধিকারী

আজ সকাল সকাল চলে এসেছি স্কুল থেকে। এখনও চারটে বাজেনি। রোদের রং কিছুটা ঘন হয়েছে সবে। আমার টেবলের পাশের জানলা দিয়ে যে ঢেউয়ের মতো স্তরে স্তরে সুবিস্তীর্ণ বালুকারাশি দেখা যায়, তার মাথায় মাথায় সবেমাত্র সোনালি আলোর ছটা লেগেছে। এই স্কুলবাড়িটা একেবারে মহানন্দা নদীর চড়ার উপরে বলা যায়। নদীটা মরতে মরতে বালির চড়ায় এসে প্রায় মিলিয়ে গেছে। একটা রুরাল ডেভলপমেন্ট প্রোগ্রামে গোটা রাজ্যে একদফায় বাহান্নটা এরকম স্কুল তৈরি হয়েছে কয়েক বছর হল। স্কুলটা শিলিগুড়ি শহর থেকে প্রায় পঁচিশ কিলোমিটার উত্তরে একটা সেমি রুরাল অঞ্চলে। পাহাড়ঘেঁষা, জঙ্গলেঘেরা জনপদটিকে উন্নত করে তোলার প্রশাসনিক পদক্ষেপ হিসেবেই এই স্কুল। আর আমি সেই বিরল ভাগ্যবানদের একজন, যারা ক্যাজুয়াল হিসেবে জয়েন করার পর রেগুলার হতে পেরেছে। প্রথমে চাকরিটা জাস্ট দরকার ছিল বলেই করতে এসেছিলাম। আমার চেনা পরিবেশটা থেকে পালাতে চেয়েছিলাম ভীষণভাবে। একা মানুষ, ভাল না লাগলে শিফট করে যাব অন্য কোথাও, এরকমই একটা মতলব ছিল। কিন্তু এখানকার পরিবেশ আমায় আটকে দিল। পড়াতে আমার বরাবরই ভাল লাগে। গেম টিচার হওয়া সত্ত্বেও তাই মাঝে মাঝে শখ করে দু'একটা ক্লাস নিই। আর নদীর ধারের এই অনন্য দৃশ্য! এটা আমার মাইনের চেয়ে অনেক বেশি। দু'বছরের মধ্যে আর কোথাও যেতেও পারলাম না। তাছাড়া হেডস্যারের একটু স্নেহও রয়েছে আমার উপর। সেই সুবাদে টিচার্সরুম থেকে দূরে একটা ফাঁকা ঘর নিজের মতো ব্যবহার করতে পারি। সহকর্মীরাও ভালইবাসে। সেই অর্থে কোনও সমস্যাই নেই। এখানে বসে নিজের মনে বালির স্তূপের আড়ালে সূর্যকে ডুবে যেতে দেখাটা আমার নেশার মতো হয়ে গেছে প্রায়। আর সেই সঙ্গে নিজের ছোটখাটো লেখালিখি, মনের সঙ্গে কাটাকুটি খেলা,

যা আমাকে অনেক বড় কোনও শৃঙ্গে মানসভ্রমণ করিয়ে আনে। কিন্তু অন্যদিন যা আমি দুই চোখ দিয়ে গোগ্রাসে গিলি, আজ আর সেই মানসভোজের অপেক্ষায় থাকতে পারলাম না। তড়িঘড়ি ওদিকের পাট চুকিয়ে, খাতাপত্র সব আলমারিতে বন্ধ করে বেরিয়ে পড়েছি অনেক আগে থাকতে। আজ আমার একটা বিশেষ অ্যাপয়েন্টমেন্ট রয়েছে। তার জন্য গত একমাস ধরে মনে মনে তৈরি হয়েছি, গত সাতদিন ধরে ঘরবাড়ি সাজিয়ে তুলেছি। এবার আমার নিজেকেও একটু সাজিয়ে তোলার পালা। যতই আমি বিবাগী বাউলের দিনযাপন করি না কেন, আজ এই বিশেষ মুহূর্তে নিজেকেও একটু বিশেষ করে উপস্থাপন করার লোভ সামলানো গেল না। আর এই যে আমি ডেরায় ফিরে সারা বিছানা জুড়ে ধোপদুরস্ত চুড়িদার আর পাঞ্জাবি, জিনস আর টি-শার্ট ছড়িয়ে ফেলে মনস্থির করতে পারছি না কোনটা পরব, এটাও বেশ নতুন রকম লাগছে। মনে হচ্ছে বেশ অনেকটা বেঁচে আছি। ইচ্ছে করছে এমন ভাবে দাঁড়াই কারও সামনে সে যেন চোখ না ফেরাতে পারে। এটাও বেশ অনেকখানি বেঁচে থাকা, বেঁচে ওঠা। মহুয়া, মহুয়া, মহুয়া, আমায় তুমি কীভাবে এমন বাঁচিয়ে তুললে? এই অসম্ভব কি একদিনে হল? সে খতিয়ান এভাবে দেওয়া সম্ভব নয়। আমি শুধু ফিল করছি এই টুকরো টুকরো ইচ্ছেগুলো মিলিয়ে আমি বেঁচে উঠছি, ভীষণভাবে বেঁচে উঠছি। পর্ণা চলে যাওয়ার পর থেকে পাঁচ বছর ধরে তো মরেই ছিলাম। এক একটা দিন একটু একটু করে মৃত্যুর পর মৃত্যু জমতে জমতে আমি যেন ফসিল হয়ে উঠেছিলাম। প্রথমদিকে নিরুচ্চারিত প্রশ্নরা ঘিরে থাকত আমাকে। বিয়ের মাত্র একমাসের মধ্যে যেভাবে পুরনো প্রেমিকের হাত ধরে চলে গিয়েছে পর্ণা তাতে একরাশ ঘৃণা এসে প্রায় স্তব্ধ করে দিয়েছিল আমার জীবনযাত্রা। না, পর্ণার প্রেম নিয়ে কিছু বলার ছিল না আমার। বোবা হয়ে থেকে গেছি ওর প্রতারণায়। সম্বন্ধের বিয়ে হলেও জীবনের প্রথম নারীকে আমার সবটুকু ভালবাসা দিয়েই আপন করে নিয়েছিলাম। তাই বার বার আমার মনে হয়েছে, ও তো আমায় বলতে পারত সব খুলে। আমি কখনওই অনিচ্ছুক মানুষকে জোর করে বেঁধে রাখতাম না। সেই নীচতা আমি ভাবতেও পারি না। বরং পর্ণা চলে যাওয়ার পর থেকে যত আমি বিগত তিরিশ দিনের ছবিগুলো ভেবেছি ততই লজ্জায় গুটিয়ে গিয়েছি। আমার অপটু হাতের আঁকা রঙিন ছবিগুলোয় যেন কালি ঢেলে দিয়ে গেছে পর্ণা।
তারপর তো অগ্নিসাক্ষী করা বিয়ের পাকাপাকি আইনসম্মত ভাঙন ধরাতে নির্দিষ্ট সময় লেগেছে। আর সেইসব দিন থেকে বহুদিন পর্যন্ত আমার মনের তলায় একটাই প্রশ্ন উঁকি দিয়েছে, কেন এই বিয়েটা করেছিল পর্ণা। কী দরকার ছিল আমার সাদাখাতাটায় কালি ঢালার। একটা সময়ে ওপরের ঢেউ থেমেছে। এসেছে নিস্পৃহতা। সবই চলছিল নিয়মমাফিক। শুধু আমার ট্রান্সপোর্টের ব্যবসাটা আর দাঁড় করাতে পারলাম না। সব ছেড়ে দিয়ে বসে ছিলাম ঘরে। শুধু আমার বইগুলো সম্বল ছিল। তারপর একদিন কি মনে হল চেনা পৃথিবীটার বাইরে বেরিয়ে যেতে ইচ্ছে করল। হয়তো অচেনা পরিবেশে আমার এই লুকোনো পরাজয়বোধটা কেটে যাবে। চাকরির চেষ্টা করতে লাগলাম এবং বেশ কিছু পাশ-ফেল, পাওয়া না পাওয়া পেরিয়ে এই নদীর চড়ার স্কুলে এসে আটকে গেল আমার মন। কাজ এবং জায়গাটা আমার ভাল লেগে গেল। আর এখন এই এক বছর ধরে তো বোধহয় সম্পূর্ণ নতুন কেউ বাসা বেঁধেছে এই শরীরের কাঠামোয়। কবে যে আবার ফসিলের গায়ে সবুজ পাতা গজিয়েছে তা আমিও টের পাইনি। কিন্তু এখন আপাতত আমার সময় নেই মোটেই। খুব তাড়াতাড়ি তৈরি হতে হবে আমাকে। তারপর গিয়ে দাঁড়াতে হবে নির্দিষ্ট জায়গায়। হাইওয়ে ধরে বাঁ দিকে প্রায় হাফ কিলোমিটার এগিয়ে রাস্তাটা যেখানে হঠাৎ মেঘ করে আসা কালো আষাঢ়ের চাঁদোয়ায় ঢাকা পড়ে গিয়েছে যেখানে, সেখান থেকেই আবার বাঁ দিকে মাইলের পর মাইল জুড়ে সেই চাঁদোয়ার এক্সটেনশন। খানিক এগিয়ে সেই মরা নদীর ওপরে ঝুলন্ত বাঁশের সাঁকো। সেই সাঁকোয় ওঠার মুখে গুলজারিয়ার চায়ের দোকান। দোকান না বলে ঝুপড়ি বলাই ভাল। কার জন্য কেন যে মেয়েটা ওখানে চুলা জ্বালিয়ে চায়ের কেটলি চাপিয়ে সারাদিন বসে থাকে কে জানে! কিছু কনট্রাক্টরের লোকজন আর কদাচিৎ এসে পড়া মিলিটারি গাড়ির সওয়ারি ছাড়া আর কোন খদ্দের নেই বললেই চলে। আর একমাত্র আমাকেই গুলজারিয়ার নিত্য খদ্দের বলা যায়। আগে শুধু সন্ধের সময় আসতাম। এখন সকালে বা ক্লাস না থাকলে দুপুরের দিকেও চলে আসি। এই শুকনো নদী, বাঁশের সাঁকো, এই চায়ের ঝুপড়ি নতুন পৃথিবী খুলে দিয়েছে আমার মোটা পাওয়ারের লেন্সের ভিতরে। মনে হয় আমি এই পৃথিবীর একলা অধীশ্বর।
মাথার ওপরে মেঘের চাঁদোয়া তৈরি করেছে যে গাছগুলো, তাদের সবার নাম আমি জানি না। শুধু শালগাছ চিনি। হাইওয়ের দু'পাশে যে গভীর বনানী শুরু হয়েছে তাতে আরও অনেক অসংখ্য প্রজাতির গাছ রয়েছে। আমার প্রবল ইচ্ছে এদের সঙ্গে পরিচিত হই। একটা একটা করে চিনে নিই প্রতিটি গাছের মান-অভিমান, প্রেম ও চোখের জল। কিন্তু গত এক বছরে সেই স্টেপটা নিয়ে ওঠা হয়নি। শুধু নির্নিমেষ মুগ্ধতা নিয়ে তাকিয়ে আছি আর অপেক্ষা করছি। অপেক্ষা, কারণ মহুয়া যেচে পড়ে এই দায়িত্বটা নিয়েছে। বোটানির লেকচারার মহুয়া। আমার চোখে ওর চেয়ে ভাল কেউ জানে না উদ্ভিদজগতের রহস্য। আমি প্রাইমারি স্কুলের সাধারণ গেম টিচার। কবে কখন আমার বোটানির ডক্টরেট প্রেমিকা এসে আমায় গাছ চেনাবে, আমি সেই অপেক্ষায় আছি। ততদিন শুধু ভালবেসে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকা গাছের শরীরে হাত ছুঁয়ে যাব। মহুয়া আমার প্রেমিকা? সত্যিই প্রেমিকা? আমার কাছে যে উদগ্রীব যন্ত্রণায় প্রেম আসে প্রতিমুহূর্তে, আমাকে বিদ্ধ করে, রক্তাক্ত করে, মেরে আবার বাঁচিয়ে তোলার অনাবিল খেলায় ক্রমাগত নিঃশেষ করে, আকাশ ভরে হাসায় আবার বন্যা প্লাবনে কাঁদায়, ভিজিয়ে দেয় আমার বিছানার চাদর, নড়বড়ে কাঠের জানলা, লেখার টেবিল, পাঞ্জাবির কোন অথবা চোখের কোল, মহুয়া কি কখনও কোনওদিন পেয়েছে তার আস্বাদ? এই এইসব দুর্মূল্য অনুভূতির সম্মিলিত নামই কি প্রেম? আমি জানি না। মহুয়া আমায় নতুন জীবন দিয়েছে। পর্ণার তৈরি ফসিলের দেহে সে সবুজ কুঁড়ি ফুটিয়ে তুলেছে। সে আমায় অন্ধকার গুহা থেকে টেনে এনেছে এক অনির্বচনীয় আলোর আকাশে। কিন্তু এটা আমার একার ভাবনা। আমি মহুয়ার মন জানি না। সে আমায় আজও পর্যন্ত কখনও বলেনি ভালবাসি। শুধু দুই হাতে চাঁদের আলো ধোওয়া হাসি মেখে বহুদূর থেকে পাখির ডানা মেলা চোখ তুলে তাকিয়ে থেকেছে আমার দিকে, আর অনেকটা সুর ভাসিয়ে দিয়েছে হাওয়ায় আমার দিকে, মাঝে মাঝে গেয়ে উঠেছে এমন গান যার নোটেশন আমি আজও পাইনি। বার বার চেয়েও পাইনি। শুধু পাব এমন আশ্বাস পেয়েছি।
আজ মহুয়া আসবে। আজ ঠিক একবছর পূর্ণ হল আমাদের প্রথম দেখার। গত বছর ১৪ অক্টোবর সে হঠাৎ এসে পড়েছিল। অতর্কিতে পা রেখেছিল আমার একলা সাম্রাজ্যে। আর আজ সে আমার জন্যই আসবে। এই এক বছর ধরে গড়ে তোলা প্রাসাদের উদ্বোধন করতেই সে আজ আবার এসে দাঁড়াবে জঙ্গলের ভিতরে গুলজারিয়ার চায়ের ঝুপড়ির সামনের সাঁকোয়।
অধৈর্য হাতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ফেলছিলাম জামাকাপড়গুলো। আসলে মনস্থির করতেই পারছি না কোনটা পরব। অনেক ভেবে একটা ডিমের কুসুম রং পাঞ্জাবি আর ফেডেড ব্ল্যাক প্যান্ট পরে ফেলি। আমার ঘাড় অবধি চুলগুলো যত্ন করে পনিটেল করব এমন সময় উঠোনে ঘড়ঘড় আওয়াজ। বুঝতে পারি অলোকেশ এসে গিয়েছে। আমার কলিগ অ্যান্ড ওনলি ফ্রেন্ড। দাড়িটা আঁচড়ানো আর চশমাটা পরে নেওয়া হয়েই গিয়েছিল। বেড়িয়ে এসে হাত বাড়াই, "দে..."
অলোকেশ বলাই বাহুল্য চমকায়, "কী রে? কী দেব?"
"বাইকের চাবিটা দে। "

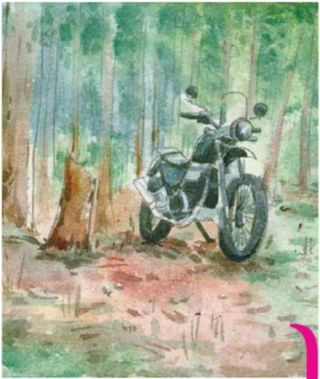
"তুই চালাবি?"
"আঃ ... আমি যাব। তোকে রিং করলে তুই আসবি..."
"আমি যাব না?'' বেশ অবাক হয় প্রিয় বন্ধুটি। ওর হাত থেকে চাবিটা নিয়ে ওকে দাঁড় করিয়ে দিয়ে আমি চেপে বসি বাইকে।
"এত অবাক হওয়ার কী আছে? দেখছিস তো একটা কাজে যাচ্ছি। সব জায়গায় তো আর তোকে নিয়ে যাওয়া যায় না।''
"আচ্ছাআআআ... আর এতদিন ধরে কুরিয়ার সেন্টারে কে গিয়ে গিয়ে চিঠি ড্রপ করল? আর আমি একবার দেখব না?"
"ভাগ্যে থাকলে দেখতে পাবি। এখন সামনে থেকে ফুটে যা, দেরি হচ্ছে,'' স্টার্ট লাগিয়ে এগিয়ে যেতে যেতে বলি আমি।
"ফোনটা খেয়াল রাখিস... '' চেঁচিয়ে বলে অদৃশ্য হয়ে যাই আমি। হাতে সময় বেশি নেই। আমাকে যে করেই হোক আগে পৌঁছতে হবে। মহুয়া ওয়েট করে থাকতে একটুও ভালবাসে না।
আমাকে খ্যাপা ষাঁড়ে তাড়া করেছিল বোধহয়। অতখানি রাস্তা পনেরো মিনিটের আগেই পৌঁছে গেলাম। পাঁচটা বাজতে বেশ কিছুক্ষণ বাকি এখনও। জঙ্গলের দেওয়াল বেশ ঘন হয়ে এসেছে রাস্তার দু'ধারে। বড়সড়ো একটা বটগাছের তলায় বাইকটা স্ট্যান্ড করাই। এখান থেকে বাঁয়ে নামতে হবে। বাকিটা হেঁটে যাব। এখানে চুরি হয় না। সারারাত পড়ে থাকলেও এই বাইকে কেউ হাত ছোঁয়াবে না। প্রথম প্রথম আমার ভারী অবাক লাগত। শহুরে মানুষ আমরা, চুরি ছিনতাই-এর সঙ্গে নিত্য সহবাস। নিজের নিজের সম্পত্তি আগলাতে আগলাতেই অর্ধেক জীবন পার করে দেওয়া অভ্যেস। কিন্তু এই ক'বছরে আমার স্বভাব পালটে গেল। চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে নিশ্চিন্তে নির্ভাবনায় থাকার অভ্যেস করে ফেলেছি। এখানকার মানুষ চুরি শব্দটাই জানে না। খুব ভাল ছিলাম। কিন্তু একজন অনুপ্রবেশকারী এসে কী করে আমার খুলে রাখা হিজিবিজি কাটা সাদা পাতার মনটাই বেমক্কা চুরি করে নিয়ে গেল! বিনিময়ে কী পাব, আদৌ কিছু পাব কি না তা যতক্ষণ না জানতে পারছি ভিতরটা অস্থির হয়েই থাকছে। আজ নিশ্চয়ই চোর ধরা দেবে বমাল সমেত। আমার মাথায় কল্পনাকেন্দ্রে সূক্ষ্ম তারের আলপনা কেটে একঝলক ভেসে যায় কাজল টানা চোখের গম্ভীর চাহনি। পায়ের তলায় বিছিয়ে থাকা শুকনো পাতার প্রাকৃতিক কার্পেটে মচমচ শব্দ তুলে এগিয়ে যাওয়া স্পোর্টস শু-এর অস্থির তাড়না আমায় অবশেষে জঙ্গলের শুঁড়ি পথ ধরে গুলজারিয়ার চায়ের ঝুপড়ির সামনে দাঁড় করায়।

হাতে সময় বেশি নেই। আমাকে যে করেই হোক আগে পৌঁছতে হবে। মহুয়া ওয়েট করে থাকতে একটুও ভালবাসে না।



"এই যে ... চা ... হাওয়াবাবু ..."
কী আশ্চর্য! মেয়েটা হাত গুনতে জানে নাকি? এসে দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গেই আমার জন্য স্পেশ্যাল করে তুলে রাখা বিশাল লম্বা মোটা সাদা কাপে ভর্তি ধোঁয়া ওঠা চা এগিয়ে ধরল। এই কাপটাতেই রোজ চা দেয় আমাকে ও। এটা আমার জন্যই কিনেছে। সেটা একদিন বলেও ছিল।
"কি করে বুঝলে আমি আসব এখন? চা করেই রেখেছিলে?" ঝুপড়ির সামনে বাঁশের কঞ্চি দিয়ে তৈরি বেঞ্চের ওপর বসে আয়েস করে একটা চুমুক দিয়ে বলি আমি।
"কেমন মনে হচ্ছিল গো ... গাছগুলা বলল, নদীখান ও বলল, হাওয়াবাবু আসতেছে ...,'' ঝকঝকে সাদা দাঁত বের করে হাসে মেয়েটা। এইরকমই কথা ওর। চাপা নাক, হলদেটে গায়ের রঙ আর ঝুঁটি করে বাঁধা একঝুড়ি লালচে চুল, গায়ের হলুদ সবুজ বাকু ... সব মিলিয়ে কোথায় যেন একটা অস্ফুট শিক্ষার ছাপ আছে। আছে একটা নিজস্ব সেন্স অফ লিটারেচার, যা কোনও কেতাবি শিক্ষা নয়, একেবারেই ওর নিজস্ব বোধ। তাই ওর সঙ্গে দু'চারটে কথা বলা যায়। আমার মনে হয় এই চায়ের দোকান চালানোর চেয়ে অনেক অন্য কিছু কাজ ও করতে পারত। একদিন বলেওছিলাম সে কথা। তাতে হেসে হেসে যা বলেছিল তাতে চমকে গিয়েছিলাম। বলেছিল ওকে রোজ না দেখতে পেলে নাকি এই জঙ্গল এই নদী কান্নাকাটি করবে। এরকম জবাবের পর থেকে আমারও মনে হয়েছে গুলজারিয়ার চা ঝুপড়ি ছাড়া এই জঙ্গল অসম্পূর্ণ। কিন্তু একটা প্রশ্ন আমার মনে তবুও থেকেই গিয়েছে। তারই পুনরাবৃত্তি করি চা খেতে খেতে।
"তুমি কেন আমাকে হাওয়াবাবু বল গুলজারিয়া?''
আমার সামনে মাটির ওপর থেবড়ে বসে একগাদা আলু পটল কাটছিল মেয়েটা। একবার চোখ তুলেই নামিয়ে নেয়, "হাওয়ার মতো আসলা যে তুমি ... হুউউউই বালাশোন নদ পার কইরে এক্কেবারে মহানন্দার পার দিয়ে শন শন শন শন... বাপ গোওওও... কি হাওয়ার তেজ বলতো!'' আলু কাটতে কাটতে নিজের মনে বলে যায় গুলজারিয়া। আমি যার কোন মাথামুণ্ডুই বুঝতে পারি না, আর আমার এখন বোঝার মনও নেই। মোটামুটি একটা ধরে নিই, রোজ সকালে হাইওয়েতে দৌড় প্র্যাকটিস করি আমি, ঝড়ের মতো ছুটে যাই মাইল মাইল। হয়তো সে জন্যই এই নাম দিয়েছে ও। আর আমার সৌম্যজিত নামটা ওর পক্ষে দাঁত ভাঙাও বটে। রাস্তার দিকে তাকাতে তাকাতে আনমনে পকেট হাতড়ে পয়সা বের করি। খুচরো নেই। একটা দশটাকার নোট বাড়িয়ে ধরি ওর দিকে, "এই নাও।''
"আজকে তুমি দিবা না হাওয়াবাবু। রাইখে দাও...''
আমার মন এতটাই অবশ হয়ে রয়েছে যে, কেন আজ চায়ের দাম দেব না এটাও জিজ্ঞেস করা হয় না। নোটটা পকেটে ঢুকিয়ে সাঁকোটার দিকে এগিয়ে যাই।
না, এখনও আসেনি কেউ। আর এলে রাস্তার দিক দিয়েই আসবে। আমি তো দেখতেই পেতাম তাহলে। বাঁশের রেলিং ধরে ঝুঁকে ঝুঁকে দেখে নিই নীচে নদীর চড়ায় দেখা যায় নাকি কোনও সবুজ শাড়ির আঁচল। আমার কেন যেন মনে হয় মহুয়া এই জঙ্গলে এলে সবুজ শাড়ি পরেই আসবে। কবে কখন একদিন ও এসেছিল এখানে, সেদিন ও সবুজ শাড়ি পরেছিল। তারও প্রায় মাস তিনেক পরে কবে একদিন কথা প্রসঙ্গে ও বলেছিল, জঙ্গলে গিয়ে জঙ্গলে মিশে যাওয়ার মতো সাজতে হয়। এর থেকে আমার বুকে একটা ছবি আঁকা হয়ে গেছে, সবুজ রঙের ছবি। এরকম অজস্র মূর্খতা আমার আছে। সেই সঙ্গে এই স্বপ্নও আছে যে মহুয়া সেই সব ত্রুটিগুলো মানিয়ে নেবে, নিজের করে নেবে।
সাঁকোটার ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে সোজা তাকাই। সরু নদীটা এঁকেবেঁকে চলে গিয়েছে অনেক দূরের দিকে। নুড়ি পাথর আর বড় বড় বোল্ডারে সাজানো দুই পাড়ের দিকে ওর এই ক্ষীণকটি পলায়নপর গতি যেন স্কুলবালিকার উল্লসিত এক্কাদোক্কার আসর। প্রাণভরে দেখেও আশ মেটে না। বর্ষায় খরস্রোতা হলেও এই অক্টোবর মাসে নদী শীর্ণকায়। তবু কে যে এই মিষ্টি নদীর নাম দিয়েছে মরা নদী! ভাবলেই খারাপ লাগে আমার। আমি আর মহুয়া দু'জনে মিলে আজ ওর একটা নাম দেব।
কিন্তু কোথায় মহুয়া? এখনো কি পাঁচটা বাজেনি? তাড়াহুড়োয় আমি ঘড়িটাও পরিনি। পকেট থেকে মোবাইলটা বের করি। আর মোবাইলের দিকে তাকিয়েই আমার মনটা একদম নিভে যায়। আজ আমার এমন বেভুল অবস্থা! কাল রাত থেকে চার্জে বসানো হয়নি।

সমানেই নিজের সঙ্গে কথা বলে গেছি। এখন মোবাইলটাও ঘুমিয়ে পড়েছে অসময়ে।
সাঁকোর ওপর হাঁটতে হাঁটতে এপারে চলে এসেছি। মাটিতে পা রাখার মুখেই একটা ঝাঁকড়া গাছ চলার পথ অর্ধেকটা ঢেকে নুয়ে পড়েছে। নাম জানি না। অনেকটা বাঁশ ঝাড়ের মতো দেখতে। আচমকা একটা পাখি ডেকে উঠল বেশ কর্কশ স্বরে। কী আশ্চর্য সমাপতন। একবছর আগের এই দিনটাতে এই সময়েই মহুয়ারও মোবাইলের চার্জ চলে গিয়েছিল। এক্সকারশনে আসা মালদা কলেজের গ্রুপ থেকে পথ হারিয়ে এইখানেই এসে পড়েছিল ও। আমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল



আচমকা একটা পাখি ডেকে উঠল বেশ কর্কশ স্বরে। কী আশ্চর্য সমাপতন। একবছর আগের এই দিনটাতে এই সময়েই মহুয়ারও মোবাইলের চার্জ চলে গিয়েছিল।

এই বাঁশের সাঁকোর ওপরে। সেদিনও আমি প্রকৃতি পর্যবেক্ষণে বেড়িয়েছিলাম। আশাই করিনি যে এই নির্জনে দেখা পাব এমন একটা উজ্জ্বল ঝকঝকে মানুষের। অবাক হয়ে বোধহয় একটু বেশিক্ষণ তাকিয়ে ফেলেছিলাম। আর গাছেদের ভিড়ে রাস্তা না খুঁজে পাওয়া ভয়টা ওর চোখমুখ থেকে কেটে গিয়েছিল একটু একটু করে। সটান আমার সামনে এসে দুই কাজল পরা চোখ তুলে গম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করেছিল, "এত দেখার কী আছে? মহিলারা তো আজ আর অসূর্যম্পশ্যা নয়। সেই প্রথম দেখার মুহূর্ত থেকেই আমার ভিতরে কেউ বলে দিয়েছিল এই মানুষ আমার অচেনা নয়। কোথায় যেন লুকিয়ে ছিল এতদিন। আজ তার অজ্ঞাতবাসের মেয়াদ শেষ হল। আমি হেসে ফেলেছিলাম। আলাপ পরিচয় যখন একটুখানি এগিয়েছে, যখন আমি ওর মুখ থেকে শুনে শুনে আমার মোবাইলে সেভ করে নিচ্ছি ওর নম্বর, ঠিক তখনই কী যেন একটা পাখি বা কোনও জন্তু তারস্বরে ডেকে উঠেছিল জঙ্গলের ভিতর থেকে। আর মহুয়া চমকে উঠে আমাকে প্রায় জড়িয়ে ধরেছিল আর একটু হলে। এক লাফে আমার এত কাছে এসে দাঁড়িয়ে ছিল ও যে বাঁশের সাঁকোটা দুলে উঠেছিল। আমার নাকের মধ্যে দিয়ে বুকের অনেক তলায় আঁকা হয়ে গেল ওর চুলের গন্ধ।
আজও সেই চার্জলেস মোবাইল, আজও সেই অদ্ভুত পাখির ডাক। সব যখন মিলে যাচ্ছে তখন বাকিটাও মিলবে। আশায় বুক বেঁধে আমি মনে মনে নদীটার জন্য একটা সুন্দর নামের খোঁজ করি।
"এখনও দাঁড়ায় থাকবা নাকি ইখানে? হাওয়াবাবু? বাড়ি যাবা না?" দু'হাতে দুখানা স্টিলের টিফিন ক্যারিয়ার নিয়ে নদীর এপারে চলে এসেছে গুলজারিয়া। জঙ্গলের আরও ভিতরে ঢুকবে।
"তুমি কোথায় যাচ্ছ এদিকে? তুমি বাড়ি যাবে না?"
"না গো...। জঙ্গলের মধ্যে কাঠকাটার পারমিট নিয়ে গুপি কন্টাকটর আসছে তো। তাম্বু ফেলছে। বারো জন মোটমাট। ওদের খাবার অর্ডার পাইছি তো। দেখলা না আলু পটল কাটলাম? রুটি আর তরকারি। এই তো নিয়ে যাচ্ছি," বিশদ বিবরণ দেয় গুলজারিয়া। ও চলে যাওয়ার পরেও আমার মাথায় প্রশ্ন ঘোরে। মহুয়ার মতো এই গুলজারিয়াও তো একজন ওয়র্কিং লেডি। ও তো বলল ওর কাজের কথা। অথচ আমি ঠিক জানি মহুয়াকে যদি জিজ্ঞেস করা যায় তো একটা প্রশ্নেরও উত্তর পাওয়া যাবে না। অনুযোগ করলে ঠান্ডা গলায় বলবে, "হোয়াই শুড আই টেল অল মাই ডিটেলস? নো দ্যাটস নট মাই হ্যাবিট।" উফ... মহুয়া মহুয়া তোমাকে কী করে বোঝাই যে জানতে চাওয়ার কোনও কারণ থাকে না সবসময়। শুধু তোমার গলার আওয়াজ শোনার ইচ্ছে থাকে, শুধু তোমার হাতের ছোঁয়ায় মেসেজ দেখার ইচ্ছে থাকে। এই ছোট ছোট মুহূর্তগুলো দিয়ে আমি তোমাকে চব্বিশঘণ্টার সবগুলো মুহূর্ত ছুঁয়ে থাকতে চাই, শুধু তোমার জাগতিক এবং অনৈসর্গিক অস্তিত্বকে নিজের বন্ধ চোখের পাতায় ভরে নিতে চাই। এই এক বছরেও আমার সামান্য চাওয়াটুকু বোঝাতে পারিনি মহুয়াকে। আমি যাই বলতে যাই ও যেন কেবলই ছায়ার মতো সেই কথার বাঁধন থেকে পিছলে সরে যায়। আজ নিশ্চয়ই বুঝবে মহুয়া সবটা। যখন আজকের দিনে এই একই জায়গায় একই সময়ে দেখা করার প্রস্তাবটা ও নিজে দিয়েছে, তখন নিশ্চয়ই আমার সমস্ত উন্মাদনার স্বীকৃতি দিতেই আসছে ও। পজিটিভ মাইন্ডেড হওয়ার প্রবল চেষ্টা করি ক্রমশ গাঢ় হয়ে আসা আকাশের দিকে তাকিয়ে। সন্ধ্যা নামতে দেরি নেই আর। যতই স্থির হতে চাই, শান্ত হতে চাই, মনটা আমার অবশ হয়েই থাকে। মহুয়া, মহুয়া, আমার মহুয়া, তুমি এখনও আসছ না কেন?
আমার চোখের সামনে দিয়ে জঙ্গলের গভীরে ঢুকে গিয়েছিল গুলজারিয়া। জানি না কতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি। রাতের অন্ধকারে জঙ্গলে আগেও কয়েকবার এসেছি। দল বেঁধে স্কুলের সব স্যারেদের সঙ্গে অথবা একা। কিন্তু এভাবে চোখের ওপর একটু একটু করে দিন শেষ হয়ে ফেড ব্ল্যাক আকাশটাকে নেমে আসতে দেখিনি জঙ্গলের বুকে। আমার কাছে সময় মাপার কোনও যন্ত্রই নেই। তবু বুঝতে পারি মহুয়া আসার টাইমটা পার হয়ে গেছে বহুক্ষণ। কিন্তু আমার বিশ্বাস হতে চায় না শেষ পর্যন্ত মহুয়া এল না। এই এক বছরে অন্তত দশবার ও আমাকে বলেছে ওর কাছে সবচেয়ে বড় হল কথার দাম। যে মানুষ কথা রাখতে পারে না তাকে ও মানুষ বলেই মনে করে না। আমার অজস্র রাত দিন দুপুরের অবিরাম অনর্গল বেহিসেবি আবেগের উত্তরে ও কিছুই না বলে শুধু প্রশ্রয় দিয়েছে, কখনও থামিয়েও দেয়নি আমাকে। আমি অধৈর্য হলে আমায় কথা দিয়েছে আজ এইখানে এসে আমার সব প্রশ্নের উত্তর দেবে। আমি সেই অপেক্ষায় থেকেছি। আমি বিশ্বাস করেছি। আর এখন এই নিস্তব্ধ নিরালায় আমার সব বিশ্বাস সব স্বপ্নের ওপর দিয়ে যেন কখনও না শোনা এক ঝরাপাতার গান বয়ে যায়, যে সুরটায় শুধুই খানিকটা ভারী হয়ে ওঠা নিঃশ্বাস লেগে আছে। তবুও আমার মন যেন মানতেই চাইছে না মহুয়া তার কথা রাখেনি।
"ইবার ঘুরত চল গো হাওয়াবাবু ... একা ইখানে দাঁড়ায় থেকে কী করবা ... "

চমকে তাকাই পিছনে। গুলজারিয়া তার কাজ সেরে ফিরে এসেছে। এবার তার ঝুপড়ি বন্ধ করে বাড়ি ফেরার টাইম হয়েছে। সে এখানে তার হাওয়াবাবুকে একা রেখে যেতে চায় না। কিন্তু আমি কী করে ফিরব? কোথায় ফিরব? কার কাছে? আমার অনিচ্ছুক পা ভারী হয়ে উঠেছে। তবুও অনিচ্ছার পা ফেলে ফেলে গুলজারিয়ার সঙ্গে এগোই। একটাই বাঁচোয়া সে আমাকে একবারও জিজ্ঞেস করে না কেন আমি এসেছিলাম। জঙ্গলে আসাটা ওর কাছে জলখাওয়ার মতোই স্বাভাবিক ব্যাপার। প্রতিটি মানুষকেই কোনও না কোনও সময় জঙ্গলের কাছে আসতেই হবে। একগাদা হাবিজাবি কথা না বলে গুলজারিয়া একটা অদ্ভুত গান ধরে গুনগুন করে। যে গানের একটাও কথা বোঝা যায় না, শুধু সুরটা যেন চেপে রাখা কষ্টের মতো গুমরে গুমরে ছড়িয়ে পড়ে কালো কালো সটান গাছের গুঁড়ি ছাপিয়ে, ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া গাছের মাথাগুলো ছুঁয়ে, ঝুপসি অন্ধকারের বুকের ভেতরে বহু বর্গ মাইল বিছিয়ে থাকা শূন্যতায়।

বাইকটা স্ট্যান্ড করছিলাম উঠোনের পাশে। আমার পাশ থেকে দু'হাতে দু'খানা বড় বড় বাজারের ব্যাগ নিয়ে অলোকেশ এসে দাঁত বের করে দাঁড়ায়। চোখে মুখে খুশি ধরছে না। যেন ওর রোজকার আলুনি একঘেয়ে জীবনে ঘটে গেছে কি এক উত্তেজনার ঘটনা। এখানে আমার একমাত্র বন্ধু এই অলোকেশ। ও ভূগোল পড়ায় ছেলেদের। হাশিখুশি সহজ মনের ছেলে। চেষ্টা করেও ওর সামনে গম্ভীর থাকা যায় না। এরকম একটা সঙ্গই আমার দরকার ছিল ভিতরের জমাট বাঁধা অন্ধকারটা কাটানোর জন্য। অন্যসময় ভালই লাগে। কিন্তু এখন এইরকম ভাঙা বিক্ষিপ্ত মনের অবস্থায় এত হাসি দেখে বিরক্ত লাগছে।

"কী রে? এত লাইটনিং কিসের? আর এত বাজারই বা কেন?"

"হু হু বাবাআআ তুমি যতই আমায় কাটাতে চাও ... কপাল আটকাবে কী করে?"

অলোকেশ ব্যাগ থেকে টেনে টেনে সদ্য কিনে আনা মাটন, গলদা চিংড়ি, মিষ্টি ইত্যাদি বের করতে করতে বলে।

"হেঁয়ালি বন্ধ করবি? এত মাল কিনেছিস কেন? কে রাঁধবে এগুলো? শশীর মা তো চলে গেছে বিকেলে ..."

"আমি আমি... আমি রাঁধব ... আঙুল চাটবি... "

"কিন্তু কেন? তোর বিয়ে ঠিক হল নাকি?"

এবার উঠে আসে অলোকেশ। কানের কাছে অনাবশ্যক ফিসফিস করে, "আরে তুই তো আমাকে নিলি না। ভাগ্যিস নিলি না। তিনি তো সোজা স্কুলে গেছিলেন। তোর নাম বলায় নাইটগার্ড এখানে দিয়ে গেল।"

আমি বেশ চমকাই। একই সঙ্গে রাত্রিদিন থাকার সুবাদে আমার মহুয়াজনিত দুর্বলতা অলোকেশের অজানা নয়। প্রেমে পড়েছি আমি আর ভয়ঙ্কর উৎসাহ ওর। চার মাইল দূরের কুরিয়ার সেন্টারে গিয়ে গিয়ে কত অসংখ্য চিঠি ড্রপ করে আসে ও হাসিমুখে। কিন্তু এখন আমি ওর কথা কিছুই বুঝতে পারছি না। সব লাতিন লাগছে।

আমার কানের কাছে আবার অলোকেশের ফিসফিস, "উফফফ... কী দেখতে রে ! পাগলাআআআ! কি হাসিখুশি! কত্ত কথা বলল আমার সঙ্গে। কথায় কথায় হেসে গড়িয়ে পড়ছে। তুই কখন ফিরবি জিজ্ঞেস করছিল। তবে যাই বলিস হাজ়ব্যান্ডটা কিন্তু হুমদো টাইপ। অবশ্য পয়সার গরম তো থাকবেই। অত বড় বিজনেস চালায়। কী দারুণ একটা গাড়ি নিয়ে এসেছে। লোকটাকে দেখতে একটুও ভাল না। বাচ্চাটাও বাবার মতোই হয়েছে ..."

গড়গড় করে আরও কত কী সব বলে যাচ্ছে অলোকেশ। আমার মাথায় রেজিস্টার করতেই অনেকটা সময় নিয়ে নেয়। কার কথা বলছে ও? মহুয়া? মহুয়া এসেছে? এখানে? এইভাবে? কিন্তু তাই বা কী করে হবে? এইসব বর বাচ্চা দামি গাড়ি? আমি কিছুই মেলাতে পারি না। তাছাড়া মহুয়া হাসিখুশি? কত্ত কথা বলেছে অলোকেশের সঙ্গে? কথায় কথায় হেসে গড়িয়ে পড়েছে? আমার মহুয়া তো ঠিক উলটো। সে তো এক শান্ত গভীর জলাশয়, যেখানে অজস্র নুড়িপাথর ফেললেও কিছুতেই আলোড়ন ঘটে না। যার দিকে চুপ করে চেয়ে থাকলে দেখে নেওয়া যায় নিজের হৃদয়ের প্রতিচ্ছবি। আর মহুয়া ম্যারেড? মহুয়া মা? কই কোনওদিন তো এসব জানতে পারিনি আমি! আমার মনে আসে না যে কখনও আমিও জানতে চাইনি কে কে আছে ওর বাড়িতে। আর মহুয়াও বা নিজের ব্যক্তিগত কথা কবে বলেছে আমাকে? আসলে আমাদের বহু বহু বিনিদ্র রাত্রের কথোপকথন জুড়ে ছিল শুধু অবাস্তব কিছু স্বপ্ন আর কল্পনা। তার মধ্যে কোন জাগতিক বক্তব্যের জায়গাই হয়নি। এজন্য আমি মহুয়াকে কোনও দোষ দিতে পারব না। আর ওর লাইফে কে বা কারা আছে তাতে আমার বিশেষ এফেক্টও পড়ে না। শুধু আমি ওই হাসিখুশি প্রচণ্ড কথা বলা মহুয়ার সঙ্গে আমার চেনা মানুষটাকে কিছুতেই মেলাতে পারিনা। আর এভাবে আসাটা? এটাই কি মহুয়ার আসা? এইভাবে আসার কোনও প্রয়োজন ছিল? তাকিয়ে থাকি অলোকেশের দিকে। অস্ফুট প্রশ্ন বেরিয়ে আসে, "ওরা কোথায় গিয়েছে? কাউকে তো দেখছি না ..."

"ওই ভদ্রলোকের কিছু মার্কেটিং আছে। এয়ারপোর্ট মার্কেটে গেল। এসে যাবে ..." অলোকেশ ব্যস্ত ভাবে ঢুকে যায় রান্নাঘরে। আমি পায়ে পায়ে ঘরে আসি। দাঁড়াই আমার টেবিলের পাশে বড় জানলার ধারে। যেখান দিয়ে একটা কল্কেফুলের ডাল প্রায়ই ঝুঁকে এসে আমায় ডেকে যায়, যেখানে দাঁড়িয়ে কত রাতে আমি অজস্র মেসেজ করেছি ফোন করেছি মহুয়াকে। সেই কথাগুলো এই নিত্যদিনের ডাল তরকারি মাখা পৃথিবী থেকে আমায় উন্নীত করেছে এক বৃহত্তর অনুভবে, আমার মনে হয়েছে এই একজন মানুষ আমি পেলাম এতখানি জীবন খরচের পর যে আমাকে দিয়েছে প্রকৃত মনোবিকাশ। কয়েকশ মাইল দূরে থেকেও আমি পেয়েছি সেই তীব্র আশ্লেষে ভরা জীবনের গন্ধ, সেই চকিত মুহূর্ত ঘিরে থাকা বুনো চুলের গন্ধ। আমার বাঁচার ইচ্ছা তীব্রতম হয়ে উঠেছে প্রতিদিন।

অথচ এখন আমার মনে হচ্ছে এই আসা আমি চাইনি। না আসা ভাল ছিল, তাতে শূন্যতার মাঝখানে কোথাও কোথাও সম্ভাব্য পূর্ণতার কাল্পনিক অবকাশ তো ছিল। আমি পায়ে পায়ে বেরিয়ে পড়ি অলোকেশকে কিছুই না বলে। ও রান্নাঘর থেকেও ঠিকই টের পায় আমার গতিবিধি। কানে লেগে থাকে মাসিপিসি স্টাইলে পিছন থেকে বলে ওঠা অলোকেশের চেতাবনি, "যেখানে যাচ্ছ যাও, খাওয়ার আগে বাড়ি ফিরবে।"

অন্ধকার হাইওয়েতে লম্বা লম্বা পা ফেলে হাঁটি। আর অনেকক্ষণ বাদে নিজেকে আবিষ্কার করি জঙ্গলের মধ্যে। হাইওয়ে থেকে বাঁয়ে বটগাছ ছুঁয়ে আমি নেমে এসেছি শুকনোপাতার কার্পেট পাতা নিজস্ব বিশালতায়। আমার গলায় সেই গুনগুন সুরটা উঠে এসেছে, গুলজারিয়ার গাওয়া, যে গানটার কথাগুলো আমি জানি না। জানতেও চাই না। শুধু একটু সুর দিয়েই তো ভরে নেওয়া যায় রাতের জঙ্গলের একাকী পথ।

আমি অন্ধকারেই এগিয়ে যাই মরা নদীটার দিকে। বাঁশের সাঁকোর ওপর দাঁড়িয়ে কালো ফিতে নদীটার দিকে তাকাই। ওর শরীরের সকাম প্রক্ষেপ আমার চোখে পড়ে না, শুধু অনুভূতির জগৎটা ছুঁয়ে যায় অশ্রুত কোনও নূপুর নিক্কণ। এই জঙ্গলে আর কোনওদিন আমি আসব না। আমি আর কখনও দাঁড়াব না এই বাঁশের সাঁকোর ওপরে। চলে যাওয়ার আগে, চিরদিনের মতো সাঁকোটা ভেঙ্গে ফেলার আগে, অলোকেশের হাতে ভালবাসার মাটন ইলিশ খেতে বসার আগে, অতিথিবৃন্দকে সমাদরের জন্য তৈরি হওয়ার আগে নদীটার একটা ছায়ামাখা নাম দিই মনে মনে গুলজারিয়া।

অলংকরণ: সমরজিৎ রজক


নকু বাবুর লণ্ঠনের সংগ্রহ

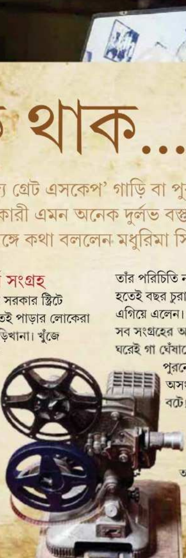
স্মৃতিটুকু থাক...

প্রাচীন মুদ্রা, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের টর্চ, নেতাজির 'দ্য গ্রেট এসকেপ' গাড়ি বা পুরনো দিনের ধাতুর জিনিস...ফেলে আসা সময়ের স্মৃতিচিহ্ন বহনকারী এমন অনেক দুর্লভ বস্তুই আছে তাঁদের রত্নভাণ্ডারে! এমনই চার সংগ্রাহকের সঙ্গে কথা বললেন মধুরিমা সিংহ রায়।

স্মৃতির নিজস্ব ইতিহাস থাকে। হারিয়ে যাওয়া সময়কে বর্তমানে ফিরিয়ে আনার ক্ষমতা রাখে সে। অতীতের নানা বস্তুর সংগ্রহ ও সংরক্ষণের মাধ্যমেই তো এই ফেলে আসা সময়কে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব! পুরনো দিনের সংস্কৃতি, কৃষ্টি, যাপনচিত্র...সবই ঘুরে ফিরে আসে নানা স্মৃতিচিহ্নের মধ্যে দিয়ে। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ঋদ্ধ হয় সেই অতীত ইতিহাসে। কলকাতাতে এমন বেশ কয়েকজন মানুষ আছে যাঁরা এই স্মৃতি রক্ষণাবেক্ষণের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। বাঁচিয়ে রাখছেন ফেলে আসা সময়ের দিনলিপিকে...

নকু বাবুর আশ্চর্য সংগ্রহ

উত্তর কলকাতার নলিন সরকার স্ট্রিটে পৌঁছে তাঁর খোঁজ করতেই পাড়ার লোকেরা দেখিয়ে দিলেন তাঁর বাড়িখানা। খুঁজে পেতে কিঞ্চিৎ অসুবিধে হচ্ছে বুঝে তাঁদেরই একজন সঙ্গে করে নিয়ে এলেন। পুরনো বাড়ির সিঁড়ি ভেঙে দোতলায় উঠতেই দেখা মিলল সুশীল চট্টোপাধ্যায়ের। অবশ্য তাঁর পরিচিতি নকু বাবু নামেই। দেখা হতেই বছর চুরানব্বইয়ের 'তরুণ' হাসিমুখে এগিয়ে এলেন। নিয়ে গেলেন তাঁর আশ্চর্য সব সংগ্রহের আঁতুরঘরে। ছোট একখান ঘরেই গা ঘেঁষাঘেঁষি করে অবস্থান করছে পুরনো দিনের ইতিহাস-বিজড়িত অসংখ্য মণিমুক্তো। মণিমুক্তই বটে! দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কার টর্চ থেকে শুরু করে ব্রিটিশ আমলের অসংখ্য লণ্ঠন, পুরনো দিনের প্রজেক্টর, অ্যামপ্লিফায়ার, পকেট







নকু বাবু

মাইক্রোস্কোপ... আরও কত কীই না রয়েছে সেখানে! সেই মহার্ঘ বস্তুগুলোর দিকে তাকালেই বোঝা যায় ইতিহাস আর সাবেকিয়ানা পরম যত্নে লালিত হচ্ছে নকু বাবুর আশ্রয়ে। আলাপচারিতা শুরু হতেই বুঝলাম, কী অসম্ভব স্মৃতিশক্তি ভদ্রলোকের! স্মৃতিচারণে কোথাও এতটুকু জড়তা নেই। কোন পুরনো আমলের কথা এখনও গড়গড় করে বলে দিচ্ছেন তিনি! শুরুতেই বললেন, "ছোটবেলা থেকেই জিনিসপত্র সংগ্রহ করার নেশা। বাবার সঙ্গে মাঝেমধ্যে ঘাটশিলার কাছে ধর্মগড়ে যেতাম। ওখানে আমাদের একটা বাড়ি ছিল। আদিবাসী-অধ্যুষিত সেই জায়গায় বাঙালির সংখ্যা নেহাত হাতেগোনা। ওঁদের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে নুড়ি-পাথর, প্রজাপতির ডানা, গাছের পাতা জোগাড় করতাম। ১৯৩০ সাল নাগাদ আমার আকর্ষণের জায়গা নেয় রেডিও। শব্দ ছিল আমার ভালবাসার জায়গা। কতদিন রাতে খোলা আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে ব্যাঙের ডাক বা স্টেশনের কাছে ট্রেনের আওয়াজ শুনতাম! ১৯৩৫ সালে মেজভাই রেডিওগ্রাম নিয়ে এল। এরপর ১৯৩৮ নাগাদ মাথায় খেয়াল চাপল নিজেই রেডিও বানাব! বানিয়েও ফেললাম। হেডফোন কানে দিয়ে রেডিও শুনতাম। ভয় ছিল, ব্রিটিশ চরেরা না জেনে ফেলে!" সেই থেকে শব্দের সঙ্গে তাঁর দীর্ঘ মিত্রতার শুরু। দীর্ঘদিন গবেষণা করেছেন শব্দ নিয়ে। সিনেমার সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। একইসঙ্গে চলতে থাকে পুরনো জিনিসপত্র সংগ্রহের কাজ। সংগ্রহালয়ের নাম 'অতীতের আশ্রয়'। সংগ্রহের মধ্যে আছে অসংখ্য পুরনো দিনের লণ্ঠন। "এক একটা লণ্ঠনের এক একরকমের মেকানিজ়ম। ১৮৭০ থেকে ১৯৮০ সালের মধ্যে তৈরি এই লণ্ঠনগুলো," বলে একে একে পরিচয় করালেন তাঁর লণ্ঠন-পরিবারের সঙ্গে। প্রথম পোর্টগাড়ির হেডলাইট যেমন রয়েছে, তেমনই আছে পুরনো দিনের লাল কাচ দেওয়া হ্যারিকেন। কর্পোরেশন থেকে রাস্তা খুঁড়তে এলে রাতে ওই হ্যারিকেন বসিয়ে দিয়ে যেত। রেলের সিগনাল, ছোট হ্যাজাক, ঘোড়ার গাড়ির আলো, ১৯৪১ সালে আমেরিকান সেনাদের ব্যবহৃত আলো, জার্মানির হ্যারিকেন, যাত্রায় ব্যবহৃত আলো সবই দেখতে পেলাম। নীলকর সাহেবদের আমলের লণ্ঠনও দেখালেন তিনি। নিজেই জানালেন যে ঘোড়ার গাড়ির আলোগুলো বিশেষ কায়দায় এমনভাবে তৈরি হত যা অন্ধকারেও গাড়ি থেকে রাস্তার ধারের বাড়ির নম্বর দেখতে সাহায্য করবে।

"আলো ছাড়া আমার সংগ্রহের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল প্রজেক্টর। সাইলেন্ট ও কথা বলা প্রজেক্টর, পুরনো দিনের লাউডস্পিকার, ম্যাজিক লণ্ঠনও আছে। জার্মানির প্রজেক্টরও আছে। সবমিলিয়ে হাজারখানেক জিনিস তো হবেই," জানালেন তিনি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ব্যবহৃত সেনাবাহিনির রিসিভার, ওই সময়ের ক্যামেরা, কলকাতায় আসা প্রথম হেডফোন...অনেক কিছুরই মালিক তিনি। তবে তাঁর আফশোস তাঁর পরের প্রজন্মের কেউই বিশেষ আগ্রহী নন ইতিহাস সংরক্ষণের ব্যাপারে। নিজে ১৯৪২-এর 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সেই সূত্রে অসংখ্য মহান ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শেও এসেছেন। খুব কাছ থেকে দেখেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুকে। তবে এতসবের মধ্যেও নিজের সংগ্রাহক সত্তাকে ভুলতে পারেননি নকু বাবু। বিভিন্ন সময়ে এই নানাবিধ জিনিস তাঁর হাতে এসে পৌঁছেছে। আর সেগুলোর নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ করেন তিনি একাই। "সকালে ঘুম থেকে উঠে ধুলো ঝাড়ি। প্রত্যেকটা জিনিসের যত্ন আমি নিজেই করি," বলে থামলেন তিনি।





পুরনো প্রজেক্টর ও ল্যাম্প

নেতাজির ওয়ান্ডারার গাড়ি



অভিজাত স্টুডিবেকার




পল্লব ও সৌরভ রায়

স্মৃতি-বিজড়িত গাড়িঘর

নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর 'দ্য গ্রেট এসকেপ'-এর গাড়িখানা সংরক্ষণ করেছেন তিনি। এছাড়াও তাঁর জিম্মায় রয়েছে আরও বেশ কয়েকটা পুরনো দিনের স্মৃতি বিজড়িত গাড়ি। এমনটাই শুনেছিলাম। কিন্তু কলকাতার কাশিমবাজার হাউজে গিয়ে পল্লব রায়ের সঙ্গে আলাপ করে বুঝলাম এ নিছক কয়েকটি গাড়ির সংগ্রহশালা নয়। বরং, প্রতিটি গাড়ির নেপথ্য ইতিহাসকে আদর-যত্নে প্রতিপালন করছেন পল্লববাবু ও তাঁর ছেলে সৌরভ। গ্যারাজের ঠিক উলটোদিকে রয়েছে গাড়ি সারাইয়ের কর্মশালা। সেখানে রাখা গাড়িগুলোকে দেখলে মনে হবে এইমাত্র ধ্বংসস্তূপ থেকে তুলে আনা হয়েছে। তারপর পরিশ্রম আর ধৈর্যের দ্বারা সেগুলোর আপাদমস্তক খোলনলচে বদলে ফেলেন পল্লববাবু। "১৯৬০ সালের একটি মার্সিডিজ় বেনজ় আমার প্রথম রেস্টোরড কার। বছরসাতেক আগে চেন্নাইয়ের এক ভদ্রলোকের কাছ থেকে আমি কিনি। গাড়িটি প্রায় চালু অবস্থায় ছিল না। কোনও পার্টসও ছিল না। একেবারে ভগ্নদশায় আমার হাতে এসে পৌঁছয়। চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়েছিলাম যে এই গাড়িটাকেই আমি আগের পর্যায়ে নিয়ে যাব," বললেন তিনি। সেখান থেকে ভিন্টেজ কার র‍্যালিতে একাধিক পুরস্কারও জেতে গাড়িটি। তাঁর থেকেই জানা গেল রেস্টোরেশনের পদ্ধতির ব্যাপারে। "একটা গাড়ির অনেকগুলো অংশ থাকে: বডি, আপহোলস্ট্রি, মেকানিকালস, ইলেকট্রিকালস, ইনস্ট্রুমেন্টেশন ও খুব পুরনো গাড়ির ক্ষেত্রে উডেন ফ্রেমওয়র্ক। এই প্রতিটি অংশই আমাদের রেস্টোর করতে হয়। যদি ইঞ্জিন চালু করা যায়, তাহলে মোটামুটি ৬০ শতাংশ কাজ হয়ে গেল ধরে নেওয়া যায়। কিন্তু ইঞ্জিন চালু না করা গেলে তাকে রিপ্লেস করা ছাড়া আর উপায় থাকে না। মার্সিডিজ়টির ক্ষেত্রে ইঞ্জিন চালু থাকলেও ফুয়েল সিস্টেমের অবস্থা খুবই খারাপ ছিল। জার্মানি থেকে পার্টস আনিয়েছিলাম। সিটও ছেঁড়া ছিল। সব নতুন করে তৈরি করতে হয়েছিল। অনেক গাড়ির ট্রিমস এখন আর তৈরি হয় না। বিদেশে একটি গাড়ির যাবতীয় পার্টসের


শেভরোলে ফ্লিটমাস্টারের বিলাসবহুল অন্দর





বিকানের রাজপরিবারের শেভরোলে ফ্লিটমাস্টার

ক্যাটালগ বানানো হয়। তারপর সেই ক্যাটালগ অনুযায়ী বিভিন্ন পুরনো গাড়ির পার্টস নিলাম করা হয়। গাড়ির ভেহিকল আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার ও কোন বছরের গাড়ি—এ দু'টো তথ্য জানা থাকলে অনলাইনে এ ধরনের নিলাম হওয়া বহু দুষ্প্রাপ্য পার্টস উদ্ধার করা সম্ভব। তবে শুধু মডেল নম্বর জানলে কিন্তু হবে না'', জানালেন তিনি। এখন তাঁর জিম্মায় ছ'-সাতটি গাড়ি। চোখে পড়ল সুদৃশ্য শেভরোলে ফ্লিটমাস্টার স্পোর্টস সিডান গাড়ি। ১৯৪৭ সালের এই গাড়িটির মালিকানা ছিল বিকানেরের রাজপরিবারের। জয়পুরের এক ভদ্রলোকের থেকে এই গাড়িটি কেনেন তিনি। ভাঙাচোরা গাড়িটির খোলনলচে বদলে ফেলেন। ক্যাটালগের রং অনুযায়ী গাড়িটি পেন্ট করান। ১৯২৮ সালের স্টুডিবেকার প্রেসিডেন্ট এইট গাড়িটি নিয়ে বিশেষ গর্বিত তিনি। ''ভারতে আসা প্রথম স্টুডিবেকার এটিই। ব্রিটিশ আমলে ইংলিশ গাড়িই বেশি ব্যবহৃত হত। কিন্তু সেখানে ব্যতিক্রম এই আমেরিকান গাড়িটি। স্টুডিবেকারের দু'টো মাত্র গাড়ি সেই সময়ে ভারতে এসেছিল। এটি তার অন্যতম। পৃথিবীতে এই গাড়ি দু'টো নেই। এটি আমাদের পারিবারিক সংগ্রহেই ছিল। আমার হাতে আসার পর প্রায় ছ'বছর লেগেছিল পুরোপুরি রেস্টোর করতে,'' জানালেন পল্লববাবু। কোনও গাড়িতে দেখা গেল ভিনইয়ার্ড পেন্টিং, তো কোথাও আবার রোব রেল ও উইন্ড উইংস। ঘোড়ার গাড়িতে মহিলাদের পায়ে ঠান্ডা লাগবে বলে তাঁদের জন্য বিশেষ 'রোব'-এর ব্যবস্থা থাকত। সেই একই ব্যবস্থা ফ্লিটমাস্টার-এও দেখা যায়, এমনই মজার মজার ঘটনা জানালেন তিনি। আর সুভাষচন্দ্র বসুর স্মৃতিবিজড়িত ওয়ান্ডারার-এর রেস্টোরেশন প্রসঙ্গে তিনি জানালেন, ''নেতাজি ভবনে যখন প্রথমবার গাড়িটিকে দেখি দরজা, জানলা খুলে এসেছে। কাচ ভাঙা, সিট ছেঁড়া। খুব দুঃখ হয়েছিল। সেখান থেকে গাড়ির ইঞ্জিন চালু করি। এর আগে একজন মেকানিক চেষ্টা করেও ইঞ্জিনটি চালু করতে পারেননি। তারপর ধীরে ধীরে পুরো গাড়িটিকেই রেস্টোর করি।'' প্রতিটি গাড়ির প্রতিটি কোণাতেই যে কত ইতিহাস লুকিয়ে আছে, না দেখলে বোঝা যেত না!

বাড়িতেই মিউজিয়ম



অপূর্ব পাণ্ডা

দক্ষিণ কলকাতায় তাঁর বাড়িতে যাওয়ার আগেই শুনেছিলাম তাঁর সংগ্রহের জিনিসপত্র দিয়ে তিনি আস্ত একখানা মিউজিয়ম বানিয়ে ফেলেছেন! কৌতূহল হল, একবার নিজের চোখেই দেখে আসি। ঢুকতেই বুঝলাম যতটুকু শুনেছি তার তুলনায় ঢের বেশি জিনিসের সম্ভার রয়েছে সরকারি চাকুরে অপূর্ব কুমার পাণ্ডার কাছে। একটা আস্ত ফ্ল্যাটই তিনি কিনে ফেলেছেন প্রায় ১৫ বছর ধরে সঞ্চিত জিনিস গুছিয়ে রাখার জন্য। ''কেউ কেউ আছেন যাঁরা কোনও এক ধরনের জিনিসই সংগ্রহ করেন। একে বলে ভার্টিকাল কালেকশন। আমি কিন্তু সেরকম নই। আমার এখানে নানা জিনিসের সংগ্রহ দেখতে পাবেন। এমন জিনিস আমি সংগ্রহ করি যা এখন হারিয়ে গিয়েছে বা প্রায় বিলুপ্ত। তবে যা আছে তার প্রায় সবটুকুই পুরনো দিনের বাঙালি মধ্যবিত্তের ব্যবহারের উপযোগী জিনিসপত্র,'' শুরুতেই জানিয়ে দিলেন তিনি। তাঁর বাবা স্ট্যাম্প কালেক্ট করতেন। তিনিও বরাবর সংগ্রহের ব্যাপারে চর্চা করেছেন, পড়াশোনা করেছেন। বাড়ির ড্রয়িংরুমে একট সুবিশাল আলমারিজুড়ে রয়েছেন পোর্সেলিনের দেব-দেবী ও পুরাণ চরিত্ররা। নল-দময়ন্তী, হরিশচন্দ্র-শৈব্যা, সাবিত্রী-সত্যবান, কালী, কৃষ্ণের মতো অসংখ্য চরিত্র আছেন। আছে জার্মানি ও জাপানে তৈরি নানা ভারতীয় ফিগার। তবে বেশিরভাগ জিনিসই তিনি সংগ্রহ করেছেন বিভিন্ন ফেরিওয়ালার কাছ থেকে! বিভিন্ন

ইঙ্ক ব্লটার





কাঠের টেলিফোন



ব্রিটানিয়া বিস্কুটের কৌটো



কাঁসা ও পেতলের গ্লাস



হুঁকো



মুগুর



লোহার কাজললতা



আমসত্ত্বের ছাঁচ

বাড়ির লোকেরা কত কিছু ফেলে দেন। ফেরিওয়ালাদের কাছে তাই অমূল্য ভাণ্ডার খুঁজে পাওয়া সম্ভব। ধাতুর জিনিসগুলো অবশ্য দোকান থেকেও কিনেছেন। "বিভিন্ন পুরনো বাড়িতে এ ধরনের জিনিস রাখা হত। কন্টাইয়ে এক ভদ্রলোকের বাড়িতে প্রথম পোর্সিলিনের শিব দেখি, জার্মানিতে তৈরি। মোটামুটি ১৯ শতকের শেষদিকের হবে। ওটাই আমার প্রথম সংগ্রহ। ১৮৮০ থেকে ১৯৩০ পর্যন্ত আমার সংগ্রহের সময়কাল ধরতে পারেন," পোর্সেলিনের সংগ্রহ প্রসঙ্গে জানালেন তিনি। শুধু পোর্সেলিন নয়, তার সংগ্রহে আছে হাজার হাজার নানাবিধ জিনিসের সমাহার। রেডিও স্পিকার, গ্রামাফোন, কাঠের টেলিফোন, বাক্স চরকা থেকে বাঁশ বা পেতলের তৈরি গরুর গলার ঘণ্টা সবই আছে। কাঁসা, তামা ও পেতলের তৈরি প্রায় একশো বছরের পুরনো পুজোর সরঞ্জামও রয়েছে অসংখ্য। এত সুসংবদ্ধভাবে সাজিয়েছেন তাঁর মিউজিয়ম যে দেখে অবাক হতে হয়! পানের সরঞ্জাম, পানের ডিবে, পিকদান, চুনদানি, পান সাজানোর বাক্স, পানের বাটা... শুধু পান সংক্রান্ত সংগ্রহই কত! মহিলার মুখের আদলে তৈরি পানবাটাও আছে। একেবারে খাঁটি বাঙালি জিনিসপত্র এগুলো। তার পাশেই রয়েছে অসংখ্য সুরমাদানি, গোলাপজলদানি, গাঁজার কলকে, কুনকে, গুপ্তি, ছড়ি, সিঁদুরকৌটো, কাজললতা, গড়গড়া, কৌটো কাটার যন্ত্র, মিষ্টির ছাঁচ, মুগুর, লোহার জাঁতি, ইকমিক কুকার, বিদেশ থেকে আসা পেতলের খাঁচা, বাচ্চা মেয়েদের বিয়েতে দেওয়া খেলনাবাটি। বেড়ি, খুন্তি, ঝাঁঝরি, চাটু...রান্নার সরঞ্জামও আছে। এমন কত রান্নার জিনিস এখন আর দেখতেই পাওয়া যায় না! তিনি দেখালেন বিশেষ 'তিন থাক গেলাস' বা 'জামাই ঠকানো গেলাস' (গ্লাসের নীচেই থাকত ছোট বাটি যাতে মিষ্টি দেওয়া হত যা প্রায় কেউই বুঝতে পারতেন না)। প্রায় খান পঞ্চাশেক চশমার মধ্যে ওয়েল্ডার্স গ্লাস, বাইকার্স গ্লাস, সুইমারস গ্লাস থেকে শুরু করে আই বাথ গ্লাস সবই পাওয়া গেল। ক্যামেরাও আছে প্রচুর। কিন্তু সবই সাধারণ মানুষের ব্যবহৃত ক্যামেরা। কোনও মহার্ঘ ক্যামেরা এমনকী কোনও এসএলআর ক্যামেরাও রাখেননি তিনি। জানালেন আরও একটা শখের ব্যাপারে, "আগেকার দিনে বিদেশ থেকে হরলিক্স আসত। হরলিক্সের কৌটো জমানোর শখ আমার বহু পুরনো। ১৯৪৫ সালের কৌটোও আছে আমার কাছে। দুধের বোতল, জলের বোতল (কিছু বোতল যুদ্ধে সেনাবাহিনীর ব্যবহৃত), বিষের বোতল (বোতলের উপরে স্পষ্টভাষায় লেখা 'নট টু বি টেকেন'), সোডা ওয়াটার বোতল, বার্লির কৌটো আছে। তখন ক্যালকাটা মিল্ক কো-অপারেটিভ সোসাইটির তৈরি দুধের বোতল আসত আমেরিকা থেকে! আমার আর একটা পছন্দের বিষয় হল কালির দোয়াত সংগ্রহ করা।"



পোর্সেলিনের দোয়াত

তাঁর সংগ্রহে আছে 'কাজলকালি' যা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ অনুমোদন করতেন! কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল, সেটিও তিনি এক ফেরিওয়ালার থেকেই সংগ্রহ করেছিলেন। বললেন, "কলম সংগ্রাহক অনেকেই আছেন, তবে দোয়াত জোগাড় করাটা কঠিন। ব্র্যান্ডেড কালির দোয়াতও জোগাড় করি। ইঙ্কস্ট্যান্ডও রয়েছে অনেক।" প্রায় এক ঘণ্টা কাটানোর পর যখন ভাবলাম আর বোধহয় কিছু দেখার নেই, তখনই তিনি নিয়ে গেলেন তাঁর ওজনযন্ত্রের সংগ্রহের দিকে। পুরনো দিনের নানা আকারের বাটখারা রয়েছে। শুধু যে এরকম থ্রি ডাইমেনশন বস্তুই আছে তাঁর জিম্মায়, এমনটা নয়। বই, পোস্টার-সহ আরও



বেকেলাইটের রেডিও

নানা জিনিস পরম যত্নে রাখেন তিনি। তাঁর বাড়ি থেকে বেরনোর সময় মনে হল অন্তত ঘণ্টা তিনেক সময় হাতে নিয়ে এলে তবেই বোধহয় ভালভাবে ঘুরে দেখা সম্ভব তাঁর মিউজ়িয়মটি!



মুদ্রায় ইতিহাস


সৌমেন নাথ

প্রাচীন সভ্যতার নানা দিকের প্রতিচ্ছবি ফুটে ওঠে মুদ্রার মাধ্যমে। আর সেই মুদ্রাই আকর্ষণ করেছিল সংগ্রাহক সৌমেন নাথকে। পেশায় ডিজ়াস্টার ম্যানেজমেন্ট দফতরের কর্মী তিনি। কয়েন সংগ্রহ করাটা তাঁর নেশা। আর সেই নেশায় ভর করেই তিনি জমিয়ে ফেলেছেন অসংখ্য কয়েন। তাঁর মূল উৎসাহের জায়গা প্রাচীন ভারত। মগধ, গান্ধার রাজার আমল থেকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি, কুষাণযুগের মুদ্রা থেকে পশ্চিমবঙ্গের চন্দ্রকেতুগড় বা কোচবিহারের প্রিন্সলি স্টেটের মুদ্রা—সব আছে তাঁর সংগ্রহে। ‘‘ছোটবেলাতে পুরনো মুদ্রা জমিয়ে রাখতাম। এক পয়সা, দু’পয়সার কয়েন জমাতে জমাতে হঠাৎই একদিন একটা অকশন সাইটের সন্ধান পেলাম। রেজিস্ট্রেশন করিয়ে বিড করলাম। এরপর বিভিন্ন যোগাযোগের সূত্রে আরও একাধিক মুদ্রা আমার হাতে এল,’’ শুরুর দিকের গল্প বলতে গিয়ে বললেন সৌমেনবাবু। মূলত অকশন হাউজ় আর প্রদর্শনী থেকেই তিনি পেয়েছেন এই মুদ্রাগুলো। কিন্তু তাদের হাতেই বা এগুলো আসে কীভাবে? ‘‘অনেকেই নদীতে কয়েন ছুড়ে ফেলেন। এ প্রথা প্রাচীনযুগেও ছিল। নদীর আশেপাশে অনেক ‘ধুলধুলিয়া’ থাকেন। মূলত এঁরাই কয়েনের স্থানীয় ডিলারের কাছে যান। আবার অনেকে পৈতৃক সূত্রেও কয়েন পান। প্রত্নতাত্ত্বিক খননকাজের ফলেও পাওয়া যায়। এভাবেই হাতবদল হয়। যাঁরা কয়েন নিয়ে নাড়াঘাঁটা করেন, তাঁরা মোটামুটি বুঝতে পারেন যে কোন মুদ্রা কোন যুগের। আমাদের কাছে অনেকসময় একেবারে অপরিষ্কার মুদ্রা আসে। পরিষ্কার করার জন্য তেল বা কেমিক্যালের সাহায্য নিতে হতে পারে। ইলেকট্রোসিসও করতে হয় মাঝেমাঝে। মুদ্রার উপর যে প্রাকৃতিক আস্তরণ থাকে, তা যেন নষ্ট না হয়,’’ জানালেন তিনি। তাঁর কাছে হাজার দুয়েক মুদ্রা আছে। তার মধ্যে প্রাচীনতম মুদ্রা হল ৫০০-৬০০ খ্রিষ্টপূর্বের (গান্ধার যুগ)। তাঁর বিশেষ পছন্দের মুদ্রা হল অমোঘভূতি। ‘‘প্রাচীন মুদ্রায় নানা রকম চিহ্ন বা মার্ক থাকত। গৌতম বুদ্ধের সময় ভারতে ১৬টা বড় জনপদ ছিল। ওঁদের মুদ্রায় কোনও স্ক্রিপ্ট থাকত না। এক একটি চিহ্ন এক একটি জনপদের পরিচায়ক ছিল। মগধে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক মুদ্রা পাওয়া গিয়েছে। প্রাচীন ভারতের সবচেয়ে ছোট মুদ্রা ‘মাশাকা’-র উপরে সুন্দর কারুকাজ দেখতে পাবেন। মাশাকা একটা মুসুরডালের দানার থেকেও ক্ষুদ্রতর। ইন্দো গ্রিক কয়েনে প্রথম হরফ ব্যবহার করা শুরু হল। পরবর্তীকালে কুষাণ যুগের কয়েনে রাজার মুখ ও স্ক্রিপ্ট পাওয়া যায়,’’ ইতিহাসের দিকটা জানালেন তিনি। এক এক যুগের মুদ্রায় ওজনের তারতম্যের কথাও জানালেন তিনি। ওজনের এই তারতম্য আবার ধাতু অনুযায়ী বদলে যেত। আর ওজনের উপর ভিত্তি করেই কয়েনে ‘পাঞ্চিং’ করা হত। গুপ্তযুগ পর্যন্ত অসংখ্য কয়েন তাঁর সংগ্রহে। ব্রিটিশ আমলেরও কিছু কয়েন রেখেছেন তিনি। এছাড়াও আছে চন্দ্রকেতুগড়ের মুদ্রা। আছে ব্রিটিশ-শাসিত ভারতের প্রিন্সলি স্টেট কোচবিহারের মুদ্রাও আছে তাঁর কাছে। মুদ্রা সে যুগের সংস্কৃতি, ধর্ম ও জনজীবনের পরিচায়ক। আর এই দিকটাই বোধহয় সৌমেনবাবুর কাছে সবচেয়ে আকর্ষণের বিষয়। ৭০০-৮০০ খ্রিষ্টাব্দে বাংলার নানা মুদ্রা তাঁর সংগ্রহে আছে। শুধু সংগ্রহ নয়, মুদ্রা সংরক্ষণেও বিশেষ নজর দিয়েছেন তিনি। ‘‘আমার কয়েন অ্যালবাম আছে। সেখানেই সাজিয়ে রাখি। আলাদা বাক্সও আছে। এছাড়া বিভিন্ন ধাতব কয়েনগুলোর সঠিক রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বেশ কিছু পদ্ধতি অবলম্বন করতেই হয়,’’ জানালেন ইতিহাসের এই উৎসাহী সংরক্ষক।


মাশাকা—ক্ষুদ্রতম মুদ্রা

চন্দ্রকেতুগড়ের কয়েন

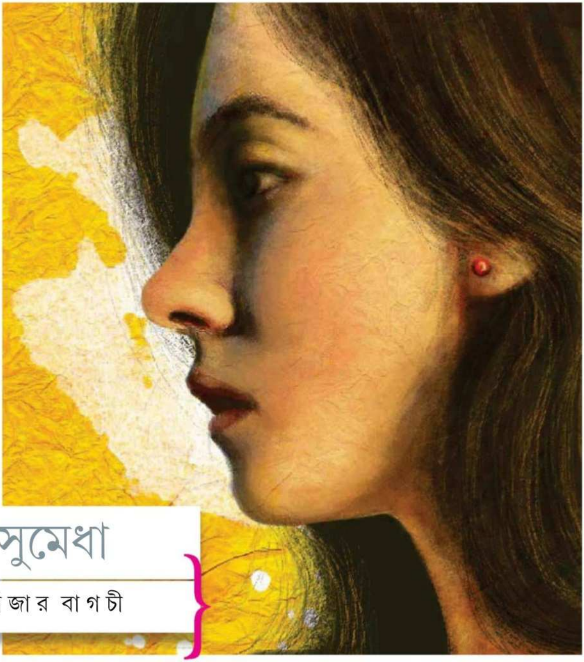
ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কয়েন

কোচবিহারের মুদ্রা

অমোঘভূতি

নকু বাবু ও পল্লব রায়ের সংগ্রহের

ছবি: দেবর্ষি সরকার



সুমেধা

সিজার বাগচী

বসার ঘরের পরদা ঠেলে যে মেয়েটি বেরিয়ে এল, তাকে এখানে আশা করেনি অনির্বাণ। এক মুহূর্তের জন্য ও হাঁ করে তাকিয়ে থাকল মেয়েটার দিকে। এ তো সুমেধা! প্রায় বছরদশেক বাদে অনির্বাণ আবার সুমেধাকে দেখল। একই আছে মেয়েটা। টিকলো নাক। টানা টানা চোখ। ছিপছিপে ফিগার। শুধু স্কুল-কলেজে পড়ার সময় যে প্রায় কোমর পর্যন্ত ছাপানো চুল ছিল, সেটা আর নেই। সেই চুল উঠে এসেছে কাঁধের কাছাকাছি।

অনির্বাণ বোধ হয় বাড়াবাড়ি করে ফেলেছিল। তাই ওকে কোনও কথা বলার সুযোগ না দিয়ে আশিসদাই বলে উঠল, "আসুন। বসুন। অবশ্য আমি আর আপনাকে বসতে বলার কে! এ তো আপনারই বাড়ি।"

সুমেধা একবারও অনির্বাণের দিকে ফিরে তাকাল না। সোজা গিয়ে বসল আশিসদার মুখোমুখি। বলল, "বলুন?"

"আমরা একটা সার্ভে করতে এসেছি।"

সুমেধা হাসল। অনির্বাণ লক্ষ করল, এখনও হাসলে সুমেধার ডান গালে টোল পড়ে।

আশিসদা বলতে থাকল, "সেই ব্যাপারেই আমি কয়েকটা মামুলি প্রশ্ন করতে চাইছি..."

"ডোন্ট মাইন্ড, আপনাদের ঠিক সার্ভে করতে আসা ছেলেমেয়েদের মতো মনে হচ্ছে না।"

আশিসদা মাথা নাড়ল। অল্প হেসে বলল, "ঠিকই ধরেছেন। সুরজিৎ কিছু বলেনি?"

"ও শুধু বলেছে যে আপনারা আসবেন। আর কিছু..."

অনির্বাণ এবার নিজেকে গুছিয়ে নিয়ে প্রশ্ন করতে গেল। তার আগেই আশিসদা বলে উঠল, "আমি হচ্ছি থমসন ব্রাদার্সের এরিয়া ম্যানেজার আশিস সেন। আর উনি হলেন অনির্বাণ রায়চৌধুরি। আমাদের কোম্পানির সেলস অফিসার। এই এরিয়াটা আমরা কভার করি।"

"আপনারা চা খাবেন?"

"চা!" আশিসদা থমকাল। একবার অনিবার্ণের দিকে তাকিয়ে নিয়ে বলল, "খেতে পারি। তবে দুধ, চিনি ছাড়া। লিকার।"

“আপনি?” সুমেধা এবার সরাসরি তাকাল অনির্বাণের দিকে।
অনির্বাণ বলল, “আমি দুধ, চিনি খাব।”
“জাস্ট আ মিনিট,” বলে সুমেধা উঠে গেল।
ওরা দু'জন বাইরের ঘরে বসে থাকল। সকাল থেকে আকাশ মেঘলা। সূর্য মনে হয় সি এল নিয়েছে। আজ আর উঠবে না। তাই চাপা গুমোট আবহাওয়া। সেই গুমোট মেঘলা দিনে আশিসদা আর অনির্বাণ বাড়ি বাড়ি ঘুরছে।
সুমেধা বেরিয়ে যেতেই আশিসদা বলল, “মেয়েটা ঘরে ঢুকতেই ওইভাবে হাঁ করে তাকিয়েছিলি কেন!”
অনির্বাণ হেসে ফেলল। বলল, “পরে বলব।”
“চিনিস?” চাপা গলায় জানতে চাইল আশিসদা।
অনির্বাণ একইভাবে বলল, “বলছি। আগে এখান থেকে বেরোই।”
আশিসদা আর কথা বাড়াল না। যে কাজে এসেছে, সেই কাজটা আপাতভাবে মামুলি মনে হলেও, কোম্পানি বিষয়টা হালকাভাবে দেখছে না। থমসন ব্রাদার্সের অনেক জিনিসপত্রই বাজারে ছড়ানো। বড় কোম্পানি, কাজের চাপও প্রচুর। এবার কোম্পানি একটা নতুন কাপড় কাচার সাবান বাজারে আনতে চলেছে। সেই সাবানের দাম একটু উঁচুর দিকে। তাই এমন জিনিস বাজারে ছাড়ার আগে কোম্পানি একবার বাজারটা বোঝার চেষ্টা করছে। সরাসরি স্টাফদের দিয়ে একটা সমীক্ষা করে দেখে নিতে চাইছে, একটু উচ্চবিত্ত পরিবারগুলো কী ধরনের সাবান ব্যবহার করে। এবং কেনই বা তারা ওই ব্র্যান্ড ব্যবহার করে থাকে।
সেলসের ব্যাপারে আশিসদার কিছু ফরমুলা রয়েছে। যেমন, আশিসদা বারবার বলে থাকে, “জিনিসটা কে ব্যবহার করবে সেটা বড় কথা নয়। বড় কথা হল, জিনিসটা যে কেনা হবে, সেটা কে ঠিক করবে? আমাদের টার্গেট হল সেই লোকটাকে খুঁজে বের করা। সেই লোকটাকে কনভিন্স করতে পারলেই জানবি তোর মাল বিক্রি হচ্ছে।”
এবারও কোম্পানি যখন সমীক্ষার নির্দেশ দিল, তখন আশিসদা প্রথমেই ছক কষে দেখল, কাপড় কাচা ব্যাপারটা সাধারণত দেখে থাকে পরিবারের মহিলারা। অতএব বিভিন্ন এলাকার সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভদের দিয়ে কয়েকটা বিশেষ পরিবারকে বেছে ফেলল আশিসদা। তারপর একে একে সেই সব পরিবারের মহিলাদের সঙ্গে কথা বলা শুরু হল। অন্য একটা দুটো এলাকা সেরে আশিসদা আজ এসেছে অনির্বাণের এলাকায়। তিনটে বাড়িতে গিয়ে ইতিমধ্যেই কথা বলা হয়েছে। এবার সুমেধার বাড়িতে হাজির হয়েছে ওরা। আজকের লিস্টে এরপর আরও চারটে বাড়ি।
সুমেধা চা করতে সেই যে গিয়েছে, এখনও ফেরেনি। প্রায় পাঁচ মিনিট হয়ে গেল। অনির্বাণ উশখুশ করতে থাকল একটা সিগারেটের জন্য। আশিসদা নির্বিকার মুখে মোবাইল ঘাঁটছে। বোধ হয় ইমেলগুলো দেখছে। খুট খুট করে রিপ্লাইও দিচ্ছে বিভিন্ন ইমেলের।
অনির্বাণের ভারী মজা লাগছিল। প্রযত্ন, অন্বয়ের সঙ্গে অনেকদিন যোগাযোগ নেই। প্রযত্ন সম্ভবত বেঙ্গালুরুতে। অন্বয় যে কোথায় অনির্বাণ জানে না। যদি ওদের সঙ্গে যোগাযোগ থাকত তা হলে ও হয়তো এক্ষুনি মেসেজ পাঠাত। কিছু করার নেই দেখে অনির্বাণ একবার সারা ঘরে চোখ বোলাল। ঘরের ইন্টিরিয়র দেখলে অনায়াসে বোঝা যায়, সুমেধার বেশ বড়লোক পরিবারেই বিয়ে হয়েছে। ওর স্বামী কী করে জানতে পারলে ভাল হত।
অনির্বাণের মনে পড়ল সেই স্কুলবেলার কথা। সুমেধাকে প্রথম দেখার দিন। অবশ্য দেখার আগে সুমেধার কথা ও অনেক শুনেছিল প্রযত্নর মুখে। স্কুলে এসেই প্রযত্ন ঘোষণা করেছিল, নিজের হবু স্ত্রীকে ও পেয়ে গিয়েছে।
অনির্বাণরা তখন ক্লাস নাইনে। তখন যে মেয়েকে ভাল লাগত মনে হত তাকেই বুঝি বিয়ে করবে। তাই প্রযত্নের কথায় ওরা ঝাঁপিয়ে পড়েছিল জানতে সেই হবু স্ত্রী-র কথা।
প্রযত্ন বলেছিল, “মেয়েটার নাম সুমেধা।”
“পড়াশোনায় ভাল বুঝি?” পাশ থেকে জ্যোতি ফোড়ন কেটেছিল, “নামের থেকেই তো মেধা চলকে পড়ছে।”
প্রযত্ন ভুরু কুঁচকে জ্যোতির দিকে তাকিয়ে বলল, “একবার দেখলে তোর জ্যোতি কমে যাবে রে। যাস আমাদের বাড়িতে। ছাদে নিয়ে গিয়ে দেখাব।”
“তোর হবু বউকে ছাদে রেখেছিস নাকি?” জ্যোতি ফের বলল।
সেদিন অনির্বাণ মাঝখানে না থাকলে বোধ হয় প্রযত্ন আর জ্যোতির তুমুল মারপিট লেগে যেত। অনির্বাণই সামলাল দু'পক্ষকে।
প্রযত্ন ঠান্ডা হতে যা জানাল, তা হল, মেয়েটা নতুন ভাড়া এসেছে ওদের পাড়ায়। ঠিক উলটো দিকের বাড়িতেই। বাবা বোধ হয় কোনও সরকারি চাকরি করে। মোটা গোঁফ। খুব গম্ভীর। চারবার দেখেছে প্রযত্ন। কোনওবারই সুমেধার বাবাকে হাসতে দেখেনি। সুমেধাও খানিকটা বাবার মতো। তবে মেয়েটা মারকাটারি সুন্দরী। প্রযত্নদের বাড়িতে যে ঠিকে কাজ করে সেই বিমলমাসিকে বলতে শুনেছে, “ওরা লোক খুব ভাল। মেয়েও যেমন, মা-ও তেমন।”
কিছুদিন বাদেই প্রযত্ন আরও জানাল, সুমেধা নাকি দুর্দান্ত নাচতে পারে। ভরতনাট্যম।
এবারও অনির্বাণ, জ্যোতি আর প্রযত্ন টিফিনের সময় বসেছিল স্কুলের মাঠে। এবং এবারও যথারীতি জ্যোতি নির্বিকারভাবে বলে উঠল, “তুই ভরতনাট্যমও বুঝিস! একবার নেচে দেখা তো।”
আগের বারের মতো অনির্বাণ মাঝখানে না থাকলে আবার দু'জনের লেগে যেত। কারণ প্রযত্ন ততদিনে, ওই সিনেমার ভাষায় যাকে বলে, একেবারে দিওয়ানা। রাস্তা দিয়ে ফেরার পথে চুনকাম করা দেওয়াল দেখলে ও ইটের কুচি কুড়িয়ে সেখানে লিখত, প্র+সু। কখনও আবার লাল কালি দিয়ে হৃদয় আঁকত। সেই হৃদয়ে দুটো তির গাঁথা। তিরদুটোর পাশে লেখা প্রযত্ন-সুমেধা।
তবে স্কুলে সুমিতবাবুর অঙ্ক ক্লাসে একটু গোলমাল করে ফেলেছিল প্রযত্ন। সেদিন সুমিতবাবু এক মনে অঙ্ক করাচ্ছিলেন। আর পিছনের বেঞ্চে বসে প্রযত্ন আর জ্যোতি একটা খাতায় কিছু আঁকিবুকি কাটছিল। আচমকা সুমিতবাবু সেটা লক্ষ করেন। সুমিতবাবু যে ওদের লক্ষ করছেন সেটা প্রযত্নরা ধরতে পারেনি। সুমিতবাবু পড়াতে পড়াতে এসে ছোঁ মেরে খাতাটা টেনে নেন। এক ঝলক তাকিয়েই তিনি বুঝতে পেরে গিয়েছিলেন, কী করছিল ওরা। হাতের ডাস্টারটা বাগিয়ে তিনি প্রথম জ্যোতিকে বললেন, “হাত পাত।”
সুমিতবাবুর ডাস্টারপেটা স্কুলখ্যাত। জ্যোতি কিছুক্ষণ 'আর করব না স্যর' বলে মার এড়ানোর চেষ্টা করেছিল। কিন্তু কপাল খারাপ। সুমিতবাবু কোনও কারণে সেদিন চটেই ছিলেন। তাই বললেন, “চটপট হাত পাত। দেরি করলে কিন্তু আরও মারব।”
জ্যোতি হাত এগিয়ে দিল। ওর ডান হাতে চারটে আর বাঁ হাতে চারটে মার পড়ল। অনির্বাণ একবার দেখেই বুঝতে পারছিল আট ঘা ডাস্টারের বাড়ি খেয়ে জ্যোতির জ্যোতি নিভে গিয়েছে। দুটো হাত চেপে ও ধপ করে বেঞ্চে বসে পড়ল। ওদিকে প্রযত্ন ডান হাত এগিয়ে দিল। সুমিতবাবুর ডাস্টার সপাটে নেমে এল সেই হাতের উপর। পরপর চারবার।
এবার সুমিতবাবু বললেন, “বাঁ হাত দে।”
প্রযত্ন ইতস্তত করে বলল, “না স্যর। ডান হাতেই মারুন।”
“কেন?” সুমিতবাবু চোখ ছোট করে তাকালেন, “তোর বাঁ হাতে কী হয়েছে?”
“কিছু না স্যর। ডান হাতেই মারুন।”
সুমিতবাবুর কেমন রোখ চেপে গেল। তিনি গম্ভীর স্বরে বললেন, “বাঁ হাত দে বলছি। না হলে আরও পেটাব।”

প্রযত্ন কিছুতেই বাঁ হাত এগিয়ে দেবে না। ওর একটাই বায়না, "স্যর ডান হাতে মারুন।"
এবার গোটা ক্লাস উৎসুক হয়ে উঠল প্রযত্নের বাঁ হাত নিয়ে। কী আছে ওই হাতে? সুমিতবাবু এবার হ্যাঁচকা টান মেরে প্রযত্নের বাঁ হাতটা টেনে নিলেন। সেই হাতের মুঠো খুলতেই দেখা গেল সেখানে লাল কালি দিয়ে লেখা, 'আই লাভ সুমেধা।'
সুমিতবাবু প্রাচীন আমলের মানুষ। আর দু'বছর বাদেই তিনি অবসর নেবেন। তার উপর সুমেধা নামটা যে কোনও কারণেই হোক একটু হালকা হয়ে গিয়েছিল। তিনি 'সুমেধ' পড়তে পারছিলেন। তাই বার দুই হোঁচট খেয়ে পড়লেন, "আই লাভ সুমেধ! সুমেধ!"
জ্যোতি ততক্ষণে সামলেছে। ও পাশ থেকে ফস করে বলে বসল, "ওটা স্যর ওর মামাতো ভাইয়ের নাম।"
সুমিতবাবু আশ্চর্য হয়ে বললেন, "মামাতো ভাইয়ের নাম লাল কালি দিয়ে বাঁ হাতে লিখেছে? তাও আবার ওইভাবে?"
"হ্যাঁ স্যর। আমরাও তো তাই বলেছি ওকে। তুই ভাইয়ের নাম ওইভাবে লিখিস না। ওতে ভাইয়ের অকল্যাণ হবে। ভাইয়ের অকল্যাণের কথা ভেবেই স্যর ও ডান হাত বাড়াচ্ছিল বারবার। যদি আপনার ডাস্টারের বাড়িতে ভাইয়ের কোনও আঘাত লাগে!"
সুমিতবাবু কী বুঝেছিলেন কে জানে। আরও চার ঘা ডাস্টারের বাড়ি মেরে প্রযত্নকে সেদিন অব্যাহতি দিয়েছিলেন।
কিন্তু এত ভালবাসা থাকলেও প্রযত্ন কিছুতেই এগোতে পারছিল না। এমনকী সুমেধার সঙ্গে আলাপ পর্যন্ত করার সাহস ছিল না ওর।
জ্যোতি বারবার বলত, "তোর দ্বারা মাইরি কিচ্ছু হবে না। সোজা চলে যা ওদের বাড়িতে।"
"গিয়ে কী বলব, 'মাসিমা মালপোয়া খামু!'"
প্রযত্ন খিঁচিয়ে উঠত জ্যোতির প্রস্তাব শুনে।
অনির্বাণ এবার বলল, "দাঁড়া, মেয়েটার সম্পর্কে একটু খোঁজখবর করতে হবে। এই জ্যোতি চল, এই রবিবার প্রযত্নের বাড়ি যাব। আগে মেয়েটাকে দেখা দরকার।"
জ্যোতি রাজি হল। নির্দিষ্ট দিনে দু'জনে হাজিরও হল। প্রযত্ন প্রথমে ওদের ছাদে নিলে গেল। ছাদ থেকে সুমেধাদের বাড়িটা ভাল করে দেখা যায়। প্রযত্নদের বাড়িটা দোতলা। সুমেধারা যে বাড়ি ভাড়া নিয়েছে, সেটা একতলা। তবে সেই বাড়িতে বাড়িওয়ালা থাকে না। পুরো বাড়ি জুড়েই সুমেধারা রয়েছে। দোতলার ছাদ থেকে অনির্বাণরা দেখল, সুমেধাদের একতলার ছাদে এক মাঝবয়সি ভদ্রমহিলা বড় গামলায় করে কাপড় কেচে এনে দড়িতে শুকোতে দিচ্ছে।
প্রযত্ন বলল, "মন দিয়ে দ্যাখ। ওটাই সুমেধার মা।"
"ধুস শালা, মাকে দেখে কী করব। মেয়ে কোথায়!" জ্যোতি বলল।
"দেখাচ্ছি, দেখাচ্ছি," প্রযত্ন বলল।
এর পর প্রযত্ন ছাদের এক প্রান্তে নিয়ে এল ওদের। সেখান থেকে সুমেধাদের বাড়ির একটা ঘরের অংশ দেখা যাচ্ছিল। সেই অংশে একটা টেবল রয়েছে জানলার ধারে। তাতে প্রচুর বই। টেবলের পাশে একটা বিছানার খানিকটাও চোখে পড়ছিল।
প্রযত্ন ওদিকে দেখিয়ে বলল, "এখান থেকে তাকিয়ে থাক। ওটা সুমেধার ঘর। ওই টেবিলে বসে ও লেখাপড়া করে।"
"এখন সকাল এগারোটা বাজতে চলল। এখন লেখাপড়া করবে!" অনির্বাণ বলল।
"আরে আমি কী করে জানব। সকালের দিকে তো আমি স্কুলে যাই। সন্ধের পর অন্ধকার ছাদে এসে দাঁড়াই, তখন ও পড়তে বসে।"
"এখান থেকে ওর মুখ দেখতে পাস?" অনির্বাণ অবাক হল।
"মাঝে-মাঝে। বেশির ভাগ সময় হাত-টাত..."
জ্যোতি এবার খেপে গেল। বলল, "অনি, আজ শালাকে ছাদ থেকে নীচে ফেলব। ইয়ার্কি মারার জায়গা পায়নি।"
জ্যোতি হয়তো সত্যিই প্রযত্নকে ধরত। তার আগেই প্রযত্ন বলল, "ওই দ্যাখ।"
অনির্বাণরা আবার তাকাল একতলা ছাদের দিকে। এবার একটা মেয়ে হাতে বড় বালতিভর্তি কাচা জামাকাপড় নিয়ে ছাদে এসেছে।
প্রযত্ন না বলে দিলেও ওরা দু'জন বুঝে গিয়েছিল ওটাই সুমেধা। একটা গোলাপি সালোয়ার কামিজ পরেছে মেয়েটা। নেহাতই ঘরে পরার সালোয়ার কামিজ। তবু সেই সালোয়ার কামিজেই যেন মনে হচ্ছিল, গোটা ছাদ আলো হয়ে গিয়েছে। সত্যিই এই এলাকায় এত সুন্দরী মেয়ে অনির্বাণ দেখেনি। সুমেধা আর ওর মায়ের কিছু কথা হাওয়ায় উড়ে এল। তা থেকে তিন বন্ধু শুনতে পেল, মায়ের পর সুমেধাই বাকি জামাকাপড় কেচেছে। তার একটার থেকে রং উঠছে।
প্রযত্ন এবার গর্বের হাসি হেসে বলল, "কী বুঝলি!"

এবার গোটা ক্লাস উৎসুক হয়ে উঠল প্রযত্নের বাঁ হাত নিয়ে। কী আছে ওই হাতে? সুমিতবাবু এবার হ্যাঁচকা টান মেরে প্রযত্নের বাঁ হাতটা টেনে নিলেন।

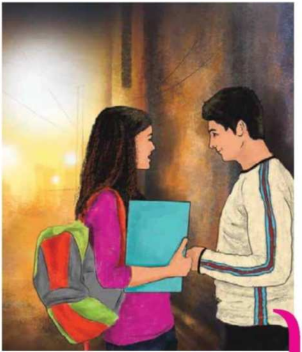


অনির্বাণ কিছু বলার আগে জ্যোতি বলল, "বুঝলাম যে, এই মেয়েকে বিয়ে করলে তোদের ধোপাবাড়ির খরচ বেঁচে যাবে। এত কাচা কোনও সাধারণ মানুষ কাচতে পারে! তোর সুমেধা নিশ্চয়ই গত জন্মে রামী ধোপানি ছিল।"
এবারও অনির্বাণ মাঝখানে থাকায় দু'জনের ঝামেলা বেশি দূর এগোল না। তবে অনির্বাণ বুদ্ধি দিল, "এভাবে হবে না প্রযত্ন। তুই সরাসরি কথা বলার চেষ্টা কর।"
"বলব তো! কিন্তু কাকে ধরে ঢুকব বলতো!"
জ্যোতি বলল, "কেন তোদের বিমলামাসি!"
প্রযত্ন এমনভাবে অনির্বাণের দিকে তাকিয়ে থাকল যেন জ্যোতির কথা শুনতে পায়নি।
অনির্বাণ বলল, "মেয়েটা পাড়ায় মেশে না?"
"মেশে। অন্য মেয়েদের সঙ্গে। ছেলেদের সঙ্গে মিশতে দেখিনি।"
"বাবা মা কেমন? তোদের বাড়ি আসে টাসে?"
"নাহ। উলটে একদিন আমার মায়ের সঙ্গে হালকা কথা কাটাকাটি হয়েছে রিকশা ধরা নিয়ে।"
"মানে!" এবার জ্যোতি বলল।
"ওই দু'জনেই একটা রিকশা ডেকেছিল। এবার রিকশা আসতে দু'জনেই ক্লেম করেছিল রিকশাওয়ালা আসলে তার ডাকে সাড়া দিয়ে এসেছে।"
"এ তো মামুলি ব্যাপার।"
"তোর কাছে। মায়েদের কাছে নয়। সেই থেকে দু' পক্ষের মুখ দেখাদেখি বন্ধ।"
"জটিল কেস," অনির্বাণ থাকতে না পেরে বলল।
"তোরা কিছু কর মাইরি। আমি না হলে মরে যাব," প্রযত্ন কাঁদো কাঁদো গলায় বলল।
"একটা কাজ করা যায়," অনির্বাণ বলল, "তুই চিঠি লেখ। সে না হয় ইন্দ্রনাথকে দিয়ে চিঠি লিখিয়ে নেওয়া যাবে।"
ইন্দ্রনাথ ওদের ক্লাসেই পড়ে। প্রেমপত্র লেখার জন্য সারা এলাকায় ওর বিশেষ খ্যাতি। সেই খ্যাতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, এখন কোনও ছেলে গিয়ে অন্য স্কুলের মেয়েকে চিঠি দিলে মেয়েটা চিঠিতে চোখ বুলিয়ে জানতে চায়, "এটা নিজে লিখছ নাকি ইন্দ্রনাথকে দিয়ে লিখিয়ে এনেছ!"
ইন্দ্রনাথ হুট করে চিঠি লেখে না। আগে মেয়েটাকে দেখে। শোনে

মেয়েটা কী ভালবাসে। রবীন্দ্রসঙ্গীত না কিশোরকুমারের হিন্দি গান। প্রিয় নায়ক কে। পড়াশোনায় কেমন। তারপর চিঠি লিখতে বসে। কোনও চিঠিতে থাকে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের গানের লাইন। কোনও চিঠিতে থাকে হিন্দি শায়রি। মানে যেমন মেয়ে, তেমন চিঠি।
কিন্তু ইন্দ্রনাথকে দিয়ে চিঠি লেখানোর প্রস্তাবে প্রথম বাগড়া দিল জ্যোতি। বলল, "উঁহু সেটা ঠিক হবে না।"
"কেন?" অনির্বাণ জানতে চাইল।
"প্রথমত, পরপর অনেকগুলো সাকসেস পাওয়ার পর ইন্দ্রনাথ রেট বাড়িয়েছে। আগে ছিল একটা এগ রোল। এখন দুটো চিকেন রোল।"
"ওটা ম্যানেজ হয়ে যাবে," প্রযত্ন বলল।
"দ্বিতীয় পয়েন্ট হল, চিঠিটা যদি হুট করে বড়দের হাতে চলে যায়, তা হলেই কিন্তু কেলেঙ্কারি। এ একেবারে লায়লা মজনু কেস। দুই বাড়ির মধ্যে রিকশা ডাকা নিয়ে শত্রুর সম্পর্ক।"
"তা হলে কী করা যায়?" অনির্বাণ প্রশ্ন তুলল।
"আমি বলব?" জ্যোতি বলল, "প্রযত্নকে দিয়ে হবে না। তুই যা।"
"আমি যাব মানে!" অনির্বাণ অবাক হল।
"আমাদের তিনজনের মধ্যে তুই মেয়েদের সঙ্গে সহজে কথা বলতে পারিস। তুই গিয়ে আলাপ কর।"
"তাতে লাভ!"
"লাভ আছে। তুই আলাপ করার পর প্রযত্নের সঙ্গে আলাপ করাস।"
"সেই আঙুল ফল পাকতে পাকতে বছর ঘুরে যাবে। ততদিনে না অন্য কেউ মেয়েটাকে তুলে নেয়," অনির্বাণ বলল।
জ্যোতি আরও একটু ভাবল। বলল, "তা হলে এক কাজ কর। তুই গিয়ে সরাসরি মেয়েটাকে বল প্রযত্নের কথা। অন্তত একবার দু'জনকে মুখোমুখি কর। তারপর যা হওয়ার হবে।"
অনির্বাণ একটু থমকাল। কাজটা কি করা যাবে! কিন্তু জ্যোতির বুদ্ধিটা প্রযত্ন লুফে নিল। বলল, "হ্যাঁ, এটাই ভাল আইডিয়া। তুই গিয়ে আলাপ কর অনি। তারপর আমায় ডাকিস।"
সেই কথাই ঠিক হল। এর পর তিনজনে মিলে প্ল্যান করল কোথায় কথা বলা হবে সুমেধার সঙ্গে। অনেক ভাবনাচিন্তার পর প্রযত্ন জানাল, সোম, বুধ, শুক্র সুমেধা পড়তে যায় অরুণস্যরের কোচিংয়ে। ফেরার সময় ওর সঙ্গে শর্মিষ্ঠা বলে একটা মেয়ে থাকে। কিন্তু সামনেই কুমিল্লা পাড়ার মোড়ে শর্মিষ্ঠার বাড়ি। শর্মিষ্ঠা বাড়ি ঢুকে যাওয়ার পর বাকি রাস্তা সুমেধা একাই ফেরে। অতএব মেয়েটাকে ধরতে হবে ওই জায়গাতেই।
পরের দিনই সোমবার। সেদিন সন্ধেবেলা নির্দিষ্ট জায়গায় ওত পেতে থাকল তিনবন্ধু। জায়গাটা একটু ফাঁকা ফাঁকা। তবে রাস্তায় আলো রয়েছে। খানিক দূর থেকে সুমেধাকে একা ফিরতে দেখে প্রযত্ন আর জ্যোতি একটু আড়ালে চলে গেল। দাঁড়িয়ে থাকল একা অনির্বাণ। একটু যে বুক ঢিপ ঢিপ করছিল না তা নয়। সবচেয়ে বড় কথা সুমেধা এত সুন্দরী যে ওর সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলতে হবে ভাবলে অনির্বাণ কেমন খেই হারিয়ে ফেলছিল। প্রযত্ন যদি মাঝখানে না থাকত হয়তো ও নিজেই চেষ্টা করত সুমেধাকে প্রোপোজ় করার।
এক-দু' মিনিটে সুমেধা ওর সামনে চলে এল। অনির্বাণ বারতিনেক জোরে নিশ্বাস ছেড়ে মনের জড়তা কাটাল। তারপর সুমেধার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে বলল, "তোমার সঙ্গে একটু কথা ছিল।"
সুমেধা সরাসরি ওর চোখের দিকে তাকাল। মেয়েটা যে ঘাবড়েছে কিংবা ভয় পেয়েছে, তা দেখে মনে হল না। ঠান্ডা গলায় ও বলল, "তুমি কি প্রোপোজ় করবে বলে দাঁড়িয়ে আছ?"
"আমি ঠিক নয়। আমার বন্ধু। তোমার পাশের বাড়িতে থাকে। চেনো নিশ্চয়ই। প্রযত্ন। ও তোমায় খুব ভালবাসে। তাই..."
"তুমি বন্ধুর হয়ে প্রোপোজ় করছ!" সুমেধা একইভাবে বলল।
"আমি শুধু প্রস্তাব দিলাম..."
"মানেটা তো একই হল। তা তোমার বন্ধুর বাবা কী করেন?"
"কাকু কাস্টমসে চাকরি করেন। কেন?"
"তা কাকুর মাইনের কত পার্সেন্ট তোমার বন্ধু হাতাতে পারবে?"
অনির্বাণ কী বলবে ভেবে পেল না। শুধু অস্ফুটে বলল, "কেন?"
"বাহ রে! আমায় ফুচকা, ভেলপুরি খাওয়াতে হবে না। আমি কি এমনি এমনি ঘুরব ওর সঙ্গে! আরও তো অনেকেই আছে লাইনে। যে বেশি হাতাবে তার সঙ্গে ঘুরব।"
"আমি ওকেই ডাকছি। ওর কাছে থেকেই শুনো," অনির্বাণ বলল।
"এই দেখো, তুমি বন্ধুর জন্য গার্লফ্রেন্ড জোগাড় করতে এসেছ। আর হোমওয়র্ক ঠিকমতো করোনি। এভাবে কি হয়! ওকে ডাকার দরকার নেই। তুমি জেনে নিয়ে আমায় বোলো। আর যদি ঠিকমতো ভেলপুরি, ফুচকা না খাওয়াতে পারে, উপরন্তু এভাবে অন্ধকারে আমার পিছনে ঘোরে, আমি কিন্তু বাড়ি গিয়ে বাবাকে বলে দেব। কেমন! চাও কি? বাবাকে নিয়ে তোমার বন্ধুর বাড়িও গিয়ে হাজির হব।"
সুমেধা চলে গেল। অনির্বাণ ফ্যালফ্যাল করে সেই যাওয়া দেখল। সুমেধা চোখের আড়াল হতেই বাকি দু'জন বেরিয়ে এল। জ্যোতি জানতে চাইল, "কীরে ডাকলি না প্রযত্নকে! কী বলল মেয়েটা?"
অনির্বাণ ধীরে ধীরে সব বলল। শুনে প্রযত্নের মুখ শুকিয়ে গেল। মিনমিন করে বলল, "আজ গিয়েই বাবাকে বলবে না তো! তা হলে কেলো হয়ে যাবে।"
জ্যোতি বলল, "ডেঞ্জারাস! এই মেয়েকে বিয়ে করিস না প্রযত্ন। এ মেয়ে নয়, ইলেকট্রিক ইল।"
এর কিছুদিন বাদেই সুমেধারা ওই ভাড়াবাড়ি ছেড়ে অন্য পাড়ায় চলে গেল। সেখানে ওর বাবা ফ্ল্যাট কিনেছিল।

"কেসটা কী হল বলতো! মেয়েটা সেই যে গেল, এখনও এল না," আশিসদার কথায় হুঁশ ফিরল অনির্বাণের।
আলতো করে হাই তুলল অনির্বাণ। বলল, "অন্য বাড়ি দেখবে। এখানে অনেকক্ষণ হাঁ করে বসে আছি।"
"আমিও তাই ভাবছি," আশিসদা মাথা নেড়ে সায় দিল প্রস্তাবে।
আর ঠিক তখনই সুমেধা ঢুকল। পিছনে একটা কাজের মেয়ে। সুমেধার হাতে একটা ট্রে-তে দুটো চায়ের কাপ। আর পিছনের মেয়েটা হাতে দুটো প্লেট। তাতে স্যান্ডউইচ আর মিষ্টি।
ওদের সামনের সেন্টার টেবলে চা এবং বাকি প্লেট রাখা হল। এবার সুমেধা হেসে বলল, "দুপুরবেলা এলেন। একটু কিছু না খেলে হয়। তাই বেশি সময় নিয়ে ফেললাম।"
আশিসদা হেসে চায়ের কাপ নিল। বলল, "এত কিছু না করলেও চলত। আমরা খেয়ে বেরিয়েছি।"
সুমেধা শুধু হাসল। একবার অনির্বাণের দিকে তাকিয়ে বলল, "আপনি চা নিন। দেখুন দুধ, চিনি ঠিক আছে তো?"
অনির্বাণও চায়ের কাপ নিয়ে চুমুক দিল। অপূর্ব চা। যদি এটা সুমেধা করে থাকে তা হলে মানতে হবে মেয়েটা চমৎকার চা করতে পারে। সুমেধা এবার আশিসদার দিকে ফিরে বলল, "বলুন, আপনি কী জানতে চান।"
আশিসদা চায়ের কাপ বাঁ হাতে ধরে ডান হাত দিয়ে একটা প্যাড বের করল। সেই প্যাডের একটা ফাঁকা পাতা খুলে কলম বাগিয়ে প্রশ্ন করল, "আপনি কী সাবান ব্যবহার করেন?"
অনির্বাণ চা খেতে খেতে দু'জনের কথোপকথন শুনতে লাগল। এই প্রশ্নগুলো ওর মুখস্থ। সুমেধাও উত্তর দিচ্ছিল ভারী গুছিয়ে। সুমেধার দিকে তাকিয়ে অনির্বাণের বারবার মনে পড়ছিল সেই পুরনো দিনগুলো। প্রযত্নের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য ও সন্ধেবেলা গিয়ে কথা বলেছিল সুমেধার সঙ্গে। ব্যাপারটা যদি সেখানেই মিটে যেত তা হলে হয়তো এতদিন বাদে সুমেধাকে দেখে ওর তেমন কিছু মনে হত না। কিন্তু সুমেধা আবার ওর জীবনে ফিরল অন্বয়ের সূত্রে।

তখন ও কলেজের সেকেন্ড ইয়ারে। বি কম অনার্স। আর সুমেধা ভর্তি হল ফার্স্ট ইয়ারে। ইংরেজিতে অনার্স নিয়ে। সেই খবর ওকে দিয়েছিল অন্বয়। অনির্বাণ যে সুমেধাকে চেনে সেটা অন্বয় জানত না। ও নিছকই একজনকে ভাললাগার কথা জানিয়েছিল অনির্বাণকে। কে সেই মেয়ে দেখতে গিয়ে অনির্বাণ আবিষ্কার করেছিল সুমেধাকে। তবে ও যে সুমেধাকে আগে থেকেই চেনে এবং একবার কথা বলেছিল, সে সব কিছুই বলেনি অন্বয়কে।
কিছুদিন যেতেই অন্বয়ের অবস্থাও প্রযত্নের মতো হয়ে দাঁড়াল। সুমেধার সম্পর্কে নানা জায়গা থেকে ও খোঁজখবর জোগাড় করত। সেই সব খবর এসে শোনাত অনির্বাণকে। ততদিনে সুমেধাকে দেখতে আগের চেয়েও সুন্দরী হয়েছে। স্কুলে পড়ার সময় ও খুব সাদামাঠা থাকত। কিন্তু কলেজে এসে মেয়ে যেন ডানা মেলল। তাই দেখে একা অন্বয় নয়, আরও অনেক ছেলেই সুমেধার প্রেমে পড়ল। সুমেধা কিন্তু কোনও সম্পর্কেই জড়াল না। এদিকে অন্বয়েরও পাগল পাগল দশা। পড়াশোনা মাথায় উঠেছিল। অনির্বাণের সঙ্গে দেখা হলেই সুমেধার কথা বলত।



অন্বয় নিছকই একজনকে ভাললাগার কথা জানিয়েছিল অনির্বাণকে। কে সেই মেয়ে দেখতে গিয়ে অনির্বাণ আবিষ্কার করেছিল সুমেধাকে।

অনির্বাণের পারিবারিক অবস্থা তখন ভাল নয়। ওর বাবা ছিল একটা কারখানার ম্যানেজার। সেই কারখানা লক আউট হয়ে গিয়েছিল। মাইনে তো বন্ধই হয়েছিলই। উপরন্তু পাওনা টাকাও মালিকপক্ষ দিচ্ছিল না। অনির্বাণকে কলেজের পর চুটিয়ে টিউশনি করতে হচ্ছিল। শুধু যে নিজের পড়ার খরচ চালানোর জন্য তাই নয়, মাসে মাসে কিছু টাকা ও সংসারেও দিচ্ছিল। এই পরিস্থিতিতে সুমেধার চিন্তা করার মানে হয় না। বিশেষ করে সুমেধা যে যুক্তি দেখিয়ে প্রযত্নকে কাটিয়ে দিয়েছিল, সেটা অনির্বাণ ভোলেনি।
ক্রমশ অন্বয়ের পাগলামিও বাড়তে লাগল। সুমেধাকে নোটস জোগাড় করে দেওয়ার আশ্বাস দিয়ে অন্বয় ভাব জমিয়েছিল। কখনও হয়তো কলেজের পর সুমেধাকে ও কিছু দুর এগিয়ে দিত। কখনও সুমেধার এক গাদা ফটোকপি করে দিত। সুমেধা কোনও কাজ করার সুযোগ দিলে অন্বয় বর্তে যেত। কাজটা করে দিয়েই ছুটে এসে অনির্বাণকে সেই সব কথা ফলাও করে শোনাত।
অনির্বাণ জানত, অন্বয়ের বাবার বিরাট ব্যবসা। দুটো পেট্রল পাম্প। একটা সিনেমা হল। বাজারে গোটাদশেক দোকানঘর ভাড়া দেওয়া। অন্বয় বি কম পাশ করেই বাবার ব্যবসায় গিয়ে বসবে। অতএব ওর প্রেমে সুমেধা পড়তেই পারে। এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু ছিল না।
তেমনই এক বিকেলে কলেজ থেকে বেরিয়ে অনির্বাণ দেখল আকাশে মেঘ জমেছে। বৈশাখ মাস। অহরহ কালবৈশাখী হচ্ছে। অথচ সেদিন অনির্বাণ ছাতা নিয়ে বেরতে ভুলে গিয়েছে। এদিকে সন্ধেবেলা পরপর তিনটে টিউশনি। এখন কামাই করা যাবে না। অনির্বাণ দ্রুত পা বাড়াল। ওদের কলেজ ছেড়ে নতুন বাজারে মোড়ে আসতেই আকাশে বিদ্যুৎ চমকাতে লাগল। অনির্বাণ কোনওমতে কাঁধের ব্যাগ বুকের মাঝখানে জড়িয়ে প্রায় দৌড়তে শুরু করল। নতুন বাজার পেরিয়েই বুড়োশিবতলা। সেখানে পৌঁছে অনির্বাণ থমকাল। ওখানে কোনও গোলমাল হচ্ছে। বটগাছের আড়াল থেকে অন্বয়ের গলা শোনা যাচ্ছে। কী ব্যাপার?
দু'পা এগোতেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হল। কলেজ ইউনিয়নের জি এস বাপ্পাদিত্য চারটে ছেলেকে নিয়ে ঘিরে ধরেছে অন্বয়কে। আর অন্বয়ের পাশে মুখ ছোট করে দাঁড়িয়ে সুমেধা। কী নিয়ে বচসা সেটা বোঝার আগেই অন্বয় দেখতে পেল অনির্বাণকে। এবার ও জটলার মধ্যে থেকে হাঁক দিল, "অ্যাই অনির্বাণ, দ্যাখ এরা কী সব আজেবাজে কথা বলছে আমাদের।"
অনির্বাণ একবার দেখল সুমেধাকে। কিন্তু মেয়েটা কী ভাবছে আঁচ করতে পারল না। ওদিকে বাপ্পাদিত্য ততক্ষণে হুঙ্কার দিয়ে উঠেছে, "অ্যাই তোকে এখান থেকে যেতে বলছি না। আর যেন কোনওদিন তোকে সুমেধার সঙ্গে না দেখি!"
"কেন যাব!" অন্বয়ও তেড়িয়া হয়ে বলল।
বাপ্পাদিত্য এবার সপাটে চড় কষাল অন্বয়ের গালে। হিসহিসে গলায় বলল, "আমি বলছি, তাই যাবি। ব্যস। এবার ফোট।"
অন্বয় গাল চেপে বসে পড়েছে। অনির্বাণ এবার এগিয়ে গেল। সরাসরি বাপ্পাদিত্যের দিকে তাকিয়ে বলল, "ওকে মারলি কেন?"
বাপ্পাদিত্য চোয়াল শক্ত করে বলল, "এটা আমাদের ব্যাপার।"
"আমাদের ব্যাপার মানে! কলেজে হলে তাও কথা ছিল। কিন্তু এখানে ফাঁকা রাস্তায় তুই ওর গায়ে হাত তুললি কেন?"
"আমি সুমেধাকে লাইক করি। ও আমার মাল। এই শালা একেবারে জোঁকের মতো মেয়েটার সঙ্গে লেগে থাকে..."
"মাইন্ড ইয়োর ল্যাঙ্গোয়েজ," এবার সুমেধা পাশ থেকে বলে উঠল, "মেয়েদের সঙ্গে কীভাবে কথা বলতে হয় তাও শেখোনি..."
সুমেধা ফুঁসে উঠতেই বাপ্পাদিত্য এক হ্যাঁচকা টানে অন্বয়কে টেনে তুলল। সোজা একটা ঘুসি বসিয়ে দিল ওর মুখে। বাপ্পাদিত্য হয়তো অন্বয়কে আরও মারত। কিন্তু অনির্বাণ এবার ওকে আড়াল করে দাঁড়াল। ব্যাগটা আড়াআড়িভাবে নিয়ে বাপ্পাদিত্যের মুখোমুখি হল ও। বাপ্পাদিত্য এবার অনির্বাণের চোয়াল লক্ষ করে হাত চালাল। সেই ঘুসি কাটিয়ে অনির্বাণ সপাটে একটা ঘুসি চালাল বাপ্পাদিত্যের পেটে। বাকিরা কিছু বোঝার আগেই বাপ্পাদিত্য পেটে হাত দিয়ে ঝুঁকে পড়ল। এবার বাপ্পাদিত্যের চারটে ছেলে ঝাঁপিয়ে পড়ল অনির্বাণের উপর। চারজন ওকে ঠেলে নিয়ে চলল বটগাছটার দিকে। আর সেই চারজনের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করতে গিয়ে অনির্বাণ দেখতে পেল অন্বয় প্রাণপণে দৌড়ে পালাচ্ছে। অনির্বাণ নিশ্চিত ছিল, সুমেধাও দৌড় লাগাবে। কিন্তু তা হল না। সুমেধা দাঁড়িয়ে থাকল। তবে এই

পরিস্থিতিতে কী করবে মেয়েটা বুঝতে পারছিল না।
চারজনের সঙ্গে একা পেরে ওঠা সম্ভব নয়। অনির্বাণ তাই চেষ্টা করছিল মারগুলো যেন জোরালো হয়। তা হচ্ছিলও। পরপর দুটো ছেলে ছিটকে গেল। বাকি দু'জনের সঙ্গে যখন ও লড়ছে তখন বাপ্পাদিত্য সোজা হয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। এবার পকেট থেকে একটা ওয়ান শাটার বের করে ও তাক করল অনির্বাণের দিকে। বলল, "এবার যদি নড়াচড়া করিস, শেষ করে ফেলব।"
থমকে গেল অনির্বাণ। ইউনিয়নের নির্বাচনে বাপ্পাদিত্য বোমা ছুড়েছে। অতএব ও দুম করে ওয়ান শাটার চালিয়ে দিতে পারে। আর অনির্বাণ থামতেই বাকি ছেলেরা ওকে প্রবল জোরে মারতে লাগল। সেই মার কয়েকটা পড়ার পর অনির্বাণ জ্ঞান হারাল।
হুঁশ যখন ফিরল, তখন ও নার্সিংহোমে। পায়ের কাছে বাবা দাঁড়িয়ে। পরে ও শুনেছিল সুমেধাই নাকি সবাইকে খবর দিয়েছিল। নার্সিংহোমের খরচ দিয়েছিলেন অন্বয়ের বাবা। কিন্তু ওই মারামারির জেরে অনির্বাণের পড়াশোনার খুব ক্ষতি হয়েছিল। সে বছর আর পার্ট থ্রি পরীক্ষায় বসতে পারেনি। টিউশনিগুলোও হাতছাড়া হয়ে গিয়েছিল। একে পরিবারে এত অভাব। তার উপর ওর চিকিৎসা এবং বাড়িতে বসে যাওয়ার জেরে বাবা আরও চাপে পড়ে যান। তবু বিছানায় শুয়ে থাকার সময় অনির্বাণ নিজেকে কাটাছেঁড়া করেছিল। সেদিন কেন ঝাঁপিয়ে পড়েছিল বাপ্পাদিত্যের মতো ভয়ঙ্কর ছেলের উপর? শুধুই কি অন্বয়ের জন্য? নাকি সুমেধার প্রতি একটা ভালবাসা তিরতির করে ওর বুকের গভীরে বইছে? অনির্বাণ নিজের কাছে লুকোতে পারেনি সেই ভালবাসা।
এর পর ও যখন সুস্থ হয়ে কলেজে গেল, তখন এক-দু' বার সুমেধার সঙ্গে দেখা হয়েছে। ততদিনে ওরা দু'জনেই এক ইয়ারে। অন্বয় পাশ করে বেরিয়ে গিয়েছে কলেজ থেকে। বাবার ব্যবসা নিয়ে রোজ বসতে হয়, তাই অনির্বাণের সঙ্গে ওর যোগাযোগও ততদিনে ক্ষীণ। সুমেধার সঙ্গেও যোগাযোগ আছে বলে মনে হয় না।
তবে সুমেধাকে দেখলেও কোনওদিন আগ বাড়িয়ে কথা বলেনি অনির্বাণ। কারণ, ও জানত সুমেধারা শুধু অন্বয়দের পক্ষেই উপযুক্ত। লক আউট কারখানার ম্যানেজারের ছেলে, যাকে টিউশনি করে নিজের লেখাপড়া চালাতে হয়, তার পক্ষে সুমেধাদের অ্যাফোর্ড করা সম্ভব নয়। আজ এখানে বসে সুমেধাকে দেখতে দেখতে অনির্বাণ টের পেল, সুমেধা সেই স্কুলবেলায় যা চেয়েছিল, শেষ পর্যন্ত তা পেয়েছে।
আশিসদার ইন্টারভিউ নেওয়া শেষ। এবার আশিসদা বলল, "থ্যাঙ্কস আ লট। আমরা একটা প্রডাক্ট আনতে চলেছি। সেটা সব দিক থেকেই আপনার ইউজ় করা সাবানের চেয়ে বেটার হবে।" সুমেধা হাসল। তারপর অনির্বাণের দিকে তাকিয়ে বলল, "আপনি কিন্তু কিছুই খেলেন না।"
অনির্বাণও হাসল। বলল, "আমি জাস্ট লাঞ্চ করেছি। এখন আর কিছু খাব না। থ্যাঙ্কস ফর দ্য টি।"
তিনজনেই উঠে দাঁড়াল। তারপর আশিসদা, অনির্বাণ জুতো পরে বেরিয়ে এল। আশিসদার একটা ফোন এসেছে। সেই ফোনে কাউকে কিছু নির্দেশ দিচ্ছে। অনির্বাণ একবার পিছন ফিরে তাকাল। সুমেধা দরজা আটকে দিয়েছে। এবার অনির্বাণ বাড়িটা খুঁটিয়ে দেখল। তিনতলা বাড়ি। সামনে গ্যারাজ। তাতে একটা এসইউভি দাঁড়ানো। পাশে আর-একটা বড় গাড়ির জায়গা ফাঁকা। সেটা নিয়ে বোধ হয় কেউ বেরিয়েছে।
অনির্বাণের হাসি পেল। জীবনে কত ভালবাসা যে এভাবে মনের গভীরে জন্মে শুধু সেখানেই থেকে যায়, তার হিসেব নেই। কেউ কি কোনওদিন জানবে, সুমেধার জন্যই অনির্বাণ সেদিন ওই মার খেয়েছিল!

পুনশ্চ
অনির্বাণরা বেরিয়ে যেতে সুমেধা দরজা বন্ধ করে ঘরে এল। টেবলের উপর এখনও রাখা অনির্বাণের না খাওয়া খাবারগুলো। সুমেধা একবার ঘড়ি দেখল। বুবাইয়ের স্কুল বাস আসতে আরও আধ ঘণ্টা। দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ও শোওয়ার ঘরে এল। সেই অনির্বাণ! যাকে প্রথম দেখেছিল রাস্তার আলোছায়ায়। প্রযত্নের হয়ে প্রপোজ় করতে এসেছিল। সেদিন কিছু না ভেবেই ছেলেটার সঙ্গে মজা করেছিল সুমেধা। ভেবেছিল, পরে যেদিন পড়ে ফিরবে সেদিনও নিশ্চয়ই ছেলেটা থাকবে। কিন্তু শুধু সেদিন কেন এর পর আর কোনওদিনই ছেলেটা এসে ওর রাস্তা আটকে দাঁড়ায়নি।
ছোটবেলা থেকেই বহু ছেলে প্রপোজ় করেছে সুমেধাকে। দিনের পর দিন ওর পিছনে ঘুরেছে। কেউই মাত্র একবার রাস্তা আটকে বন্ধুর মনের কথা জানিয়ে চিরদিনের মতো ভ্যানিশ হয়ে যায়নি। সেই জন্যই বোধ হয় ছেলেটা ওর মনে থেকে গিয়েছিল। তখনও সুমেধা নাম জানত না ছেলেটার। সেটা জানল কলেজে ঢুকে। কলেজে পড়ার সময় অন্বয়ের কাছে অনির্বাণের কষ্ট করে লেখাপড়া চালিয়ে যাওয়ার কথা ও শুনেছিল। তবে কখনও আগ বাড়িয়ে অনির্বাণকে কিছু বলেনি। তবু কোথায় যেন ওই অদ্ভুত ছেলেটার প্রতি ওর মনে একটা জায়গা তৈরি হয়ে যাচ্ছিল।
এক বছর ঘুরতে না ঘুরতেই এল সেই ভয়ঙ্কর সন্ধে। যে অন্বয় বরাবর সুমেধাকে পেতে চেয়েছে, সেই অন্বয় বিপদের সামনে ওকে ফেলে পালিয়ে গেল। আর এবারও বন্ধুর জন্য অনির্বাণ নিজের জীবন, কেরিয়ার বিপন্ন করে ফেলল। কী মারটাই না সেদিন খেয়েছিল! এক সময় বাপ্পাদিত্যরা ভয় পেয়েছিল, অনির্বাণ যদি মরে যায় তা হলে ওরা ফেঁসে যাবে। তাই পাঁচজন পালিয়ে গিয়েছিল। অনির্বাণের তখন বেহুঁশ হয়ে রাস্তায় পড়ে। বৃষ্টিও শুরু হয়ে গিয়েছিল। ওর মাথা কোলে নিয়ে সুমেধাই সেদিন ফোন করেছিল অন্বয়কে। তারপর সেই টিপটিপে বৃষ্টির সন্ধেয় অনির্বাণের মাথাটা জড়িয়ে ধরে অঝোরে কেঁদেছিল। সেদিন ওর বারবার বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করছিল, অনির্বাণ মার খেয়েছিল অন্বয় নয়, ওর জন্য। কিন্তু বিশ্বাস করতে চাইলেই কি বিশ্বাস সত্যি হয়? অনির্বাণ সুস্থ হওয়ার পর ওর সঙ্গে কলেজে দেখা হয়েছে। কিন্তু অনির্বাণ এগিয়ে এসে কথা বলেনি। উদাস মুখ করে চলে গিয়েছে। সুমেধাও কি পারত না এগোতে? কিন্তু বরাবরই ছেলেরা নিজের থেকে ওর কাছে এসেছে। ওকে কোনওদিন যেতে হয়নি। তাই যেদিন যাওয়ার মুহূর্ত এল, সেদিন সুমেধা আবিষ্কার করল, ও কিছুতেই নিজের খোলস ভেঙে বেরোতে পারছে না। এ যেন নিজের ঘেরাটোপেই আটকা যাওয়া। কলেজের পর আর অনির্বাণের সঙ্গে দেখা হয়নি। হল এত বছর বাদে। সুমেধা ঘরে ঢুকেই ওকে চিনতে পেরেছিল। অনির্বাণেরও কি মনে আছে ওর কথা? সুমেধা হাসল। অনির্বাণের আচরণে তো তা মনে হল না। বরং যেভাবে ভদ্রতা করে অনির্বাণ শুধু চা'টুকু নিল, তাতে পরিষ্কার সুমেধার কাছে ও কাজের প্রয়োজনেই এসেছিল। কাজ ফুরিয়ে যেতে সুমেধার দিকে ফিরে তাকানোর প্রয়োজনও মনে করল না।
সুমেধা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে হাসল। সেই সন্ধের মতো আজও আকাশ মেঘলা। এমন মেঘলা দিনে দু'-দু'বার এক মেঘবর্ণ পুরুষ এসেছিল ওর কাছে। অনির্বাণ কোনওদিন জানবেও না সুমেধার মনে যে পুরুষের ছবি আঁকা রয়েছে, সেটা অনির্বাণেরই। তার সঙ্গে ও কথা বলে। সিনেমা দেখতে যায়। মাঝে মাঝে গানও গায়। বৃষ্টির গান। এই ভালবাসা ওর মনে জন্মে, সেখানেই ঘর করে রয়েছে। বাইরের পৃথিবী এই ভালবাসার খোঁজ কোনওদিনও পাবে না।

অলংকরণ: পিয়ালী বালা

ইতিহাসের গন্ধমাখা

ছবির মতো সুন্দর সাজানোগোছানো শহর। বড় বড় প্রাসাদ, মিউজ়িয়মের সঙ্গে জড়িয়ে আছে কত গল্প, কত কাহিনি। ফেলে আসা সময়ের সাক্ষ্য এখনও বহন করছে ফ্লোরেন্স। তারই সাক্ষী হলেন বিশ্বদীপ সেনশর্মা।



ফ্লোরেন্স শহর

পিয়াৎজ়া দেলা সিনোরিয়ায় কফির কাপ নিয়ে বসে আছি। সামনেই পালাৎজ়ো ভেক্কিও-র প্রাসাদ অনেক শতাব্দীর ইতিহাস বহন করে দাঁড়িয়ে আছে। দূরে ক্যাথিড্রালের বিশাল লাল গম্বুজ এই শহরের গর্বিত প্রতীক হয়ে বিরাজমান। পিয়াৎজ়ার কেন্দ্রে বসে এক গিটারবাদক নিবিষ্ট মনে বাজিয়ে যাচ্ছে। সন্ধ্যা হয়ে আসছে, পিয়াৎজ়ার দোকানগুলিতে আলো জ্বলে উঠছে। ক্লান্ত ট্যুরিস্টদের ভিড়ে রেস্তরাঁগুলির টেবলও ধীরে ধীরে ভরে উঠছে। বহু ইতিহাসের সাক্ষী ফ্লোরেন্সের প্রাণকেন্দ্র এই স্কোয়্যারটি আলোর মালায় সেজে উঠেছে।

আগে একবার ইতালি গিয়ে শুধু রোমের বুড়ি ছুঁয়ে এসেছিলাম। আর একবার সুযোগ আসতেই ঠিক করলাম এবার ঘাঁটি হবে ফ্লোরেন্সে। ফ্লোরেন্স শিল্পের শহর, স্থাপত্যের শহর, ইতিহাসের শহর। অনেক শতাব্দী ধরে তিলতিল করে গড়ে উঠেছে। আজ সে বেজায় সুন্দরী। অসংখ্য ক্যাথিড্রাল, প্রাসাদ ও মিউজ়িয়ম নিয়ে সে শিল্পপ্রেমীদের স্বর্গরাজ্য।

মুম্বই থেকে মধ্যরাতের ফ্লাইট ধরে পরের দিন দুপুরে রোম এয়ারপোর্টে নামলাম। এয়ারপোর্ট সংলগ্ন স্টেশন থেকে ট্রেন ধরে রোমা টার্মিনি স্টেশনে এলাম। সেখান থেকে মালপত্র নিয়ে আবার ফ্লোরেন্সগামী ট্রেনে চড়ে বসলাম। ইতালির ট্রেন প্রাইভেট, ব্যবস্থা অতিসুন্দর। দিব্যি কফি হাতে কাচের জানলা দিয়ে বাইরের দৃশ্যাবলী দেখতে দেখতে যাওয়া যায়। তবে বলে রাখা ভাল ইতালি ঠিক সুইৎজ়ারল্যান্ডের মতো স্বপ্নের দেশ নয় বরং পকেটমার নিয়ে আমাদের সঙ্গে অনেক মিল। মালপত্র সামলে রাখতে হয়।

স্টেশনে নেমে ট্যাক্সি নিয়ে পৌঁছে গেলাম থেকে অনতিদূরে আমাদের বেড অ্যান্ড ব্রেকফাস্টের ডেরায়। এক বৃদ্ধ দম্পতি নিজেদের বাড়িরই কয়েকটি ঘর ভাড়া দেন। হোটেলের মতো বিলাসবহুল না হলেও সুন্দর পরিচ্ছন্ন ব্যবস্থা। ভদ্রলোক শহরের ম্যাপ ও অবশ্য



পিয়াৎজ়াল থেকে ফ্লোরেন্স



দ্রষ্টব্যস্থানগুলো যত্ন করে আমাদের বুঝিয়ে দিলেন। বারবার বলে দিলেন কোনও অসুবিধে হলে ওঁকে যেন অবশ্যই ফোন করি। অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে ম্যাপ হাতে রাস্তায় নামলাম।
ফ্লোরেন্স ইউরোপিয়ান রেনেসাঁর আঁতুড়ঘর। তার রমরমা শুরু পঞ্চদশ শতাব্দীর গোড়া থেকে। এই সময়ে বস্ত্রশিল্প, ব্যাঙ্কিং ইত্যাদিতে ফ্লোরেন্স ইতালি তথা ইউরোপের প্রাণকেন্দ্র হয়ে ওঠে। চার্চ ও ধনী ব্যবসায়ীদের হাতে সম্পদ জমা হয় এবং তারা উদার হাতে শিল্প ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতাও শুরু করেন। ফ্লোরেন্সের উদার ও গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাও শিল্প ও মানবতাবাদের বিকাশে সাহায্য করেছিল। ধীরে ধীরে মিকেলেঞ্জেলো, লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি, বত্তিচেলির মত শিল্পীদের চিত্রকলা ও স্থাপত্য ফ্লোরেন্সের প্রাসাদে ও চার্চে ছড়িয়ে পড়তে থাকে।
বিকেল হয়ে আসছে তাই সামান্য বিশ্রাম নিয়েই বেরিয়ে পড়লাম। প্রথম গন্তব্য অবশ্যই মিকেলেঞ্জেলোর 'ডেভিড', আকাদেমিয়া গ্যালারি। হোটেল থেকে ট্রাম ধরে স্টেশন, সেখান থেকে হাঁটা পথ। আসলে ফ্লোরেন্সের দ্রষ্টব্যস্থানগুলি সবই একটা ছোট জায়গার মধ্যে কেন্দ্রীভূত। একটু পা চালিয়ে সবই দেখে নেওয়া যায়। গ্যালারির সামনে টিকিটের বিশাল লাইন, তবে আমাদের আগে থেকে অনলাইনে বুক করা থাকায় আলাদা ছোট লাইনে দাঁড়াতে হল। এটা ফ্লোরেন্স বা রোমের সব মিউজ়িয়মের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।
ডেভিডের অনবদ্য মর্মর মূর্তিটি যৌবনের শক্তি ও সৌন্দর্য্যের প্রতীক। কাছ থেকে দেখলে বিস্ময় ও মুগ্ধতায় কথা হারিয়ে যায়। এটিকে পৃথিবীর সর্বকালীন একটি শ্রেষ্ঠ শিল্পকীর্তি বলে ধরা হয়। ষষ্ঠদশ শতাব্দীর শুরুতে মাত্র ছাব্বিশ বছর বয়সে মিকেলেঞ্জেলো ফ্লোরেন্স ক্যাথিড্রালের জন্য এই অপরূপ মূর্তিটি সৃষ্টি করেন। এর শিল্পসুষমায় মুগ্ধ হয়ে ফ্লোরেন্সের তৎকালীন শাসকেরা মূর্তিটিকে ক্যাথিড্রালের বদলে

জেনে নিন

রোম থেকে ফ্লোরেন্স যাওয়ার ট্রেন ব্যবস্থা দারুণ। অনলাইনে টিকিট কাটতে পারেন। এতে দামও কম পড়ে। অনলাইনে সমস্ত তথ্য পেয়ে যাবেন। মিউজ়িয়ম ঘোরার টিকিটও অনেকক্ষেত্রেই কাটতে পারেন। আগে থেকে টিকিট কাটা থাকলে লাইনে দঁড়িয়ে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে না।





ফ্লোরেন্সের প্রাণকেন্দ্র পিয়াৎজা দেলা সিনোরিয়ায় রাখার সিদ্ধান্ত নেন। ১৮৭৩ সালে ক্ষয়ক্ষতির হাত থেকে বাঁচাতে মূর্তিটিকে আকাদেমিয়া গ্যালারিতে নিয়ে রাখা হয়। পিয়াৎজাতে ডেভিডের স্ট্যাচুর একটি প্রতিরূপ এখনও রাখা আছে। ডেভিড ছাড়া আকাদেমিয়া গ্যালারিতে রয়েছে মিকেলাঞ্জেলোরই অসমাপ্ত কাজ, 'প্রিজনার্স' বা 'স্লেভস'। মোট চারটি অসমাপ্ত মূর্তি রয়েছে এই সিরিজে। অসমাপ্ত হলেও তাকিয়ে থাকতে হয়, বিশেষত 'দ্য অ্যাওকেনিং স্লেভ'- এর অপূর্ব মূর্তিটি থেকে চোখ ফেরানো যায় না।

এরপর গেলাম ফ্লোরেন্সের বিখ্যাত ক্যাথিড্রাল বা ডুওমো। এটি ফ্লোরেন্সের আইকনিক ল্যান্ডমার্ক। প্রায় দেড়শো বছর সময় লেগেছিল এটি গড়ে তুলতে। এর সুবিশাল লাল গম্বুজটি সে সময় ছিল পৃথিবীর বৃহত্তম। এত বৃহৎ গম্বুজ তৈরির কোন বাস্তব পদ্ধতি তখন জানা ছিল না। তাই প্রতিযোগিতা আহ্বান করা হয়। ফিলিপ্পো ব্রুনেলেস্কি ছিলেন এক অখ্যাত স্বর্ণকার যার স্থাপত্যবিদ্যায় কোন প্রথাগত শিক্ষা ছিল না। অথচ তাঁরই ডিজাইন শেষ পর্যন্ত গৃহীত হয় এবং তিনি ষোলো বছর ধরে অনেক বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে অসামান্য সাফল্যের সঙ্গে এটি নির্মাণ করেন। ১৪৩৬ সালে তৎকালীন পোপ সম্পূর্ণ ক্যাথিড্রালটির


মিউজিয়মের অন্দরে

আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন। ব্রুনেলেস্কি কোন স্কেচ বা ব্লু-প্রিন্ট রেখে যাননি। আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্য ছাড়া এই বিশাল গম্বুজ কী করে নির্মিত হয়েছিল তা বিজ্ঞানীদের কাছে এখনও রহস্য। শতশত বছর ধরে ঝড়, বজ্রপাত ও ভূমিকম্প সহ্য করে এটি এখনও ফ্লোরেন্সের রাজকীয় প্রতীক হয়ে অবিচলভাবে দাঁড়িয়ে আছে।

ক্যাথিড্রালটি নিজেও বিশাল ও বিস্তৃত। বহিরঙ্গ লাল, সবুজ ও সাদাপাথরে তৈরি। ভিতরটি অবশ্য তুলনামূলকভাবে সাদামাটা। ক্যাথিড্রাল চত্বরেই রয়েছে আরও দুটি উল্লেখযোগ্য স্থাপত্য, বেল টাওয়ার এবং ব্যাপ্টিস্ট্রি। বেল টাওয়ার মূল ক্যাথিড্রালের মতই লাল, সাদা ও সবুজ মার্বেলে মোড়া এক অপরূপ স্থাপত্য। প্রায় পঁচাশি মিটার উঁচু। চারশোর মত সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠতে হয়। আর ক্যাথিড্রালের ঠিক বিপরীতে রয়েছে ব্যাপ্টিস্ট্রি অফ সান জিওভানি। কবি দান্তে থেকে আরম্ভ করে ফ্লোরেন্সের অনেক বিখ্যাত ব্যক্তির ব্যাপটিজম এখানে হয়েছে। এখানে দশটি ব্রোঞ্জের প্যানেলে ওল্ড টেস্টামেন্টের কাহিনি খোদাই করা



বোবোলি গার্ডেন



পালাৎজো ভেক্কিও



আছে। এর অনবদ্য শিল্পসুষমায় মুগ্ধ হয়ে স্বয়ং মিকেলেঞ্জেলো এটিকে স্বর্গের দ্বার বলে অভিহিত করেছিলেন। ক্যাথিড্রালে প্রবেশ অবাধ কিন্তু ব্যাপ্টিস্ট্রিতে টিকিট কেটে ঢুকতে হয়। ঢুকেই চোখ টেনে নেয় সিলিংজোড়া বিশাল মোজেইকের কাজ। দ্য লাস্ট জাজমেন্ট, মেরি অ্যান্ড ক্রাইস্ট, সেন্ট জন দ্য ব্যাপটিস্ট এদের কাহিনি বিভিন্ন স্তরে বিধৃত। ক্যাথিড্রাল চত্বর ছেড়ে এবার হেঁটে চলেছি। রাস্তাগুলি পাথরে বাঁধানো কিন্তু বেশি চওড়া নয়। দু'দিকে সুন্দর করে সাজানো অনেক দোকান ও রেস্তরাঁ। একটু পরে পরেই জিল্যাটো বা ইতালিয়ান আইসক্রিমের দোকান। অসংখ্য ফ্লেভারে পাওয়া যায়। চামড়ার জিনিসের দোকানও রয়েছে। ক্লান্ত পা এসে পৌঁছল পিয়াৎজা দেলা সিনোরিয়ায়। পিয়াৎজার অর্থ স্কোয়্যার। ইতালির শহরগুলিতে পিয়াৎজার ছড়াছড়ি। মূলত কিছুটা খোলা জায়গা, কিছু মূর্তি এবং প্রচুর পিজ্জারিয়া বা ট্রেটোরিয়া গোছের খাবার জায়গা। রেস্তরাঁগুলি ভিতরে ছোট কিন্তু বাইরে অনেকটা জায়গা জুড়ে চেয়ার-টেবল পাতা। একটিতে বসে কফি অর্ডার করলাম। কফি দাঁড়িয়ে খেলে দেড় ইউরো, টেবলে বসে খেলে চার ইউরো। ক্লান্ত শরীর বিশ্রাম চাইছে তাই কিছু ইউরোর মায়া কাটাতে হল। পিয়াৎজার মূল আকর্ষণ পালাৎজো ভেক্কিও প্রাসাদটি আজকের মত বন্ধ হয়ে গেছে, তবে প্রাসাদের পাশে ওপেন এয়ার মিউজ়িয়মটি ঘুরে দেখলাম। এখন যে স্ট্যাচুগুলি রাখা আছে তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখ্যযোগ্য গ্রিক পুরাণে হিরো পারসিউসের হাতে রাক্ষসী মেডুসার শিরচ্ছেদের মূর্তি।

দিন শেষ, এবার ডিনার করে ঘরে ফেরার পালা। একটি রেস্তরাঁয় ঢুকে ফ্লোরেন্সের বিখ্যাত পদ স্টেক ফ্লোরেনটাইন অর্ডার করলাম। অবশ্যই 'রেয়ার'। প্রাণীর শরীরের বিশেষ অংশ দিয়ে তৈরি এই পদটি খুবই নরম ও সুস্বাদু। একটি ডিশে দু'জনের অনায়াসে পেট ভরে যায়। খাওয়ার পর পাশে জিল্যাটোর দোকানে ঢুকে পেট ভর্তি থাকা সত্ত্বেও আইসক্রিম খেয়ে ফেললাম। পরের দিন আবার পিয়াৎজা দেলা সিনোরিয়া থেকেই সফর শুরু হল। আজকের প্রথম দ্রষ্টব্য পালাৎজো ভেক্কিও। চতুর্দশ শতাব্দীতে নির্মিত বিশাল এই প্রাসাদ বহু বছর ধরে ফ্লোরেন্সের ক্ষমতার কেন্দ্র ছিল। এখন একই সঙ্গে মিউজ়িয়ম ও টাউন হল। অনেক প্রদর্শনীও হয় এখানে। রয়েছে অনেকগুলি সুপরিকল্পিত ও সুসজ্জিত কক্ষ আর প্রত্যেকটিতেই রয়েছে অসাধারণ ফ্রেসকোর কাজ এবং অসংখ্য মূল্যবান চিত্রকলা-ভাস্কর্য। জাঁকজমক দেখলে মাথা ঘুরে যায়। ভাসারি ও মিকেলেঞ্জেলোর কাজ রয়েছে এখানে। এছাড়া দেখলাম কবি দান্তের মৃত্যু-মুখোশ বা ডেথ মাস্ক। ফ্লোরেন্সের পটভূমিতে লেখা ড্যান ব্রাউনের জনপ্রিয় উপন্যাস ও চলচ্চিত্র 'ইনফার্নো'তে এই মাস্কটির একটি কেন্দ্রীয় ভূমিকা আছে। কাহিনিতে বর্ণিত স্থানগুলি দেখানোর জন্য আলাদা একটি ট্যুরও আছে। আছে 'সিক্রেট প্যাসাজ' নামে আরও একটি ট্যুর। আমাদের অবশ্য সময় সীমিত, তাই ঘণ্টা দু'য়েকের সফরেই আশ মেটাতে হল। মেডিসি পরিবার সম্বন্ধে দু'চার কথা না লিখলে ফ্লোরেন্স নিয়ে আলোচনা অসম্পূর্ণ



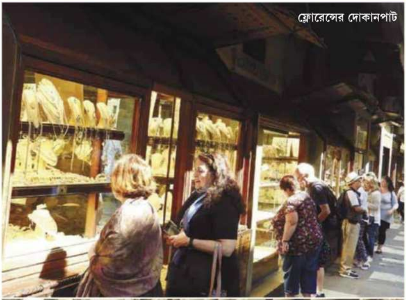
থেকে যায়। মূলত ব্যাঙ্কিং শিল্প থেকে উঠে আসা এই পরিবার পঞ্চদশ শতাব্দীর শুরু থেকে প্রায় তিন শতাব্দী ধরে ফ্লোরেন্স শাসন করে গেছেন। যদিও অধিকাংশ সময়েই এদের আনুষ্ঠানিক পদ ছিল না, কিন্তু শাসনব্যবস্থার উপর এদের নিয়ন্ত্রণ প্রায় নিরঙ্কুশ ছিল। এরা এতটাই ধনী ও প্রভাবশালী ছিলেন, যে বলা হয় ফ্লোরেন্সের অর্ধেক লোক এঁদের জন্য কাজ করতেন। মেডিসিদের উদার পৃষ্ঠপোষকতায় ফ্লোরেন্সে রেনেসাঁর শুরু হয়েছিল বলা যায়। পালাৎজ়ো থেকে বেরিয়ে ভাল রেস্তরাঁর খোঁজে ঘুরছি হঠাৎ গুগল ম্যাপে দেখি সামনে দান্তের বাড়ি। এটি প্ল্যানে ছিল না সুতরাং মধুর বিস্ময়। প্রায় দৌড়ে ঢুকলাম। বাড়িটি আসলে হাউস কাম মিউজ়িয়ম। দান্তের সময়ের বিভিন্ন সামগ্রী ও কাগজপত্র রাখা আছে। ঘুরে ঘুরে দেখলাম। পরে অবশ্য জেনে হতাশ হলাম যে দান্তে এই বাড়িতে থাকতেন না। গবেষণা করে দেখা গেছে মোটামুটি এই জায়গায় এই কবির বাড়ি ছিল, সেখানেই মিউজ়িয়মটি গড়ে তোলা হয়েছে।



হাতে সময় কম, দেখার জিনিস প্রচুর। সুতরাং পিৎজ়া আর লোকাল ওয়াইন দিয়ে চটপট লাঞ্চ সেরে আবার উলটোপথে ফিরে সোজা চলে গেলাম উফিৎজ়ি গ্যালারিতে। এটি ফ্লোরেন্সের বৃহত্তম আর্ট গ্যালারি এবং পৃথিবীর বিখ্যাত মিউজিয়াজ়িয়মগুলির অন্যতম। উফিৎজ়ি মানে ইতালিতে অফিস। ষোড়শ শতাব্দীতে মেডিসিদের উদ্যোগে সরকারি অফিস হিসাবে এই প্রাসাদটি নির্মিত হয়েছিল। মেডিসিদের বিপুল শিল্পসম্ভার রক্ষণ ও প্রদর্শনের জন্য ধীরে ধীরে এটি মিউজ়িয়মের রূপ নেয়। ১৭৬৯ সাল থেকে জনসাধারণের জন্য খুলে দেওয়া হয়।এখন একশোরও বেশি ঘরে সাজানো রয়েছে রেনেসাঁ আমলের অমূল্য সব শিল্পকলা। এবার ঘরে ফেরা ও ডিনার পর্ব। আজ মন একটু ডাল ভাত চাইছে। গুগল করে দেখা গেল আমাদের ডেরার কাছেই হাঁটাপথে একটি ইন্ডিয়ান রেস্তরাঁ আছে। নামেই ইন্ডিয়ান, আসলে বাংলাদেশি। ফ্লোরেন্সে ও পরে গোটা ইতালিতেই দেখলাম রাস্তাঘাটে প্রচুর বাংলাদেশিদের দোকান। এঁদের সঙ্গে

আড্ডা দিতে দিতে মুরগির ঝোল, গরম ভাত ও শেষে এক গ্লাস লস্যি দিয়ে ডিনার সারলাম।
আজ ফ্লোরেন্সের শেষ দিন। এখনও অনেক কিছু দেখা বাকি তাই সকালে উঠে ব্রেকফাস্ট করেই ছুট দিলাম। আজকের প্রথম গন্তব্য আর্নো নদীর উপর প্রখ্যাত পন্টে ভেক্কিও বা ওল্ড ব্রিজ। ডুওমোর মতো এটিও ফ্লোরেন্সের একটি ল্যান্ডমার্ক। প্রায় সাতশো বছরের পুরনো এই ব্রিজটির বিশেষত্ব হল এর উপর প্রচুর দোকানপাট ও বাড়িঘর আছে। অনেক বছর আগে কসাইদের দোকান ছিল। পরে সেগুলি বন্ধ করে স্বর্ণকারদের দোকান গড়ে ওঠে। অনেক গল্পকথা ও ইতিহাস রয়েছে এই ব্রিজটিকে ঘিরে। এই ব্রিজের উপর আগে প্রচুর বন্ধ তালা দেখা যেত। সংস্কার আছে যে প্রেমিক প্রেমিকারা তালা বন্ধ করে চাবিটি আর্নো নদীর জলে ফেলে দিলে তাদের প্রেমও চিরকালের জন্য বাঁধা পড়বে। এখন অবশ্য প্রশাসনের নিষেধে সেটা কমেছে। পরবর্তী গন্তব্য পিটি প্যালেস। পন্টে ভেক্কিও থেকে পাঁচ মিনিটের হাঁটা পথ। পঞ্চদশ শতাব্দীতে নির্মিত এই বিশাল প্রাসাদটি ব্যাঙ্কার পিটিদের কাছ থেকে ১৫৪৯ সালে মেডিসিরা কিনে নেন। সেই সময়ে তাঁদের পুরনো প্রাসাদ পালাৎজো ভেক্কিও থেকে পিটি প্যালেসে যাতায়াতের জন্য পন্টে ভেক্কিওর উপর দিয়ে প্রখ্যাত স্থপতি ভাসারিকে দিয়ে তৈরি করান 'ভাসারি করিডোর'। পিটি প্যালেসে থাকার সময়েই মেডিসিরা গড়ে তোলেন সমসাময়িক চিত্রকলা ও ভাস্কর্যের এক বিপুল সংগ্রহ। ঘরগুলিও দেখার মতো। এছাড়া রয়েছে প্রাসাদ সংলগ্ন বোবোলি গার্ডেন ও পোর্সিলিন মিউজ়িয়ম। সব ঘুরে দেখতে সারাদিন লেগে গেল। ফেরার আগে এ যাত্রায় শেষ গন্তব্য পিয়াৎজ়ালে মাইকেলেঞ্জালো। শহর থেকে সামান্য দূরে টিলার মত জায়গা যেখান থেকে গোটা ফ্লোরেন্স শহর দেখা যায়। রয়েছে কিছু দোকানপাট ও ডেভিডের একটি প্রতিমূর্তি। রেলিংয়ের ধারে গিয়ে সামনে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেলাম। গোটা শহর যেন ছবির মতো সাজানো রয়েছে। মাঝখানে ক্যাথিড্রালের লাল গম্বুজ বিকেলের পড়ন্ত আলোতেও উজ্জ্বল। পাশে বেল টাওয়ার। একটু দূরে পালাৎজো ভেক্কিও। দেখতে দেখতে কখন যেন অনেক শতাব্দী পিছিয়ে গেছি। ওই তো পালাৎজো ভেক্কিওর পাশে দান্তের বাড়ি, উনি লিখছেন সর্বকালের সেরা এক মহাকাব্য। পরে এই কবিকে তাঁর অতি প্রিয় এই শহর থেকে চিরতরে নির্বাসিত হতে হবে। মধ্যযুগের অন্ধকার সরিয়ে রেনেসাঁর শুরু হচ্ছে, মেডিসি ও অন্যান্য পরিবারের উৎসাহে ফ্লোরেন্স জুড়ে ছড়িয়ে পড়ছে অপরূপ সব চিত্রকলা ও স্থাপত্য। ব্রুনেলেস্কি নির্মাণ করছেন ফ্লোরেন্সের প্রতীক ক্যাথিড্রালের বিশাল ডোম। শিল্পের সঙ্গে সঙ্গে নবজাগরণ হচ্ছে বিজ্ঞান ও মানবতাবাদের। ফ্লোরেন্স থেকে যা ইতালি তথা ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ছে। হঠাৎ ছেলেমেয়ের ডাকে সম্বিৎ ফিরল। এই মহান শহরের থেকে এবার বিদায় নেওয়ার পালা।

ছবি: লেখক


ফ্লোরেন্সের দোকানপাট


ব্যস্ত চিত্রশিল্পী

কীভাবে যাবেন

কলকাতা থেকে ইতালির সরাসরি ফ্লাইট নেই। দিল্লি বা দুবাই হয়ে রোম যেতে হবে। মোটামুটি ১২ থেকে ১৬ ঘণ্টার জার্নি। রোম থেকে ফ্লোরেন্স ট্রেনে যাওয়াই সুবিধাজনক। রোমা টার্মিনি স্টেশন থেকে নিয়মিত ট্রেন ছাড়ে।

কোথায় থাকবেন

ফ্লোরেন্স ট্যুরিস্টদের শহর। এখানে বিলাসবহুল হোটেল থেকে শুরু করে ভাল অথচ কম দামের হোটেলের ছড়াছড়ি। পিক সিজ়ন বাদ দিলে মোটামুটি দৈনিক পাঁচ থেকে আট হাজার টাকার মধ্যে দু'জনের জন্য ভাল রুম পাওয়া যায়।



আনন্দধারা

সুমন মহান্তি

আজ বাড়িটা ভিড়ে গমগম করছে। আত্মীয়স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশীতে বাড়ি ভরে গিয়েছে। বাইরের বারান্দায় মানুষটার ডেডবডি রাখা হয়েছে এইমাত্র। টলোমলো পায়ে ভিতর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় এসেছি।

মুখটা কেমন যেন অচেনা লাগছে! আসলে অনেকদিন পর খুব সামনে থেকে মানুষটার দিকে সরাসরি তাকাতে পারছি। বাইশ বছর এই মানুষটার সঙ্গে ঘর করে এসেছি। বিয়ের তিন বছর পর থেকে মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলার সাহস পাইনি। হিসেব করলে উনিশ বছর ধরে একজন অচেনা অপরিচিত মানুষের সঙ্গে সংসার করেছি। সারাক্ষণ ভয়ে ভয়ে কাটিয়েছি। ভীষণ দাপুটে আর রাগী মানুষ। ঘরে থাকলে ভয়ে সিঁটিয়ে থাকতাম। গম্ভীরভাবে ডাকলে হাত-পা কাঁপত। কোনও ভুল করে ফেললে জিভ শুকিয়ে যেত। ভয়ে শরীর বরফ হয়ে যেত। এখন মুখের দিকে নির্ভয়ে তাকিয়ে আছি। কিছুক্ষণ তাকানোর পরে চোখ সরিয়ে নিলাম। দেওয়ালের দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলাম। বেশিক্ষণ থাকতে পারলাম না। শরীর অবলম্বন খুঁজছিল। দেওয়াল আঁকড়ে ধরলাম। কেউ বলল, "আহা, ওর বোধহয় মাথা ঘুরে গিয়েছে।"

কেউ আমাকে ধরে বেতের চেয়ারে বসিয়ে দিল। বেতের চেয়ারে বসে আবার মানুষটার দিকে ভালভাবে তাকালাম। মন শীতল আর নিস্পৃহ হয়ে আসছে। নিজের সঙ্গেই যেন বিড়বিড় করে কথা বলে চলেছি, "বাইশ বছর ধরে কার সঙ্গে ঘর করেছি আমি? আমার একজন স্বামী ছিল। সামাজিক বিচারে সে আমার স্বামী হলেও আসলে সে ছিল প্রভু। আমি কী দোষ করেছিলাম? নিরুপায় ছিলাম বলেই ঘর করেছি। ভয়ের সঙ্গে ঘর করেছি এতগুলো বছর। দাম্পত্যসুখ কাকে বলে জানতেই পারিনি। প্রথম তিনটে বছর খানিকাটা ভাব-ভালবাসা ছিল। পরে বুঝেছি

ওটাকে ভালবাসা বলে না। বিয়ের পর নতুন শরীর চেনা। শরীরের প্রয়োজনে কিছুটা কাছে আসা। কিছুদিনের নেশা। বোধহয় তারপরে পুরনো হয়ে গিয়েছিলাম। মোহ কেটে গিয়েছিল। মেয়ে হওয়ার পর থেকেই বিছানা আলাদা হয়ে গেল। অন্ধকারে মাঝেমধ্যে একতরফা শারীরিক সম্পর্ক ঘটে যেত। প্রবৃত্তির তাড়নাতে অন্ধকারে সে আমার শরীর পিষে ফেলত। আমার তরফ থেকে কোনও সাড়া পাওয়ার জন্য অপেক্ষা করত না। কোনও আবেগের ব্যাপার ছিল না। ছটফট করতাম যন্ত্রণায়। কাজ মিটে গেলে চুপচাপ উঠে পড়ত। এখন লোকলজ্জার খাতিরে অন্তত আমার কাঁদা উচিত। ঠান্ডা শরীরটা জড়িয়ে কান্নাকাটি করতে পারলে ভাল হত। চোখের জল তো শুকিয়ে গিয়েছে কবে! আজ মৃত্যু এসে যেন সত্যিটা নির্লজ্জভাবে জানিয়ে দিচ্ছে— মানুষটা আমার কেউ ছিল না। সে আমার দুই সন্তানের বাবা, আমার রাগী মনিব, এটাই তার পরিচয়। এখন মানুষটা মৃত। আমার কাছ থেকে চিরদিনের জন্য দূরে চলে গিয়েছে। আর সে আমাকে শাসন করতে পারবে না। জীবনের একটি পর্ব আজ থেকে শেষ হল। কেউ রেগে গেলে রান্নাঘরের কোণে সিঁটিয়ে বসে থাকতে হবে না। রান্নায় নুন কমবেশি হলে থালা ছুড়ে দেওয়ার শব্দে হাত-পা কাঁপবে না। ভুল করে চায়ে চিনি বেশি দিয়ে ফেললে ধমক শুনতে হবে না আর। ভাত দিতে দেরি হলে আর কেউ গলার শিরা ফুলিয়ে চেঁচামেচি করবে না। জামাকাপড়ে সামান্য ময়লা দেখতে পেলে কে আর মুখের উপর ছুড়ে দেবে? মানুষটার মুখ দেখছি। স্বস্তিতে দেখছি। আর বেশিক্ষণ ওই মুখ দেখতে হবে না জেনেই তাকিয়ে আছি। এরপরও কীভাবে আর কান্না আসবে? অনেক বছর আগেই আমি মরে গিয়েছি। আমাদের মধ্যে কিছুই আর ছিল না। আজ সকালে এই মানুষটি হার্ট অ্যাটাকে মারা গিয়েছে। তড়িঘড়ি নার্সিংহোমে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। ভর্তির মিনিট পনেরোর মধ্যেই সব শেষ। অফিশিয়ালি মানুষটা মারা গেল আজ। আমার কাছে মারা গিয়েছে উনিশ বছর আগেই। এতকাল যে বেঁচেছিল, সে আমার স্বামী নয়, বর তো নয়ই। বর শব্দটা খুব নরম। ভালবাসা আর মায়া জড়িয়ে থাকে। আদরে শব্দটা আর পাঁচজনের সামনে বলতেও সুখ হয়। একবার তরকারি পুড়িয়ে ফেলেছিলাম বলে রাতে ঘর থেকে বের করে দিয়েছিল। গেট আর বাড়ির মাঝখানে একফালি জায়গায় বসে ঠান্ডায় কেঁপেছি। ঘণ্টাখানেক পরে বোধহয় দয়া হয়েছিল। দরজা খুলে ভিতরে আসতে বলেছিল কঠিন গলায়। লোকলজ্জা আর অপমানের হাত থেকে রেহাই পেয়েছিলাম সেই রাতে।
মৃত মানুষের উপর রাগ-ক্ষোভ কিছুই রাখতে নেই। আমি চাইছি তীব্র এক অনুভূতি আসুক। কিছুক্ষণের জন্য ভাসিয়ে দিক। একবার বোজা চোখ দু'টিতে চুমু খাই। নিথর শীতল ঠোঁটে মুখ ডুবিয়ে কাঁদি। একবার তো জড়িয়ে ধরতেও পারি! বিয়ের পরে প্রথম একটা বছর যেভাবে জড়িয়ে উষ্ণতা পেতে চাইতাম, তেমনটা শেষবারের মতো যেন পারি। ভিড় ভাবছে, আমি শোকে নীরব হয়ে গিয়েছি। বুকের মধ্যে চলতে থাকা হাহাকার প্রকাশ করতে না পেরে প্রায় বোবা হয়ে গিয়েছি। মানুষটির বুকের উপরে, মাথার কাছে, পায়ের নীচে শুধু ফুল। ফুলের তোড়া, মালায় ঢেকে যাচ্ছে শরীর। ধূপ জ্বলছে, সুগন্ধি ধূপ ঢেকে দিতে চাইছে ঠান্ডা মৃত্যুর গন্ধ। ফুল আর ধূপের মিলিত গন্ধে মোচড় দিচ্ছে আমার শরীর।
গেটের সামনে দাঁড়িয়ে আছে ডেডবডি কেরিয়ার। খোলকীর্তনের লোকজন এসে গিয়েছে। শ্মশানে নিয়ে যাওয়ার জন্য ব্যস্ততা শুরু হয়েছে বুঝতে পারছি। শোকবিহ্বল হয়ে পড়িনি বলেই আশেপাশে কী হচ্ছে টের পাচ্ছি, দেখতে পাচ্ছি। চোখ ঝাপসা হয়নি এতটুকুও। শরীরে কোথাও সামান্য কাঁপুনি পর্যন্ত হচ্ছে না। যে ভয়ে এতকাল জড়োসড়ো হয়ে থেকেছি, ঘন ঘন কেঁপেছি, সেই ভয়টাই আমাকে আজ থেকে চিরদিনের জন্য ছেড়ে চলে গিয়েছে।

২

বিল্টু ছলোছলো চোখে বলল, "মা, বাবাকে নিয়ে যাচ্ছি। তুমি অনুমতি দাও।"
অবাক হয়ে চেয়ে আছি। মুখে কোনও কথা আসছে না। বিল্টু অনুমতি চাইছে, তা-ও আমার কাছে! ও কখনওই আমার ইচ্ছে-অনিচ্ছের তোয়াক্কা করেনি। আদৌ গুরুত্বই দেয়নি। দেওয়ার দরকার আছে বলে মনে করেনি। বাবাকে খুব ভয় পেত। কখনও টুঁ শব্দটি করেনি। আমার বেলায় অন্যরকম মেজাজ। রান্না পছন্দ না হলে মেজাজ দেখিয়েছে। সময়মতো খেতে না দিলে জিনিসপত্র ছুঁড়েছে। কিছু ভুল হলে চিৎকার করেছে। কম বয়স থেকেই ও বুঝে গিয়েছিল যে তার বাবাকে আমি ভয় করি। বড় হতেই তাই আমাকে অবলীলায় শাসন করতে শুরু করল। স্কুলের ব্যাগে জলের বোতল দিতে একদিন ভুলে গিয়েছিলাম। স্কুল থেকে ফিরে এসে খুব চোটপাট করল, চোখ পাকিয়ে বলল, "দাঁড়াও,আজ তোমার হচ্ছে। বাবা আসুক, বলছি, কেমন কেয়ারলেস হয়েছ! কেমন ঝাড় খাবে ভেবে নাও।"
সংসারে কোথাও একটু ভুল হওয়ার জো ছিল না। তটস্থ থাকতাম। বিল্টুর সঙ্গে তার বোনও বড় হয়ে শাসন করত, ভয় দেখাত। কেডসের ফিতে হয়তো কাচতে দিতে খেয়াল নেই। জুতো ধবধবে পরিষ্কার। তবু সেই সামান্য কারণেই রিনি মুখঝামটা দিয়ে বলল, "এরপর থেকে ভুল হলে বাবাকে জানিয়ে দেব। কেমন দেবে দেখো!"
বিল্টু বলল, "মা, কোন শ্মশানে নিয়ে যাব?"
ভাবনার জগতে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলাম। মৃদুগলায় বললাম, "যেখানে তোদের সুবিধে হবে।"
"না, তুমিই বলো।"
"তা হলে জুগনিতলায় নিয়ে যাওয়া হোক।"
শহরে দু'খানা শ্মশান আছে। তার মধ্যে ওটা পুরনো। চুল্লির বন্দোবস্ত করা হয়েছে কিছুদিন আগে। হঠাৎ কী গুরুত্ব বেড়ে গেল আমার? গুরুত্ব ছিলই না কখনও। আজ ছেলে মতামত জানতে চাইছে। বাকিরা আমার মুখের দিকেই তাকিয়ে আছে। কিছু ভেবেও বলিনি। ওই শ্মশানে শাশুড়িকে দাহ করা হয়েছিল মনে আছে। নামটা মুখে চলে এসেছে। সেটাই এখন সবার সিদ্ধান্ত হয়ে গেল। পাড়ার ছেলেরা বলল, "বউদি বলেছে জুগনিতলা। ওখানেই নিয়ে যাওয়া হবে।"
ভিড়ের মধ্যে অনেকে দরাজ প্রশংসা করছে শুনতে পাচ্ছি। কেউ বলল, "সৈকতদার মতো মানুষ হয় না। বাইরে থেকে রাগী মনে হলেও ভেতরটা খুব নরম ছিল।"
কেউ বলছে শুনতে পেলাম, "উদ্যমী পুরুষ ছিলেন। অল্প বয়সে বাবাকে হারিয়েও একা নিজের চেষ্টায় বড় হয়েছেন। বিজ়নেসে ঝুঁকি নিয়েছেন, সফল হয়েছেন।"
পাড়ার ক্লাবের টিটো বলল, "দিলখোলা লোক ছিলেন আমাদের দাদা। ক্লাবের ব্যাপারে কোনও হেল্প চাইলে খালি হাতে ফেরাতেন না।"
"ডিসিপ্লিনড মানুষ ছিলেন। নিয়মের মধ্যে থাকতে পছন্দ করতেন। ব্যবসায় উন্নতি করতে পেরেছেন সেইজন্য।"
"আহা, এমন অ্যাকটিভ মানুষ দুম করে চলে গেলেন। এনার্জি ছিল। বাড়ি, গাড়ি,সম্পত্তি কত কিছু করেছেন। মাত্র একান্ন বছর বয়স হয়েছিল। এটা কি যাওয়ার বয়স?"
শুনতে শুনতে চোখ বন্ধ করে ভাবছি। তা হলে আমিই কি চিনতে পারিনি ঠিকঠাক? ভিতরের নরম মানুষটি শুধু আমার কাছেই অধরা

রয়ে গিয়েছিল? মনে পড়ল ভাই একবার ব্যবসা খুলবে বলে কিছু টাকা ধার করেছিল। ছ'মাসের মধ্যে ফেরত দেওয়ার কথা ছিল। ন'মাসেও ফেরত দিতে না পারায় তাকে ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বের করে দিয়েছিল বিল্টুর বাবা। ভাইয়ের অপরাধের শাস্তি হিসেবে আমাকে তারপর আট বছর বাপের বাড়ি যেতে দেওয়া হয়নি। নির্দেশ অমান্য করে গেলে আর ফিরে আসা হবে না। আট বছর বাদে হাতে-পায়ে ধরে যাওয়ার অনুমতি মিলেছিল। মা মৃত্যুশয্যায় বলেই শুধু চব্বিশ ঘণ্টার ছাড় মিলেছিল। মা মারা যাওয়ার পরে শ্রাদ্ধশান্তির কাজে অবশ্য মানুষটা গিয়েছিল। তবে ভাইয়ের সঙ্গে একটি কথাও বলেনি। ভাই কিন্তু এক বছরের মধ্যেই ধার শোধ করে দিয়েছিল। নিয়ম মেনে চলা মানুষ ছিল বলেই কথার খেলাপ সহ্য করতে পারেনি! লজ্জায়,অপমানে ভাই আর কোনওদিন এই বাড়িতে পা রাখেনি। আজ ভাই কি এসেছে? ব্যাকুলচোখে ভিড়ের মধ্যে ভাইকে খুঁজলাম। দেখতে পেলাম না। রিনিকে কাছে ডেকে জানতে চাইলাম, "তোর মামা এসেছে?"

"হ্যাঁ।"

"কোথায়? তাকে একবার ডাক।"

ভাই কাছে এসে বলল, "ডাকছিলি?"

"বিল্টুকে একটু সামলে রাখবি।"

"তুই ভাবিস না দিদি। বিল্টু স্টেডি আছে। তোকে দেখে কেমন লাগছে! শরীর খারাপ লাগছে না তো?"

ক্লান্তভাবে মাথা নেড়ে বলি, "না।"

ভাইয়ের কাঁধে মাথা এলিয়ে দিয়ে জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিই। এতক্ষণে কাঁদার জন্য একটা কাঁধ পেয়েছি। ওরা একটু পরেই সৈকত সাহাকে নিয়ে চলে যাবে। এবার তো একটু কাঁদা উচিত। অনেকেই ভাবল ভেঙে পড়ছি। শোক সামলাতে না পেরে এমন করছি। ভিড়ের অনেকেই আমাকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। মন শক্ত করতে বলল, মেনে নিতে বলল। জীবনের ঝড়ঝাপটা শান্তভাবে সামলাতে হয়। প্রতিবেশী কাকিমা বললেন, "কী করবে বলো! জীবন এমনই। কাল পর্যন্ত সুস্থ-স্বাভাবিক মানুষটা এভাবে চলে যাবে কেউ ভাবতে পেরেছিল? এখন থেকে তোমার কত দায়িত্ব!"

এসব শুনেও কান্না আসছে না, কষ্ট হচ্ছে না। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকলাম শুধু। বুঝে উঠতে পারছি না ঠিক কী করা উচিত এখন? ছেলেমেয়েকে সান্ত্বনা দিতে কাছে ডাকব, মাথায় হাত বুলিয়ে দেব একটু? এতদিন পর্যন্ত কি দায়িত্ব পালন করিনি? দায়িত্বে ভুল হলে ভয়ে রান্নাঘরে মুখ লুকিয়ে বসে থাকিনি? সংসারে কারও কাছে তার দাম ছিল? আজ থেকে নাকি আমার অনেক দায়িত্ব! ঘোরের মধ্যে তাকিয়ে থাকি। চারপাশ কেমন অচেনা লাগছে। দেখছি আর ভাবছি এই মানুষটি আমার কর্তা ছিল! সত্যিই ছিল? কত বছর দূরে দূরে ছিলাম। বিচ্ছিন্ন ছিলাম আসলে। রাতের অন্ধকারে কয়েক মিনিটের জন্য কাছে আসতে পেরেছি। তারপর ছিটকে চলে গিয়েছি। বুকে মাথা রাখার সুযোগই ছিল না। রান্নাঘর ছিল নিজের জায়গা। আশ্রয় বা অবলম্বন বলতে ওটুকুই তো ছিল।

ওরা নিয়ে চলে যাচ্ছে। কান্নার রোল উঠছে চারপাশে। বাতাস ভারী হয়ে থমকে পড়েছে। শুধু আমি দাঁড়িয়ে আছি নিষ্পলক, অসাড়, আচ্ছন্ন অবস্থায়। একবার অন্তত স্পর্শ করতে তো পারতাম! ছুঁতে পারতাম মৃত্যুকে। কিছুই পারলাম না।

মানুষটাকে নিয়ে চলে যাওয়ার পরে বাড়িটা অদ্ভুত ফাঁকা লাগছে। খাঁ খাঁ করছে। শূন্যতা যেন গিলতে আসছে আমাকে। আশ্চর্য! ভয় লাগছে না এতটুকু। কেবল একা মনে হচ্ছে নিজেকে। সারাক্ষণের সঙ্গী চলে গেলে একা যে লাগবেই। ভয় চলে গিয়েছে, তাই একা লাগছে। কী যেন নেই, কে যেন নেই!

৩

সাহা বস্ত্রালয়ের কাউন্টারে বসে আছি। আজকাল ঘরে খুব কম থাকি। একজন রান্নার লোক রেখেছি। চব্বিশ ঘণ্টার লোকও আছে একজন। ব্যবসা আমাকে সামলাতে হয় বলে রান্নাঘরে আর ঢোকা হয় না। বিল্টুর কলেজে সেকেন্ড ইয়ার চলছে। রিনি তিনমাস পরে উচ্চমাধ্যমিক দেবে। ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট, ব্যবসা, হিসেব সব আমাকেই বুঝে নিতে হয়েছে। ওরা আমাকে ভয় দেখায় না, মুখঝামটা দিতে পারে না, সমঝে চলে। একটু আগে বিল্টু ফোন করেছিল। দশ হাজার টাকা লাগবে তার।

"কেন?"

"স্মার্টফোন কিনব।"

"তোর ফোন খুব বেশিদিন হয়নি। ওটাও স্মার্টফোন। অনার্স পাশ করার আগে কোনও ফোন হবে না। কথাটা সরাসরি বললেই তো হত। ফোনে কেন?"

আমার গলার স্বরে এমন কিছু ছিল যে বিল্টু আর কথা বাড়ায়নি। নিজের কথা বলার ভঙ্গিতে নিজেই অবাক হয়ে যাই আজকাল। ছেলেমেয়ে আমার কথা মানে। পালটা কিছু বলে না। ঘুড়ির সুতো এখন আমার হাতে। কতটা ছাড়ব কতটা গোটাব, বেশ বুঝতে পারি। রিনি ক'দিন উড়ে বেড়াচ্ছিল। পার্কে একটি ছেলের সঙ্গে দেখে দোকানের এক কর্মচারী কানে তোলে। রিনিকে ডেকে বলি, "ব্যবসার টাকা সবদিন না থাকতে পারে। তোমাদের দু'জনকে পড়ানোর খরচ আছে। কেরিয়ার না গড়ে ওসব করলে বিয়ে দিয়ে দেব। পড়াশোনাই বন্ধ করে দেব। মনে রাখবে।"

কড়া কথা শোনানোর সময় ওদের 'তুমি' বলি। ওদের ভবিষ্যতের সুখস্বাচ্ছন্দ্য যে আমার ওপর নির্ভর করছে, সেটা কিছুদিনের মধ্যেই বুঝিয়ে দিতে পেরেছি। আমার কথা না মেনে ওদের উপায় নেই। সারাদিন প্রচণ্ড ব্যস্ততায় কাটে। রাতে বিছানায় শরীর ফেললেই ঘুমিয়ে পড়ি। সারাদিন কাজে ব্যস্ত থাকি, সংসার, ব্যবসা, ছেলেমেয়ের পড়াশোনা... বেশ থাকি। ক্লান্ত মনে হয় না কখনও। কে যেন ঘাড় ধরে কাজ করিয়ে নিচ্ছে। সারাক্ষণ দৌড়ঝাঁপ চলতেই থাকে। চুয়াল্লিশ বছর বয়সে এসে নিজেকে খুঁজে পেয়েছি। কাজকে বোঝা ভাবি না, দায়িত্বকে চাপ মনে করি না, সিদ্ধান্ত নিতে পারি। দোকানের কর্মচারিরা আমার মুখের দিকেই চেয়ে থাকে, যে কোনও ব্যাপারে মতামত চায়। মাত্র চার মাসেই পারস্পরিক বোঝাপড়ার পরিবেশ তৈরি করে নিতে পেরেছি। মাত্র চারমাসে আমার পৃথিবী ভীষণভাবে বদলে গিয়েছে। সময় পেলে রাতের তারাভরা আকাশের নীচে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকি। এতগুলো বছর আমার কোনও আকাশ ছিল না। এখন হাতের মুঠোয় একফালি আকাশ। স্বপ্নে উড়ে যাওয়া পাখিরা দলবেঁধে আসে। এতদিনে স্বাধীনতার মানে বুঝেছি, স্বাদ চিনেছি। একটা মৃত্যু হ্যাঁচকা টানে ভয়ের শিকড় উপড়ে দিয়েছে। বদলে দিয়েছে জীবনের রং।

অনেকে প্রশংসা করছে আমার। কেউ বলছে, "মনের জোর আছে বলতে হবে। এই বয়সে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে সব কেমন সামলে দিচ্ছে!"

"উনি শক্ত ধাতুতে গড়া। বিপদে অবিচল। ধাক্কা কাটিয়ে উঠে দশভুজার মতো কতকিছু একা সামলে দিচ্ছেন! ওঁকে দেখে অনেকের শেখা উচিত। যেমন দায়িত্ববোধ তেমন ঠান্ডা মাথা।"

প্রশংসা শুনতে কার না ভাল লাগে? অনেকে সামনেই বলে। শুনে উদ্যম আরও বেড়ে যায়। দ্বিগুণ উৎসাহে কাজে ডুবে থাকি। নতুন জীবনে এ-ও এক প্রাপ্তি। এতকাল প্রশংসা তো দূরের কথা, শুধু বকুনি আর মেজাজ সহ্য করেছি। নিজেকে অপদার্থ ভেবে চোখের

জল ফেলেছি।

বেশ ছিলাম, ভালই ছিলাম। আজ সকাল থেকে মন ভীষণ বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে। কাজে মন বসছে না। আত্মীয়মহলে নাকি কানাঘুষো শুরু হয়েছে। কিছু কথা কানে এসেছে। স্বামী হারিয়ে আমি নাকি বেশ আছি। সৈকতের জন্য একফোঁটা চোখের জল পর্যন্ত ফেলিনি। বাইরে বেশ শান্ত। গোবেচারা ভাব নিয়ে থাকত। বর মারা যাওয়ার পরে আসল রূপ দেখা যাচ্ছে। দিব্যি আনন্দে আছে। মায়া মমতা নেই শরীরে। বরের ব্যবসা, টাকা, ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স ভোগ করছে অথচ সেই মানুষটার জন্য একটু চোখের জল কেউ দেখেছে? কানে এগুলোই এসেছে। আড়ালে আরও কী কী বলছে জানা নেই।

কথাগুলো মাথায় হাতুড়ি পেটাচ্ছে খালি। উড়িয়ে দিতে পারছি না। আমি আদৌ শক্ত ধাতুতে গড়া নই। কঠিন মনের হতে পারলাম কোথায়? তাহলে এতকাল মুখ বুজে থাকতাম না। ভয়ে কাঁপতাম না। পরিস্থিতি আমাকে কাজ বুঝে নিতে বাধ্য করেছে। ছেলেমেয়েরা হ্যাটা করে এসেছে অনেকদিন। ওদের মা আমি, ওদের ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করতে যে আমি চাইব। নিন্দুকেরা কি খুব ভুল বলেছে? সত্যিই তো আমি এতটুকু কাঁদিনি। শ্রাদ্ধশান্তির সময়েও চুপচাপ ছিলাম। কান্না পায়নি। কাঁদতে পারিনি। আমার তেমন কষ্ট হল না, নিরুত্তাপ থাকলাম। বাইশটা বছর এক ছাদের তলায় কাটিয়েছি। রোগে ভুগে বয়সকালে মৃত্যু হলেও কথা ছিল। অসময়ে বিনা নোটিশে চলে যাওয়া একজনের জন্য চোখের জল ফেলা যেত না? তার মানে আমার মায়া মমতা নেই, স্বাভাবিক নই। যতই অত্যাচার করুক, সে আমার স্বামী ছিল!

কাল সারারাত ঘুম হয়নি। এপাশওপাশ করেছি। সকাল থেকে সব কাজ করছি ঠিকই। অস্থির লাগছে। মনে ছটফটানি। হাত থেকে কাচের গ্লাস পড়ে ভেঙে গিয়েছে। মন চেয়েছে কেউ এসে ধমকে দিক। ফাঁকা লাগছে। ঘরে মন টিকছে না।

কাল সারারাত ঘুম হয়নি। এপাশওপাশ করেছি। সকাল থেকে সব কাজ করছি ঠিকই। অস্থির লাগছে। মনে ছটফটানি।



৪

ডাউন হাওড়া লোকালের মহিলা কামরায় জানালার ধারে বসে আছি এখন। কর্মচারীদের উপর দোকান ছেড়ে দিয়ে বেলা এগারোটা নাগাদ বেরিয়ে পড়েছিলাম। একা থাকতে চাইছিলাম। শহরের ভিড় থেকে দূরে কোথাও চলে যাব আজ। রাতে ঘুম হয়নি বলেই ঢুলুনি এসেছিল। কাঁধে কারও স্পর্শ পেয়ে চোখ খুললাম। সামনে টুনি হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছে। একগাল হেসে বলল, "কতদিন পরে তোমাকে দেখতে পেলাম বউদি। কোথায় যাচ্ছ?"

"কোলাঘাট।"

"কারও বাড়ি?"

উদ্দেশ্যহীনভাবে বেরিয়ে পড়েছি। কোলাঘাট পর্যন্ত টিকিট কেটেছি। আসল কারণ কেন বলতে যাব? বললাম, "ব্যবসার কাজে।"

টুনিকে হতভম্ব দেখাল। চারবছর আমাদের বাড়িতে ঠিকের কাজ করেছিল। মাতাল বরের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে নিজের বাপের বাড়িতে থাকত আর বিভিন্ন বাড়িতে ঠিকের কাজ করত। দু'বছর আগে টুনি খুশিতে ডগমগ হয়ে জানাল, "বর নিতে এসেছে গো বউদি। নেশাভাঙ করা ছেড়ে দিয়েছে। শ্বশুরবাড়ি ফিরে যাচ্ছি। আর তোমাদের এখানে কাজ করা হবেনি।" ঠিকের কাজ করলেও আমাকে রান্নাঘরে এসে মাঝেসাঝে সাহায্য করত, নানারকম গল্প করত। ও প্রায়ই বলত, "তুমি এমন কুঁকড়ে থাক কেন গো? সংসার তোমার, ফোঁস করতে পারো না? পোষাল না বলে সংসারের মুখে ঝাঁটা মেরে চলে এলাম।" অন্দরমহলের খবর সে জানত বলেই অমন বলত। এখন ট্রেনে বসে সেই আমি ব্যবসার কাজে যাচ্ছি শুনে অবাক তো হবেই। টুনি কিছুক্ষণ খুঁটিয়ে দেখল আমাকে। ইতস্তত করে জানতে চাইল, "দাদাবাবু?"

"চার মাস আগে হার্ট অ্যাটাকে চলে গেলেন।"

টুনি বলে, "আচ্ছা, তাই তুমি এখন ব্যবসা দেখছ?"

"হ্যাঁ।"

পাশের সিট খালি হতে বসে পড়ল টুনি। কিছুক্ষণ উশখুশ করে কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে মৃদুগলায় বলে, "কিছু মনে কোরো না বউদি। অ্যাদ্দিনে তুমি মুক্তি পেলে।"

ভিতরে ভিতরে চমকে গেলেও নির্লিপ্ত মুখে বসে থাকার চেষ্টা করলাম। কথা ঘোরানোর জন্য প্রশ্ন করি, "তুই কেমন আছিস?"

"ভাল।"

"বর শুধরে গেছে?"

"বাজারে সবজির আড়ত করেছে। রোজগার মন্দ নয়। হপ্তায় একদিন নেশা করে এখন। ওই একটা দিন ঝামেলা করে। বেশি নেশা চড়ে গেলে মারধর করে।"

"সেই তো সহ্য করছিস তাহলে!"

"বছরে ক'টা দিন আর? বড়জোর আট-ন'দিন বৈ তো নয়। নেশা কেটে গেলে মাফটাফ চায়। সোহাগ করে", টুনি দাঁত বের করে হাসে।

আমার খুব রাগ হল। এক অশিক্ষিত মেয়ে কিনা বলছে, ভাল হয়েছে। এদিকে নিজেই বরের কাছে পিটুনি খায়! গলায় বিদ্রূপ উঠে আসে, "তাহলে লাথিঝাঁটা খাওয়া কমেছে, এই যা! একই ব্যাপার হল।"

টুনি বলে, "না হয় বছরে ন-দশবার গায়ে হাত তোলে। হুঁশ থাকলে কিন্তু কখনও মারে না। অনেকে গায়ে হাত তোলে না, খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মারে। সারা জীবন ধরে ধমকে চমকে রাখে। সে অনেক বেশি যন্তনার হয় না? টাকাপত্তর আমাকেই রাখতে দেয়, আমিই নাকি ওর ব্যাঙ্ক! মরদ অনেক শুধরেছে। সবই কি আর ভাল হয় গো!"

দুটো স্টেশন বাদে টুনি নেমে যেতে স্বস্তি পেলাম। নিজের মতো কিছুক্ষণ একা থাকব বলেই তো বেরিয়ে পড়েছি। পাশে বসে টুনি একটানা নানারকম বকবক করে যাচ্ছিল। বাধ্য হয়ে আমাকেও কিছু বলতে হচ্ছিল। নিজের মতো থাকব বলে মোবাইল ফোন অফ করে রেখেছি। টুনি এবং তার কথা আমাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে টের পাই। ভাগ্যিস টুনির সঙ্গে দেখা হল! ওর উপর অকারণে বিরক্ত হচ্ছিলাম।

৫

বিকেলে দোকানে ফিরতেই দত্তবাবু, সবচেয়ে পুরনো কর্মচারী, বললেন, "কোথায় ছিলেন ম্যাডাম? আপনার মেয়ে আর ছেলে কতবার ফোন করেছে জানেন? ফোন নাকি সুইচড অফ ছিল।"

ম্লান হেসে বলি, “দরকার ছিল। এক জায়গায় গিয়েছিলাম।”
“ওদের একবার জানিয়ে দিন। আপনি এলেই আমাকে জানাতে বলেছে।”
“আচ্ছা, সময় করে জানিয়ে দেব।''
বিল্টু আর রিনি কী মনে করে আমার খোঁজে অস্থির হল! দোকানে থাকলে ফোন অবশ্য মাঝেমধ্যে পাই। দরকারেই করে। এগারোটা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত দোকানে থাকি। রিনিকে ফোন করে



তীব্র অবিশ্বাসে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি। আঠারো হয়েছে সবে, এত পরিণত কথা বলছে, কেমন অচেনা লাগছে ওকে। আমার মেয়ে তাহলে সত্যিই সাবালক হল!

খেয়েছে কি না, পড়তে বসেছে কি না খোঁজ নিই। সামনে হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষা, খেয়াল রাখতেই হয়। দায়িত্ব আমার, আমি ছাড়া কে নজরে রাখবে? জীবনের বাকি দিনগুলো দায়িত্ব আর কর্তব্য করেই কেটে যাবে। আমার খোঁজ কেউ রাখত না, এখনও রাখে না। অত ফোনটোন করতে পারব না। ক্লান্ত লাগছে বলে দত্তবাবুকে বললাম, “বাড়ি থেকে একবার ঘুরে আসি।” নিয়ম ভেঙে আজ বিকেল চারটে বাজতেই বেরিয়ে পড়লাম। অবশ্য সকাল থেকেই সব বেনিয়মে চলছে। প্রায় পাঁচঘণ্টা দত্তবাবুর হাতেই ক্যাশ কাউন্টার ছেড়ে চলে গিয়েছিলাম।
গেটের মুখে রিনি দাঁড়িয়েছিল।আমাকে দেখেই ঝাঁঝিয়ে ওঠে, “কোথায় গিয়েছিলে? ফোন বন্ধ করে রেখেছ কেন?”
মন নিমেষেই তেতো হয়ে গেল। মেয়ের কছেও জবাবাদিহি করতে হবে? অবিকল বাবার ভঙ্গিতেই মেজাজ দেখাচ্ছে। ধুর! এই সংসারে বেশিদিন থাকবই না। একদিন দায়িত্বের পালা শেষ হবে। সব ছেড়েছুড়ে কোনও আশ্রমে চলে যাব। চোয়াল কঠিন করে বললাম, “কাজ ছিল।”

বারান্দায় পা রাখতেই বিল্টু বেরিয়ে এসে প্রশ্ন করে, “কোথাও গিয়েছিলে?”
“কোলাঘাট।”
“কোলাঘাট! কেন?”
রাগে মুখ থেকে বেরিয়ে আসে, “ডুবে মরব বলে।”
বিল্টুর মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল। পিছনে দাঁড়িয়ে রিনি ঘাড় নাড়ে, “সে সাহস তোমার নেই। থাকলে অমন ভয়ে ভয়ে কাটাতে না।”
বিল্টু বলে, “বাজে কথা বলছিস কেন?”
রিনি তর্কের মেজাজে বলে, “ভুল বলছি নাকি? বাবার দাপটে মা সিঁটিয়ে থাকত না? কম বয়সে অত বুঝতাম না। বাবার দেখাদেখি আমিও শাসন করে, ভয় দেখিয়ে আনন্দ পেতাম। তোকে দেখেও শিখেছি। তুই আমার চেয়ে দু'বছরের বড়। কখনও বলেছিস এরকম ঠিক নয়? আমরা ভাইবোন দু'জনেই মাকে র‍্যাগিং করে আনন্দ পেতাম।”
বিল্টু বিব্রত হয়, “অত বুঝতাম না তখন।”
বিস্ময়ে ওদের দিকে চেয়ে থাকি। বিশ্বাস হচ্ছে না। এটা ঠিক যে, শেষ এক বছর ওরা অতটা অবজ্ঞা করত না। মেজাজ দেখাত না। তবে প্রতিবাদও করেনি। না, আসলে টাকার চাবিকাঠি আমার কাছে আছে বুঝেই মন জুগিয়ে চলছে। স্বার্থের প্রয়োজন অভিনয় করিয়ে নেয়। ধীরভাবে বলি, ''তোদের বাবা চলে যাওয়ার পরে একফোঁটা কাঁদিনি। আমার কষ্টও হয়নি, আনন্দও হয়নি। অনেকে বলাবলি করছে যে, আমি খুব নিষ্ঠুর, কঠিন। মায়া মমতা নেই। তোদেরও কি তাই মনে হয়?''
বিল্টু বলল, ''লোককে নিয়ে ভাবো কেন?''
রিনি বলে, “লোকদেখানো কান্নার কী দরকার! লোকের ভয়ে, সমাজের ভয়ে নকল কান্না না কাঁদলেও চলবে। তুমি চালাক নও বলেই কাঁদতে পারোনি।''
তীব্র অবিশ্বাসে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি। আঠারো হয়েছে সবে, এত পরিণত কথা বলছে, কেমন অচেনা লাগছে ওকে। আমার মেয়ে তাহলে সত্যিই সাবালক হল! গেটে দাঁড়িয়ে তা হলে মেজাজ দেখাচ্ছিল কেন? রিনি চোখ পাকিয়ে বলল, “তবে কাজটা খারাপ করেছ। ফোন বন্ধ করে রেখে, কাউকে কিছু না বলে এভাবে যাবে না কিন্তু। আমাদের চিন্তা হতে পারে না? কতরকম ভয় যে হচ্ছিল!”
বিল্টু বলে, “"না বুঝে না জেনে অনেক অন্যায় করেছি আগে। তাই বলে আমাদের উদ্বেগ হবে না?”
রিনি অভিমানে বলল, “আমরা তো পাষাণ। আমাদের বিশ্বাস করতে পারে না। শরীর খারাপ কি না জানতে চাইলেও কেমন করে তাকায়। ভাবে অভিনয় করছি, মতলবে করছি। এত বোকা কেন?''
রিনির কথা বলার ধরন ওরকমই। নরমভাবে বলতে পারে না। মনে হল মেয়েটাকে চিনতে পারছি একটু আধটু। ছেলেকেও দূরের মনে হচ্ছে না। আমি একা নই, এই মুহূর্তে আমাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে দুই আপনজন।
আমার ভীষণ কান্না পাচ্ছে। চেপে রাখতে পারছি না কিছুতেই। দু'হাতে মুখ ঢেকে কান্নায় ভেঙে পড়ি। মাথায় রিনি হাত রাখে। বাস্তুয় স্পর্শে গভীর আনন্দ টের পাই। মনের যত জমানো দুঃখ-ক্ষোভ-আবর্জনা ধুয়ে যাচ্ছে বুঝতে পারি। বুঝতে পারি আনন্দের কান্নার জন্য কোনও প্রস্তুতি লাগে না...

অলংকরণ: দীপঙ্কর ভৌমিক



ছাংবাং লে কুর্তাই

উত্তর-পূর্ব ভারতের মিষ্টি

খাপসে, পুখলেইন বা আওয়ান বাংগুই— নামগুলো শুনতে খটোমটো লাগলেও এগুলোর প্রতিটাই আসলে জিভে জল আনা অভিনব কিছু মিষ্টি। উত্তর-পূর্ব ভারতের লোভনীয় রেসিপি নিয়ে এলেন ফুড কলামনিস্ট মৌসুমী ভট্টাচার্য। সংকলনে রূপকিনী সেনগুপ্ত ও দোলনা রায়।

আরও একটা নতুন বছর। যতই কেক-পেস্ট্রি-ওয়াইন সহযোগে ইংরেজি নববর্ষ পালন করা হোক না কেন, বাঙালির কাছে নববর্ষ মানেই পয়লা বৈশাখ! খাদ্যরসিক বাঙালির মন, প্রাণ ও রসনা জুড়ে যে রয়েছে এই দিনটা। এই একটা দিন বাঙালি সারা বছরের ডায়েট, ওয়েট ওয়াচিং ইত্যাদিকে সাময়িকভাবে ভুলে যান। সর্বকালের সেরা নলেন গুড়ের সন্দেশ থেকে হাল আমলের ফিউশন মিষ্টি, শেষপাতে মিষ্টিমুখের এত বৈচিত্র সারা পৃথিবীতে আর কোথায়? তবে খাদ্যরসিক বাঙালির রসনাতৃপ্তি তো কেবল একই জায়গার খাবারে সীমাবদ্ধ নয়। সারা পৃথিবীর সমস্ত খাবারকেই আপন করে নেওয়া এই জাতি কেমন করেই বা বাদ রাখে ভারতের এক কোণে অপার্থিব প্রাকৃতিক সৌন্দর্য নিয়ে ছড়িয়ে থাকা সাতটি রাজ্যকে? বিশেষত যখন উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলির সঙ্গে বাঙালির রসনার



খাপসে

এবং ঐতিহ্যেরও রয়েছে বেশ কিছু মিল। উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলি বা 'সেভেন সিস্টার স্টেটস'-এর খাবার বা মিষ্টির স্বাদও অনেকটাই অধরা আমাদের কাছে। তবে পশ্চিমবঙ্গের মতো এই রাজ্যগুলিতেও মিষ্টিমুখ করার (এবং করানোর) মানুষের অভাব নেই! ভোজের শেষে সেখানেও প্রায় অমৃতের মতো মিষ্টি পরিবেশন করা হয়। সেই সমস্ত মিষ্টি আমাদের বাঙালি মিষ্টির চেয়ে কোনও অংশে কম যায় না।
এখানে রইল অসম, মণিপুর, মিজোরাম, ত্রিপুরা, মেঘালয়, নাগাল্যান্ড এবং অরুনাচল প্রদেশের কয়েকটি জনপ্রিয় মিষ্টির রেসিপি। আশা করা যেতে পারে, যে এই মিষ্টান্নগুলি স্বাদে, সুবাসে, খাদ্যরসিক বাঙালির মন সহজেই জয় করে নিতে পারবে।


কল পিঠা

ছাংবাং লে কুর্তাই

নামটা বেশ শক্ত। কিন্তু মুখে দিলেই তার ভুবনভোলানো স্বাদে আপনি মাতোয়ারা হবেনই। এই মিষ্টির জন্মস্থান মিজোরাম। মিজোদের দেশের এই অনবদ্য মিষ্টিটি বানাতে আপনাকে বিশেষ কাঠখড় পোড়াতে হবে না। একদম সাদামাটা উপকরণ (চালের গুঁড়ো এবং গুড়) দিয়ে অনায়াসেই আপনি বানিয়ে ফেলতে পারবেন এই অমৃতভোগ।
উপকরণ: চালের গুঁড়ো ১/২ কাপ, গুড় ১/২ কাপ, কলাপাতা ৩টে।
প্রণালী: প্রথমে চালের গুঁড়ো এবং গুড় ভাল করে মিশিয়ে নিন। এরপর তাতে সামান্য জল দিয়ে, একটা মিশ্রণ তৈরি করে নিন। এরপর কলা পাতায় সামান্য মিশ্রণ দিয়ে, ভাল করে মুড়ে নিয়ে স্টিম করে নিন। তাহলেই তৈরি ছাংবাং লে কুর্তাই।


পুখলেইন

খাপসে

রাজগিরা শস্য এবং দুধের মেলবন্ধনে এই মিষ্টান্নটির স্বাদও যথেষ্ট রাজকীয়! অরুনাচল প্রদেশের এই অতি জনপ্রিয় মিষ্টান্নটি বিনা, সেই দেশের ভোজ অসম্পূর্ণই থেকে যায়। সোনালি রঙের এই মিষ্টির নাম খাপসে। প্যাঁচের নিরিখে সে পশ্চিমবঙ্গের জিলিপিকে কঠোর প্রতিযোগিতা দিতে পারে। তবে, একবার মুখে পড়লেই আপনার মন এবং রসনাকে জয় সে করবেই।
উপকরণ: রাজগিরা শস্যের গুঁড়ো এক কাপ (তবে এটি আপনার এলাকায় যদি নেহাতই দুষ্প্রাপ্য হয়, তাহলে সাধারণ ময়দা দিয়েও কাজ চালিয়ে নেওয়া যেতে পারে), তেল ১ টেবলচামচ, চিনি ১/২ কাপ, দুধ ২৫০ মিলিলিটার, ভাজার জন্য তেল।
প্রণালী: একটা পাত্রে ময়দা, তেল, গরম জল এবং দুধ মিশিয়ে নিন। তাতে স্বাদমতো চিনি যোগ করে ভাল করে মেখে নমনীয় একটি মণ্ড তৈরি করে নিন। তারপর এই মণ্ড থেকে বড় মাপের লেচি কেটে নিয়ে, চ্যাপ্টা করে বেলে নিন। তারপর এই লেচিগুলিকে আড়াআড়িভাবে কেটে



আওয়ান বাংগুই

নিন। এবার লেচিগুলিকে মাঝখান থেকে সামান্য কেটে নিয়ে, একে অন্যের ভিতর দিয়ে, ভাল করে লেচিগুলিকে ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে দিন। এরপর কড়াইতে তেল গরম করে নিন। তেল ফুটলে, অল্প আঁচে, লেচিগুলিকে লাল করে ভেজে তুলে, গরম গরম পরিবেশন করুন।

কল পিঠা

এমনিতে হয়তো কলা খেতে অনেকেই পছন্দ করেন না। তার উপর আবার কলা দিয়ে যদি হয় মিষ্টি! তবে কলার সঙ্গে চালের গুঁড়োর বন্ধুত্বে যখন তৈরি হয় অসমের বিখ্যাত মিষ্টি কল পিঠা, তখন তার স্বাদ উপেক্ষা করার সাধ্য থাকে না কোনও মিষ্টিপ্রেমীরই!

উপকরণ: পাকা কলা চটকানো, চালের গুঁড়ো, গুড়, দুধ পরিমাণ মতো

প্রণালী: একটি পাত্রে চটকানো পাকা কলা, চালের গুঁড়ো ও গুড় ভাল করে মিশিয়ে তৈরি করে নিন মালপোয়ার ব্যাটার। প্রয়োজনে অল্প দুধও দিতে পারেন। এরপর প্যানে তেল বা ঘি দিয়ে এই মালপোয়ার ব্যাটার চ্যাপটা চ্যাপটা করে ভেজে নিলেই তৈরি হয়ে যাবে কল পিঠা।

পুখলেইন

জিভে জল আনা এই মিষ্টান্নটির জন্মস্থান মেঘালয়। স্বাদে, সৌরভে সে এক কথায় লা-জবাব। কিন্তু অসামান্য এই মিষ্টান্নটি তৈরিই হয় অত্যন্ত সাদাসিধা, ঘরোয়া উপকরণ দিয়েই। স্রেফ চাল এবং গুড়ের সমন্বয়ে তৈরি করতে পারবেন পুখলেইন।

উপকরণ: চালের গুঁড়ো $^{১}/_{২}$ কাপ, গুড় $^{১}/_{৪}$ কাপ, জল পরিমাণমতো, তেল।

প্রণালী: প্রথমে একটা প্যানে জলে দিয়ে তাতে গুড় দিন। গরম করে নিন। গুড় গলে গেলে, মিশ্রণটি ঠান্ডা না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। ঠান্ডা হলে তাতে চালের গুঁড়ো ভাল করে মিশিয়ে নিয়ে একটা নরম তাল বা ডো তৈরি করে, এর থেকে ছোট ছোট লেচি কেটে নিন। লেচি কাটা শেষ হলে সেগুলিকে ভাল করে একটি বাটির পিছন দিয়ে চেপে চেপে চ্যাপটা করে নিন। এরপর কড়াইতে তেল গরম হতে দিন। ফুটন্ত তেলে, লেচির টুকরোগুলিকে মুচমুচে করে ভেজে, গরম গরম পরিবেশন করুন।

আওয়ান বাংগুই

পশ্চিমবঙ্গের মতো ত্রিপুরারও রোজকার খাবারের এক প্রধান উপকরণ চাল বা



কোট পিঠা

ভাত। ভাত দিয়েই তৈরি সেখানকার এক বিখ্যাত মিষ্টি আওয়ান বাংগুই, যার উল্লেখ নাকি পাওয়া যায় প্রাচীন কিছু লোকগাথাতেও। হলুদ পাতার সঙ্গে চালের সুগন্ধের মিশেলে নিঃসন্দেহে এ এক অভিনব রেসিপি।

উপকরণ: ভাত (স্টিকি রাইস) $^{১}/_{৪}$ কাপ,

ভাঙা কাজু বাদাম ৪-৬টা, কিসমিস ১ টেবিল চামচ, ঘি বা মাখন প্রয়োজনমতো, আদা ১ কুচি, কলাপাতা বা হলুদ পাতা কয়েকটা (প্রথাগতভাবে হলুদ পাতা ই ব্যবহৃত হয়)

প্রণালী: চাল সারারাত ভিজিয়ে রেখে, পরের দিন আদা দিয়ে বেটে নিন। এরপর এর সঙ্গে ভিজিয়ে রাখা কিসমিস ও কাজু বাদাম মিশিয়ে নিন। মিশ্রণটি যেন খুব ঘন হয়। এরপর কলাপাতা বা হলুদ পাতায় ঘি বা মাখন লাগিয়ে, পানের খিলির মতো মুড়ে, পুর ভরে, মুখ সুতো দিয়ে বেঁধে স্টিম করুন ১৫ মিনিট। পরিবেশন করুন খাঁটি দুধের সঙ্গে।


চাখাও ক্ষীর

কোট পিঠা

পাকা কলা, চাল, গুড়.... উপকরণগুলি শুনলে নির্ঘাত মনে হবে যে কোনও পুরোহিতের ফলারের আয়োজন চলছে। কিন্তু এই হেন উপকরণ দিয়েই তৈরি হয় নাগাল্যান্ডের অতি জনপ্রিয় মিষ্টান্ন কোট পিঠা।

কে বলে যে পিঠের ক্ষেত্রে পশ্চিম বাংলার একচেটিয়া অধিকার রয়েছে? পাকা কলা, চাল এবং গুড়ের মিতালি, এই পিঠেটি একবার মুখে দিলে তার অপরূপ স্বাদকে উপেক্ষা করা অসম্ভব।

উপকরণ: পাকা কলা ২টো, চালের গুঁড়ো ১/২ কাপ, গুড় ১/৪ কাপ, তেল পরিমাণমতো।

প্রণালী: কলা দুটো ভাল করে চটকে নিন। তারপর একটি বাটিতে গুড়, চালের গুঁড়ো এবং চটকানো কলা মিশিয়ে একটি মিশ্রণ তৈরি করে নিন। সেখান থেকে ছোট ছোট পিঠে গড়ে নিন। এরপর কড়াইতে তেল গরম করে, পিঠেগুলি সোনালি করে ভেজে তুলুন। বাড়তি তেল ঝরিয়ে গরম গরম পরিবেশন করুন।

চাখাও ক্ষীর

ক্ষীর খেতে ভালবাসে না, এমন খাদ্যপ্রেমী খুঁজে পাওয়া মুশকিল! ক্রিমে ভরা দুধ, কিশমিশ, কাজু তো রয়েইছে। মণিপুরের বিখ্যাত চাখাও ক্ষীরের রেসিপিতে উপরি পাওনা ব্ল্যাক রাইস। স্বাদের পাশাপাশি স্বাস্থ্যের জন্যও উপকারী এই চাল। মণিপুরের প্রায় কোনও শুভ অনুষ্ঠানই সম্পন্ন হয় না এই চাখাও ক্ষীর দিয়ে মিষ্টিমুখ ছাড়া।

উপকরণ: ব্ল্যাক রাইস ১ কাপ, ফুল ক্রিম দুধ ৮ কাপ, চিনি ১ কাপ, এলাচ গুঁড়ো ১/২ চা চামচ, কিশমিশ, বাদামকুচি

প্রণালী: চাল ভাল করে ধুয়ে ৪ ঘণ্টা জলে ভিজিয়ে রাখুন। একটি পাত্রে দুধ গরম করুন ঘন হওয়া পর্যন্ত। অন্য একটি পাত্রে চাল সিদ্ধ করে নিয়ে ফুটিয়ে নিন দুধে। এরপর এতে চিনি দিয়ে ফোটান। নামানোর আগে উপরে দিয়ে দিন কিশমিশ। মিশ্রণটি ক্ষীরের মতো দেখতে হবে। এরপর এলাচগুঁড়ো দিন। নানা ধরনের বাদামের কুচিও দিতে পারেন। ঠান্ডা করে পরিবেশন করুন।


মধুরজান থোংবা

মধুরজান থোংবা

মণিপুরের আরও একটি বিখ্যাত মিষ্টি মধুরজান থোংবা। কিছুটা যেন আমাদের রসমালাইয়ের কোনও এক তুতো ভাই!

উপকরণ: ফুল ক্রিম দুধ দেড় কাপ, বেসন ৪ টেবলচামচ, নারকেল কোরা ২ টেবলচামচ, চিনি ২ টেবলচামচ, এলাচ গুঁড়ো ১ চা চামচ, তেজপাতা ১টা, ভাজার জন্য তেল

প্রণালী: একটি পাত্রে দুধ জ্বাল দিয়ে ঘন করে নিন। অন্য একটি পাত্রে বেসন, চিনি ও পরিমাণ মতো জল মিশিয়ে তৈরি করে নিন একটা ঘন ব্যাটার। এবার কড়াইতে তেল গরম করে চামচে করে ব্যাটারটা দিয়ে ভেজে নিন মাঝারি আঁচে। এরপর ঘন দুধে এই বড়া আর সঙ্গে এলাচগুঁড়ো ও নারকেল দিয়ে ফুটিয়ে নামিয়ে নিন। ঠান্ডা ঠান্ডা পরিবেশন করুন।

যোগাযোগ: ৯৮৩১৫১৫৪৮৮
ছবি: শুভদীপ ধর



নেপথ্যের কুশীলব

কেউ পরিচালক, কেউ সিনেমাটোগ্রাফার তো কেউ আবার আর্ট ডিরেক্টর। সকলেই মহিলা। তথাকথিত 'পুরুষ-অধ্যুষিত' ক্ষেত্রে স্বমহিমায় বিরাজমান কলকাতার চার শিল্পীর সঙ্গে কথা বললেন মধুরিমা সিংহ রায়।

পৃথা চক্রবর্তী

প রি চা ল ক

কিছুদিন আগে মুক্তি পেয়েছে 'মুখার্জিদার বউ'। প্রথম সিনেমাতেই প্রশংসিত হয়েছে তাঁর কাজ। তবে পরিচালনা নয়, পৃথা চক্রবর্তীর ইচ্ছে ছিল অন্য। সেই ইচ্ছেপূরণের তাগিদে কলকাতায় এসে সিনেমার প্রেমে পড়ে যান। পৃথা জানালেন, ''রানাঘাটে থাকতাম। ক্লাস টুয়েলভ পর্যন্ত ওখানেই পড়াশোনা করি। ইচ্ছে ছিল গায়িকা হওয়ার! একজন আমাকে পরামর্শ দিয়েছিলেন সেন্ট জেভিয়ার্সে মাস কমিউনিকেশন নিয়ে পড়াশোনা করলে না কি গায়িকা হওয়া যায়! যদিও পরে বুঝতে পারি যে এই দু'য়ের মধ্যে কোনও যোগাযোগ নেই। তবে ওখানেই ওয়র্ল্ড সিনেমার সঙ্গে প্রথম আলাপ। ফিল্ম এডিটিংয়ের প্রতি আমার ভালবাসার সূত্রপাতও তখনই। ২০০৮ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাস কমিউনিকেশন বিভাগে প্রথম হয়ে



কাজের ফাঁকে পৃথা চক্রবর্তী

এখানে এডিটরদের যা পারিশ্রমিক দেওয়া হয়, তা দিয়ে ভদ্রভাবে জীবনযাপন করা খুবই কঠিন! তাই, ভাল উপার্জন করার জন্য আমায় প্রচুর কাজ করতে হচ্ছিল। ধীরে ধীরে ক্রাফটের প্রতি ভালবাসাটাই চলে যাচ্ছিল।

এসআরএফটিআই-তে এডিটিংয়ে যোগ দিই।" শর্ট ফিল্মের পাশাপাশি ২০১৪ নাগাদ দু'টো ফিচার ছবিও এডিট করেন পৃথা—'বোধন' আর 'আমার আমি'। হঠাৎ এডিটিং থেকে পরিচালনায় চলে এলেন কেন? তাঁর কথায়, "আমাদের এখানে এডিটরদের যা পারিশ্রমিক দেওয়া হয়, তা দিয়ে ভদ্রভাবে জীবনযাপন করা খুবই কঠিন! ভাল উপার্জন করার জন্য আমায় প্রচুর কাজ করতে হচ্ছিল। ধীরে ধীরে ক্রাফটের প্রতি ভালবাসাটাই চলে যাচ্ছিল। এডিটিং ও পরিচালনা দু'টোই গল্প বলার দু'রকম ধরন। পরিচালনার প্রতি ভালবাসা বরাবরই ছিল। 'সাইলেন্ট ভয়েসেস' নামে একটা ডকুমেন্টারি বানাই, বিয়ের পর মেয়েদের আইডেন্টিটি ক্রাইসিস নিয়ে। তারপর সিদ্ধান্ত নিই একমাত্র নিজের ছবিই এডিট করব।" ২০১৭ সালে মাদার্স ডে ও ফাদার্স ডে উপলক্ষে দু'টি শর্ট ফিল্ম বানান। সেগুলো দেখে শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রস্তাব দেন ফিচার ফিল্ম পরিচালনার। "দর্শকরা 'মুখার্জিদার বউ'-এর চরিত্রগুলোর সঙ্গে, ওঁদের জগতের সঙ্গে রিলেট করতে পারছেন। আমার শর্ট ফিল্মে একটা লাইন ছিল, 'সারা





মুখার্জিদার বউ-এর সেটে

জীবন তো গৌতমদার বউ হয়েই থেকে গেলাম। আমাকে আর কেউ মনে রাখল না।' শিবুদা ঠিক ওই জায়গাটা থেকেই একটা গল্প বলতে চেয়েছিলেন। নন্দিতাদি প্রথম থেকে অভিভাবকের মতো পাশে ছিলেন," জানালেন তিনি। তিনি যে একজন 'মহিলা' পরিচালক, এই বিষয়টিও একেবারেই বুঝতে দেননি শিবপ্রসাদ-নন্দিতা। "শিবুদা একদিন বললেন, পৃথা ঘণ্টা পড়ে গেছে। খাতা জমা দিয়ে দাও। মানে রিলিজ় ডেট ফাইনাল হয়ে গেছে। এরপরের একটা সপ্তাহ জাস্ট এনজয়। প্রযোজক যখন পরিচালককে আত্মবিশ্বাস জোগান, তখন আর কিছু চাওয়ার থাকে না," জানালেন পৃথা। তবে তিনি স্বীকার করলেন যে ইন্ডাস্ট্রিতে বৈষম্য রয়েছে। বললেন, "আমার পাশে কোনও পুরুষ সিনেমাটোগ্রাফার দাঁড়িয়ে থাকলে বাকিরা ধরে নেন তিনিই বোধহয় পরিচালক। মহিলার ইনস্ট্রাকশন মেনে চলতে সেটে অনেকেরই অসুবিধে হয়।" মেয়ের সাফল্যে খুশি পরিবারও। এখন তাঁর বাবা যাবতীয় ইন্টারভিউয়ের পেপার কাটিং জমিয়ে রাখেন! শিবু-নন্দিতার সঙ্গে এরপরেও কাজের কথা চলছে। সঙ্গে চলছে বিজ্ঞাপন আর ডকুমেন্টারির কাজও।


'মাটি'র সেটে লীনা গঙ্গোপাধ্যায়



লীনা গঙ্গোপাধ্যায়

স্ক্রিনরাইটার-পরিচালক

বাংলা টেলিভিশনে সুবিশাল আধিপত্য তাঁর। তাঁরই হাত থেকে বেরিয়েছে একের পর এক মেগাসিরিয়াল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা টিভির পর্দায় বুঁদ হয়ে থেকেছেন দর্শকরা। নিজস্ব প্রডাকশন হাউজ়ও খুলেছেন। নিজে পরিচালনাও করেন। এত কিছু একসঙ্গে দক্ষতার সঙ্গে সামলান লীনা গঙ্গোপাধ্যায়। তবে এত কিছু করবেন, কখনওই ভাবেননি তিনি। ''আমার জীবনে কখনও কোনও কেরিয়ার প্ল্যানই ছিল না। যা হয়েছে সব বাই ডিফল্ট হয়েছে। কোনওদিন ভাবিনি যে কলেজে পড়াব। চাকরি দরকার ছিল। পরীক্ষা দিলাম। হয়ে গেল। এটুকুই। তবে ছোট থেকেই লেখালেখি করতাম। ছোট্টবেলা থেকে রেডিও স্টেশনে যেতাম। স্কুল ম্যাগাজ়িনে লিখতাম। তবে বাড়িতে কেউ কোনওদিন লেখেনি। তবে পরে জেনেছিলাম যে আমার মা লিখতেন। তাঁর একটা গল্পের খাতাও পাওয়া গিয়েছিল,'' বললেন লীনা। জীবন যেদিকে নিয়ে গিয়েছে সেদিকেই হেঁটে গেছেন তিনি। সিনেমায় প্রথম কাজ 'ভাল থেকো'। তার আগে টেলিভিশনে টুকটাক কাজ করেছেন। ''শুধু পড়াতাম না। রাজাবাজারের কাছে যেখানে আমি থাকতাম, সেখানে প্রায় ৩০০ বাচ্চাকে স্কুলে ভর্তি করার দায়িত্বও নিয়েছিলাম। এসবের ফাঁকেই স্ক্রিপ্ট লিখতাম। প্রথম ধারাবাহিক ছিল 'সোনার হরিণ'। মজার ব্যাপার হল, প্রায় ৪৫০ এপিসোড অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পর আমি দায়িত্ব নিই! তারপর ১৯০০ এপিসোড পর্যন্ত চলে। ওটাই আমার প্রথম টেলিভিশনের কাজ। তবে আমি কখনও সিরিয়াল দেখিনি তার আগে। কখনও দেখব বলেও ভাবিনি,'' অবাক করলেন লীনা। ''তখন মনে হত, সিরিয়াল দেখব কেন! বাড়িতে চললেও বন্ধ করে দিতাম। অসহ্য লাগত। কলেজে পড়ার সময়ে একটি সিরিয়াল হত, শব্দটা শুনলেই রাগ হয়ে যেত,'' হাসতে হাসতে জানালেন তিনি। সিনেমায় লেখাটা হয়েছিল আকস্মিকভাবে। তখনও ভাবেননি এটা নিয়েই এগোবেন। তারপর অসংখ্য সিরিয়াল লিখেছেন। ছবিও পরিচালনা করেছেন। ''আসলে এখন এটা না করলে আর খেতে পারব না। এটাই রুটি-রুজি। কলেজের চাকরিটা ছেড়ে দিয়েছি তো,'' লীনার সাফ উত্তর। তবে এখনও কাজের বাইরে সিরিয়াল দেখেন না। কাজের সূত্রে প্রথম কয়েকটা পর্ব দেখতেই হয়।

কিন্তু একবার ধারাবাহিকটি দাঁড়িয়ে গেলে, আর দেখেন না। বরং, তাঁর অবসরের সঙ্গী বই। বই পড়া ছাড়া ভালবাসেন বেড়াতে। তবে কাজ ছাড়া বিশেষ বেড়ানো হয় না। ''আসলে আমার পরিবারও তো কাজের সঙ্গেই জড়িয়ে। তাই অনেকসময়ই কাজের সূত্রে বেড়াতে গেলেও, তা ফ্যামিলি টুরই হয়ে যায়। আমার ছেলে পরিচালনা করেন। বেঙ্গালুরুতে চাকরি করত। ইঞ্জিনিয়ারিং ও এমবিএ পড়েছে। কিন্তু তারপর চাকরি ছেড়ে চলে এল সিনেমা বানাতে। আমার ছেলের বউও অভিনয় করে। তাই, কোথাও গেলেও মনে হয়, পরিবারের সঙ্গেই আছি,'' বললেন তিনি। অনেকেই অভিযোগ করেন সিরিয়ালের গল্পগুলো একঘেয়ে। দীর্ঘদিন ধরে একই বস্তাপচা গল্প টেনে নিয়ে যেতে হয়। সেক্ষেত্রে কোথাও কি সৃজনশীলতা একটু হলেও কম্প্রোমাইজড হয়? উত্তরে বললেন, ''যখন টেলিভিশনের জন্য লিখি, তখন সবসময় মাথায় রাখতে হয় দর্শকদের চাহিদার কথা। আমি কী জানি ও কতটা জানি, সেটা জাহির করার জায়গা টেলিভিশন নয়। অনেক একলা মানুষের কাছে টেলিভিশন এখন পরিবারের সদস্যের মতো। তাঁরা টেলিভিশনের চরিত্রগুলোকে

> যখন টেলিভিশনের জন্য লিখি, তখন মাথায় রাখতে হয় দর্শকদের চাহিদার কথা। অনেক একলা মানুষের কাছে টেলিভিশন এখন পরিবারের সদস্যের মতো। তাঁরা ওই চরিত্রগুলো নিয়ে বাঁচেন।

নিয়েই বাঁচেন। এরকম অনেক মানুষের মেসেজ আমার কাছে পৌঁছয়। এটা অন্যরকমের তৃপ্তি। আর প্রযোজনা সংস্থা যেহেতু আমারই, সেখানে তাদের চাহিদা মানে আমারই চাহিদা। তবে বাকিদের ক্ষেত্রে সাধারণভাবে বলতে পারি, অনেকসময় টিআরপি না উঠলে চ্যানেলের গাইডলাইন অনুযায়ী প্রজেক্টটি 'বাঁচাতে' হয়। চ্যানেল কিন্তু অনেকসময়ই সঠিকভাবে গাইড করে।'' লীনার লেখা প্রায় সব চরিত্রই তাঁর খুব চেনা। তাঁর জীবনে নানা সময়ে যেসব চরিত্র তিনি দেখেন, সেগুলোই উঠে আসে তাঁর কলমে। 'ইস্টিকুটুম'-এর অচিন্ত্যান চরিত্রটির অনুপ্রেরণাও কিন্তু বাস্তব থেকেই উঠে আসা। এক কবি বন্ধুর চরিত্র থেকে লীনা খুঁজে পেয়েছিলেন পরদার



শুটিংয়ের ফাঁকে



সৃজনশীল অবসরযাপন

অচিন্ত্যানকে। গল্পের সূত্রে হয়তো অনেক কিছু লিখতে হয়। কিন্তু তাঁর লেখার মূল সুর উঠে আসে তাঁরই চেনা মানুষদের থেকে। মানুষকে অবজার্ভ করতে ভালবাসেন তিনি। ঠিক এই কারণেই অলৌকিক কোনও স্ক্রিপ্ট তিনি লিখতে পারেন না। আগামী দিনে অতনু রায়চৌধুরীর 'সাঁঝবাতি' পরিচালনা করছেন। নিজেদের (তাঁর ও শৈবাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের) প্রোডাকশনের সিনেমাও আছে। সেই ছবির প্রায় ৮০ শতাংশ শুটই হবে বিদেশে। প্রবাসী জীবন নিয়েই গল্প। একজন মেয়ে বিয়ে করে বিদেশে চলে যাওয়ার পর তাঁর জীবনটা কোন খাতে চলে, তা নিয়েই গল্প। টিভি, সিনেমা, লেখালেখি, পরিচালনা... সবমিলিয়ে আপাতত তাই বেজায় ব্যস্ত লীনা গঙ্গোপাধ্যায়।



শুটিংয়ের ফাঁকে নাফিসা



নাফিসা মণ্ডল
আর্ট ডিরেক্টর

প্রায় পনেরো বছর কাটিয়ে ফেলেছেন ইন্ডাস্ট্রিতে। টিভি, সিনেমা, বিজ্ঞাপন, ওয়েব সিরিজ়...শিল্প নির্দেশক নাফিসা মণ্ডলের কাজের পরিধি সুবিস্তৃত। চেয়েছিলেন ছবি আঁকতে। শুরুর দিকের কথা প্রসঙ্গে তিনি জানালেন, ''আর্ট কলেজে পড়াশোনা করেছি। ইচ্ছে ছিল পেন্টার হওয়ার। আমার কাকা এসআরএফটিআই-তে পড়াতেন। কাকার উৎসাহে এসআরএফটিআই-তে ছোট ছোট কয়েকটি প্রজেক্টে কাজ করতে শুরু করি। সেই সময়েই পরিচয় হয় ইন্দ্রনীল ঘোষের সঙ্গে। ওঁর হাত ধরেই টালিগঞ্জে আসি। আর্ট কলেজে ছবি আঁকতেই আঁকতেই পার্ট টাইম এই কাজটা করতাম। এটা আমি ২০০৫ সালের কথা বলছি।'' প্রথমে সহকারী শিল্প নির্দেশক হিসেবে শুরু। তারপর একাই গোটা দায়িত্ব সামলাতেন। ''আর্ট ডিরেক্টর হিসেবে টলিউডে প্রথম কাজ মৈনাক ভৌমিকের 'টেক ওয়ান'। ইন্দ্রনীলদা (ঘোষ), কৌশিকদা (বারিক)-কে অ্যাসিস্ট করতাম। তখন অরিন্দম শীল একদিন বললেন, 'তুই তো একাই সব করতে পারিস, তাহলে করছিস না কেন?' উনিই প্রথম সুযোগ দেন। 'টেক ওয়ান', 'হৃদমাঝারে'-র পরে আরও তিন-চারটে ছবি করি, যেগুলো কোনওদিন মুক্তি পায়নি,'' সামান্য আক্ষেপের সুর তাঁর গলায়। নিজের পছন্দের কাজের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করায় প্রথমেই বললেন 'এবার শবর'-এর কথা। নিজের সৃজনশীল সত্তার পুরোপুরি সদ্ব্যবহার করতে পেরেছিলেন তিনি। ''সৃজিত মুখোপাধ্যায়ের 'জুলফিকার' যেমন করেছি, তেমনই রবি কিনাগির আদ্যোপান্ত বাণিজ্যিক ছবি 'আমি যে কে তোমার'-ও করেছি। 'গুগলি', 'আহা রে', 'টেকো' (এখনও মুক্তি পায়নি)-তেও আমারই শিল্প নির্দেশনা। প্রায় ২৫টার উপরে ফিচার ফিল্মে কাজ হয়ে গেছে,'' উচ্ছ্বসিত শোনায় তাঁর গলা। শুধু ফিচার নয়, মেগাসিরিয়ালেও চুটিয়ে কাজ করেছেন নাফিসা। 'দ্বীপ জেলে যাই', 'কে আপন কে পর', 'প্রতিদান', 'জয়ী', 'কৃষ্ণকলি', 'জাঁহানারা', 'ত্রিনয়নী'..এক নিঃশ্বাসে অন্তত ১০-১২টা ধারাবাহিকের নাম বলে গেলেন তিনি। বিজ্ঞাপন, ওয়েব সিরিজ়, সিনেমা, সিরিয়াল—আলাদা আলাদা মাধ্যমে কাজ করতে গিয়ে কোনও তফাত বুঝেছেন? উত্তরে তিনি জানালেন, ''তফাতটা হয় বাজেটের অঙ্কে। তবে বাজেট কম বলে তো আর কাজের সঙ্গে কম্প্রোমাইজ় করতে পারব না!'' যে কোনও প্রজেক্টের শুরুতেই তিনি ভাল করে গল্পটা শোনেন। প্রতিটা চরিত্রের বিবরণ জেনে নেন। সেইমতো পরিকল্পনা চলে। ডিওপি-র সঙ্গে

বসে ঘরের দেওয়াল, আসবাব, পরদার কালার প্যালেট নিয়েও আলোচনা চলে। ইন্ডাস্ট্রিতে 'মহিলা' ও 'পুরুষ' আর্ট ডিরেক্টরের বিভাজন বিশেষ টের পাননি তিনি। ''আমার প্রায় সব সহকর্মী খুব সাহায্য করেছেন। একবার এনটি ওয়ান-এ কাজ করছিলাম। কৌশিকদা দেখতে চলে গিয়েছিলেন। পরিবারেরও সমর্থন পেয়েছি। ছেলের বয়স সাড়ে তিন। ও আমার সঙ্গে সেটে আসে। স্বামী মৃন্ময় পেশায় ডিরেক্টর অফ ফোটোগ্রাফি। আর্ট কলেজ থেকে একসঙ্গে আছি। কালার কম্বিনেশন, লাইটের টেম্পারেচার, ক্যামেরা অ্যাঙ্গল...সবকিছু বুঝিয়েছে হাতে ধরে। ওর জন্যই নানা দেশের সিনেমা দেখতে পাই,'' বলে থামলেন তিনি।

ইন্দ্রনীলদা (ঘোষ), কৌশিকদা (বারিক)-কে অ্যাসিস্ট করতাম। তখন অরিন্দম শীল একদিন বললেন, 'তুই তো একাই সব করতে পারিস, তাহলে করছিস না কেন?' উনিই প্রথম সুযোগ দেন।


কাজ নিয়ে গভীর আলোচনায়


ক্যামেরার কাজ সামলাচ্ছেন সুদেষ্ণা

সুদেষ্ণা গোস্বামী
সি নে মা টো গ্রা ফা র

সিনেমার সঙ্গে খুব কম বয়স থেকেই যোগাযোগ সুদেষ্ণা গোস্বামীর। কনভেন্ট মিশনারি স্কুলে পড়াশোনা করেছেন। পিওর সায়েন্সের ছাত্রী ছিলেন। পড়াশোনার সঙ্গেই সিনেমায় হাত পাকানো শুরু করেন। তার মূল কৃতিত্ব তিনি দিতে চান একজনকে। ''স্কুল শেষ করেই আমি গৌতম ঘোষের সঙ্গে কাজ করতে শুরু করি, সহকারী পরিচালক হিসেবে। তখন খুব কম বয়স। সেই সময় থেকেই সিনেমার সঙ্গে জড়িয়ে পড়লাম। ডিওপি হিসেবে অনেক পরে কাজ করি,'' সিনেমায় তাঁর হাতেখড়ি প্রসঙ্গে জানালেন তিনি। সিনেমাটোগ্রাফিতে তাঁর শিক্ষাগুরু সৌমেন্দু রায়। নিজে কয়েকটা শর্ট ফিল্ম পরিচালনা করেছেন। সেখানে ক্যামেরার কাজও তাঁর নিজেরই ছিল। কিন্তু পাকাপাকাভাবে ক্যামেরায় শিফট করার সিদ্ধান্ত নিলেন কেন? ''আসলে সিনেমাটোগ্রাফারও তো ক্যামেরার মাধ্যমে গল্প বলেন। পরিচালকের ভাবনাকে ফুটিয়ে তুলতে ৯০ শতাংশ সহায়তা করে আমার লাইটিং, লেন্সের ব্যবহার, কম্পোজিশন ইত্যাদি। স্টোরি টেলিংয়ের জন্য সিনেমাটোগ্রাফি খুব প্রয়োজন,''

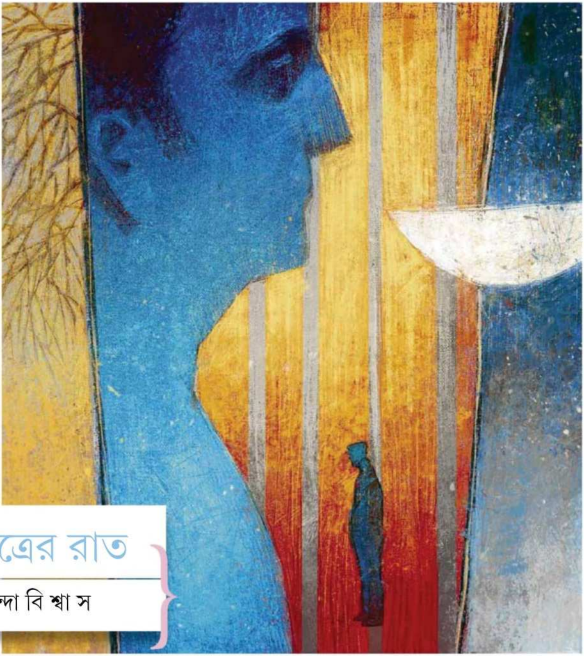


সহকর্মীদের সঙ্গে

মত তাঁর। 'মনের মানুষ' শুটিং শেষ হওয়ার পরপরই গৌতম ঘোষের সঙ্গে কাজ করতে শুরু করেন। স্বাধীনভাবে কাজ শুরু করেন একটি হিন্দি ফিচার দিয়ে। ওনিরের 'আই অ্যাম'-এ তিনি সহকারী সিনেমাটোগ্রাফার ছিলেন। তারপর বাংলায় শর্ট ফিল্ম ও ফিচার, দু'টোই করেছেন তিনি। তবে কাজের ক্ষেত্রে একাধিকবার বৈষম্যের মুখোমুখি হয়েছেন তিনি। নিজেই জানালেন, ''যদি জিজ্ঞেস করেন ২০১৯ সালে দাঁড়িয়েও মহিলা হিসেবে কোনও চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হয়েছে কি না, তাহলে বলব অবশ্যই হয়েছে। এটা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলছি। মুম্বইতে হয়তো তুলনায় অনেক কম। কিন্তু কলকাতায় এই অসাম্য প্রকট। সিনেমাটোগ্রাফি এমনিতেই পরিশ্রমসাপেক্ষ কাজ। একজন মহিলা হয়ে আমি সেই কাজ করছি, লোকে এখনও এটা পুরোপুরি বিশ্বাস করে উঠতে পারে না। অনেকেই প্রশ্ন করেন, 'ও তো মেয়ে। ও কি পারবে?' প্রযোজকের কাছ থেকেও এরকম প্রশ্ন আসে। প্রতিভার বিচার এক্ষেত্রে অনেক পরে হয়। মেয়ে বলে প্রথমেই একটা

অনেকসময় পুরো ইউনিটে একমাত্র আমিই মেয়ে। আমার ইনস্ট্রাকশন ফলো করতে অনেকেরই অস্বস্তি হয়েছে। স্পষ্ট বুঝতে পেরেছি, তাঁদের মেল ইগো যথেষ্ট আহত হয়েছে। পারিশ্রমিকেও তফাত হয়।

ধাক্কা খেতে হয়। অনেকসময় এমনও হয়েছে যে, পুরো ইউনিটে একমাত্র আমিই মেয়ে। আমার ইনস্ট্রাকশন ফলো করতে অনেকেরই অস্বস্তি হয়েছে। স্পষ্ট বুঝতে পেরেছি, তাঁদের মেল ইগো যথেষ্ট আহত হয়েছে। পারিশ্রমিকেও তফাত আছে। অনেকসময়েই প্রযোজকরা মনে করেন তাঁরা আমাদের দয়া করে পারিশ্রমিক দিচ্ছেন। মেয়েরা ছেলেদের বিকল্প হয়ে উঠতে পারে, সমানতালে ক্যামেরা কাঁধে নিয়ে কাজ করতে পারে...এটা মেনে নিতে অনেকের অসুবিধে হয়। সেজন্যই ফিল্ম স্কুল থেকে পড়াশোনা করা সত্ত্বেও অনেক মহিলাই শেষমেশ সিনেমাটোগ্রাফার হয়ে থাকতে চান না। কেউ চ্যানেলে ঢুকে যান। কেউ হয়তো এডিটিংয়ে চলে যান।'' গত বছর মহুয়া চক্রবর্তীর 'আমার ভয়'-তে কাজ করেছেন তিনি। ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তর প্রডাকশন হাউজে তৈরি সিনেমাটিতে কোর ইউনিটের প্রায় সকলেই মহিলা। তাই কাজ করতেও সুবিধে হয়েছে তাঁর। এছাড়া শ্রীলেখা মিত্রর 'দ্য গিফট'-সহ একাধিক শর্ট ফিল্মে কাজ করে ফেলেছেন। কাজের ব্যাপারে পরিবারের সমর্থন পেয়েছেন। ''যেহেতু আমি একমাত্র সন্তান, তাই স্বাধীনতা যতটা পেয়েছি, দায়িত্বও ততটাই বেশি। মা-বাবা ভীষণ লিবারেল। তবে আত্মীয়স্বজনরা ভাবেন, এ ধরনের কাজের তুলনায় কোনও 'নিরাপদ' পেশায় গেলে ভাল হত,'' বলে থামলেন তিনি।



নক্ষত্রের রাত

ছন্দা বিশ্বাস

সংশোধনাগার থেকে ধীর পায়ে বেরিয়ে এলেন জেল সুপারিন্টেন্ডেন্ট মি. ধ্রুবজ্যোতি সেন। পিছনের পাঁচিল বরাবর কংক্রিটের রাস্তা ধরে হাঁটতে লাগলেন তিনি। সংশোধনাগার থেকে তাঁর বাংলো বড়জোর দুই কী তিন মিনিটের পথ। সূর্য ডোবার আগেই এ সময়ে এ পথে আঁধার ঘনিয়ে আসে। দেড়তলা সমান উঁচু জেলের পাঁচিল পশ্চিম আকাশটাকে আড়াল করে রাখে সেটাই একমাত্র কারণ নয়, রাস্তার ডানদিক ধরে পরপর বেশ কিছু জারুল, বকুল, অমলতাস, কৃষ্ণচূড়া আর অশোক ফুলগাছের শাখা-পল্লব রাস্তার বেশ কিছুটা অংশ জুড়ে শামিয়ানা টাঙ্গিয়ে রেখেছে। বসন্তের এই মাতাল সমীরণে ফুলের ভারে আনত শাখাগুলো দুলছে। দেশজ পাখিরা এখন সেখানে দখলদারি নিয়ে দারুণ গোল বাধিয়েছে। অন্যদিন হলে মি. সেন গোধূলিবেলার এই মনোরম পরিবেশটা দারুণভাবে উপভোগ করতেন। কিন্তু আজ তাঁর মনটা নানা কারণে বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে।

কিছুটা পথ যাওয়ার পরেই ডানদিকে একটা রিজ়ার্ভার। শহরের জল সরবরাহ হয় এখান থেকে। নানান গাছগাছালির জন্য জায়গাটা বেশ ঠান্ডা। এই জায়গাটাও প্রচুর পাখির আবাসস্থল। প্রখর গ্রীষ্মে ক্লান্ত পথচারীরা এখানে দু'দণ্ড বসে একটু জিরিয়ে নেয়। একটা লম্বা পাইপ দিয়ে দিনের অধিকাংশ সময়ে জল পড়ে। রিকশাওয়ালা এবং কিছু দিনমজুর শ্রেণির লোকেরা বিকেলের দিকে এখানে স্নান করে শরীর জুড়োয়। রিজ়ার্ভারটা ছাড়ালেই জেলখানার বিশাল উঁচু ওয়াচটাওয়ারটা নজরে পড়ে। ওয়াচটাওয়ারটা এমনভাবে তৈরি যাতে পুরো জেলখানাটার প্রতিটি কক্ষ, বিশাল চত্বর এবং আশপাশ ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করা যায়। ওয়াচটাওয়ারটার কাছে আসতেই বৃদ্ধ লোকটাকে দেখতে পেলেন মি. সেন। লক্ষ করে দেখলেন বৃদ্ধের শরীরটা সামনের দিকে প্রায় নাইন্টি ডিগ্রি ঝুঁকে পড়েছে। যতটা না বয়সের ভার, তার চাইতে অনেক গুণ বেশি তাঁর শোকের ভার। একেবারে মাটির দিকে তাকিয়ে হাঁটছেন তিনি। দেখে

মনে হচ্ছে রাস্তার উপরে অবিন্যস্তভাবে পড়ে থাকা প্রতিটা ফুল-পাতা-পাপড়ির অক্ষরমালা তিনি গভীর মন দিয়ে নিরীক্ষণ করছেন।
মানুষটাকে দেখার পর মি. সেন কেমন যেন বিব্রতবোধ করলেন। মনে হল, দেখা না হলেই বুঝি ভাল হত। কিন্তু এই মুহূর্তে ডানে-বাঁয়ে বিকল্প কোনও পথ নেই যেটা ধরে তিনি এগিয়ে যেতে পারেন। তাঁদের দু'জনের মধ্যেকার দূরত্ব যত কমে আসছে। মি. সেনের বুকের ভিতরের সেই অস্বস্তিটা ক্রমশ প্রকটতর হচ্ছে। তিনি তাঁর হাটার গতি পূর্বাপেক্ষা কমিয়ে দিয়ে মনে মনে ভাবছেন, এইভাবে নিঃশব্দে চুপিচুপি লোকটাকে পাশ কাটিয়ে চলে যেতে পারলে বুঝি এ যাত্রায় রক্ষা পাওয়া যাবে। বৃদ্ধ লোকটার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎকারের কথাগুলো আবার তাঁর মনে পড়ে গেল। খুব বেশিদিনের কথা তো নয়।

১

প্রতিদিনের মতো সেদিনও বাংলোর সামনে আসতেই সিকিওরিটি বীরেশ বাশফোড় প্রথামাফিক স্যালুট দিয়ে গেটটা খুলে একপাশে সরে দাঁড়াল। মি. সেন লাল মোরাম বিছানো পথ ধরে এগিয়ে গেলেন। বাংলোর সামনে সুদৃশ্য ফুলের বাগান। তাতে নানান মরসুমি ফুল গাছ লাগানো হয়েছে। বাংলোতে ঢোকার সরু রাস্তার দু'পাশে ছোট ছোট ঝাউ গাছ নিপুণভাবে ছাঁটা। বিভিন্ন প্রজাতির জবা, বোগেনভেলিয়া, মুসন্ডা, কামিনি, টগর গাছে ফুল ফুটে আছে। বাংলোর বহু পুরনো কালের বিশাল মোটা মোটা থামে সবুজ মানিপ্ল্যান্ট পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে উপরের দিকে উঠে গিয়েছে। মালি ছেলেটা ঝারিতে করে গাছের গোড়ায় জল দিচ্ছিল। সকাল-বিকাল দু'বেলা ওই বাগান পরিচর্যা করে এবং গাছেদের সংসার গুছিয়ে দেয়। সকালে এসে বাংলো ধোয়ামোছা করে। ম্যাডামের ফাইফরমাশ খাটে। এই যেমন, লন্ড্রিতে কাপড়চোপড় দেওয়ানেওয়া, ছেলেকে স্কুলবাসে তুলে দেওয়া, টুকিটাকি বাজারহাট করা—ইত্যাদি হরেক রকমের কাজ করতে হয় তাকে। মি. সেনকে আসতে দেখে নিজের কাজ রেখে মংলু হাত-পা ধুয়ে সাফসুতরো হয়ে নিল।
মি. সেন ঘরে ঢুকে ফ্যানটা চালিয়ে সোফার উপরে ঘাড় এলিয়ে দিয়ে বসে পড়লেন। অন্যদিন ড্রেস ছেড়ে তোয়ালে জড়িয়ে হাত-মুখ ধুয়ে ফ্রেশ হয়ে তারপর সোফায় এসে বসেন। এটাই তাঁর রুটিন। কিন্তু আজ তাঁর কিছুতেই মন লাগছে না। মংলু ঝারিটা বাগানের এককোণে রেখে দরজার কাছে এসে বললো, "একটু চায়ের জল চাপাই, সাব?"
মি. সেন ঘাড় কাত করে সম্মতি জানালে মংলু কিচেনে ঢোকে। মিনিট পাঁচেকের ভিতরে এক কাপ লিকার টি আর কিছু বিস্কিট ট্রেতে সাজিয়ে সাহেবের সামনে রেখে পরবর্তী আদেশের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকে।
মি. সেন চায়ের কাপে এক সিপ টেনে বললেন,"আমার আর কিছু লাগবে না। তুমি যে কাজ করছিলে তাই করো। কোনও কিছু দরকার হলে তোমায় ডেকে নেব।"
"জি সাব", বলে মংলু বাগানের দিকে পা বাড়ায়।
আজ সাহেবকে বেশ অন্যমনস্ক লাগল মংলুর। কী যেন ভাবছেন তিনি। সে তো ভাববারই কথা। সারাটা দিন চোর-ডাকাত, খুনি, বদমায়েশদের নিয়ে কাটাতে হয়। এদের সামলানো কী কম ঝক্কি! মেজাজ তো তিরিক্ষি হবেই। শালারা সব মস্তানি মারবে, চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, রাহাজানি, মেয়েবাজি, তোলাবাজি, রেপ, খুন— যত্তসব দুষ্কর্ম করে এখানে এসে ঢুকবে আর তাদেরকেই আবার জামাই আদরে রাখতে হবে। পান থেকে একটু চুন খসলেই হল। আর রক্ষে নেই। সব শালার মামারা তখন চেপে ধরবে। নেতা, মন্ত্রী, আমলারা ফোনে ফোনে জীবনটার একেবারে ঘন্ট রেঁধে ছাড়বে। ভাড়াটে গুণ্ডারা জেলে এসেও শালা মস্তানি মারবে। জেলের ভাত খাবে আর এখানে বসেই ব্লু প্রিন্ট বানাবে— এরপরে বের হয়ে কাকে সাল্টানো যায়। কথায় বলে না, খালি দিমাগ শয়তান কী কার-ই-শালা (কার্যশালা) হ্যায়!
কাজ করতে করতে নিজের মনে কথাগুলো বলে মংলু।

মি. সেন চোখ তুলে তাকালেন। মাথায় উসকোখুসকো পাকা চুল। অসংখ্য জ্যামিতিক রেখাঙ্কিত শুষ্ক মুখাবয়ব।



বিকেল গড়িয়ে সন্ধে হব হব করছে, এমন সময়ে বীরেশ এসে জানাল, "স্যর, একজন বয়স্ক লোক আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়।"
"পাঠিয়ে দাও", বলে মি. সেন পেপারটাতে চোখ বোলাতে লাগলেন।
"আসব স্যর?"
মি. সেন চোখ তুলে তাকালেন। মাথায় উসকোখুসকো পাকা চুল। অসংখ্য জ্যামিতিক রেখাঙ্কিত শুষ্ক মুখাবয়ব। মলিন ধুতি আর ধূসর রঙের পাঞ্জাবি পরা একজন সত্তোরোর্দ্ধ বৃদ্ধ তাঁর দরজার সামনে দাড়িয়ে আছেন। দেখে মনে হচ্ছে ভীষণ ক্লান্ত এবং পরিশ্রান্ত তিনি।
মি. সেন তাঁকে ভিতরে আসতে বলায় তিনি ঘরের ভিতরে দু'পা ঢুকে মেঝের উপরে বসে পড়লেন।
মি. সেন "কী করছেন কী, ওখানে নয়, এখানে বসুন", বলে একটা চেয়ার দেখিয়ে সেখানে বসতে বললেন।
তারপর বৃদ্ধের মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করেন,"আপনাকে তো ঠিক চিনতে পারছি না?"
বৃদ্ধ বললেন, "আপনার কাছে কী বলে যে আমার পরিচয় দেই, আপনি তো এখানকার সুপারসাহেব, তাই না?"
"হুম, কেন বলুন তো?"
কথাটা শোনামাত্র বৃদ্ধ চেয়ার ছেড়ে উঠে এগিয়ে এলেন এবং মি. সেনের হাত ধরে কেঁদে ফেললেন।
মি. সেন অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন বৃদ্ধের মুখের দিকে। বৃদ্ধ কাঁদতে কাঁদতে বললেন,"আপনি পারেন স্যর আমার ছেলেকে বাঁচাতে।।"
বৃদ্ধের হাত দুটো দিয়ে তখনও ধরা ছিল তাঁর হাত। মি. সেন লক্ষ করলেন, কী ব্যাকুল জিজ্ঞাসা, কী কাতর নিবেদন এই অসহায় মানুষটার মুখের অভিব্যক্তিতে।
মি. সেন একটু অপ্রস্তুত হয়ে বললেন,"দেখুন, আমি না কিছু বুঝতে পারছি না, কে আপনার ছেলে? আপনি কার কথা বলছেন?"
বৃদ্ধ কাঁপতে কাঁপতে বললেন, "আমি নিলু মানে নিলয় সমাদ্দারের বাবা। ওকে আপনি বাঁচান, স্যর। আমাদের কাছে খবর আছে ওর বিপক্ষের কয়েকজন নাকি জেলে ঢুকেছে ওকে মারার জন্যে। স্যর, আমি অনেক আশা নিয়ে বহুদূর থেকে এসেছি শুধু

আপনার সঙ্গে দেখা করার জন্যে। কামাখ্যাগুড়ি থেকে আরও ত্রিশ কিলোমিটার ভিতরে আমার বাড়ি। স্টেশন থেকে পাক্কা এক ঘণ্টা লাগে অটোতে। তারপরের পাঁচ মাইল সাইকেলে নয়তো পায়ে হেঁটে যেতে হয়। মাঠের ভিতর দিয়ে চলে গিয়েছে মাটির রাস্তা। সেখানে আর কিছুই চলে না। প্রথম ট্রেনটা ধরব বলে রাত থাকতে বেরিয়ে পড়েছি স্যর। জানি ওই ভোর রাতে সাইকেলভ্যান পাব না। তাই হাঁটতে থাকি, যদি ভাগ্য ভাল থাকে তো, পাকা রাস্তায় এসে নিশ্চয়ই কিছু পেয়ে যাব।"
কথাগুলো বলছেন আর থরথর করে কাঁপছেন তিনি।
"কামাখ্যাগুড়ি থেকে আরও ত্রিশ কিলোমিটার ভিতরে? সে তো অনেক দূর? এই বয়সে আপনি একা এই ছয়-সাত ঘণ্টার পথ কী করে এলেন?"
কথাটা বলতে বলতে মি. সেন ওঁকে ধরে চেয়ারে বসিয়ে ঘরের ভিতরে ঢুকে গেলেন। তারপর এক গ্লাস জল আর প্লেটে কিছু মিষ্টি এনে বললেন, "দেখে মনে হচ্ছে আপনি ভীষণ তৃষ্ণার্ত। এই জলটুকু খান, তারপর আপনার সব কথা শুনছি।"
বৃদ্ধ কম্পিত হাতে গ্লাসটা ধরে আস্তে আস্তে জলটুকু খেলেন। তাঁর শিরা ওঠা হাত। চোয়াল দুটো ভিতরের দিকে ঢুকে গিয়েছে। গলার কণ্ঠীটা নড়ছে। দৃষ্টিশক্তিও কেমন ঘোলাটে হয়ে এসেছে। বৃদ্ধকে দেখে মি. সেনের বুকের ভিতরটা কেমন যেন করে উঠল। সন্তানের জন্যে কী গভীর উৎকণ্ঠা নিয়ে এতটা পথ এই এই বয়সে তিনি ছুটে এসেছেন! জল খাওয়া শেষ হলে তিনি সেই ব্যাকুল জিজ্ঞাসা নিয়ে মি. সেনের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলেন।

২

বেশ কিছুদিন হল নিলয় সমাদ্দার আবার জেলে ঢুকেছে। মি. সেন সুপার হিসাবে এখানে জয়েন করার পরে এই নিয়ে চারবার সে জেলে ঢুকল। কিছুদিন থাকে, তারপর জামিন পেয়ে বেরিয়ে যায়। আবার একটা কুকর্ম ঘটিয়ে জেলে ঢুকে পড়ে। জেলখানাটা ওর কাছে মামার বাড়ির মতো। এখানে আসার পরে নানান আবদার ওর মামাদের। মনের মতো খাবার চাই। মিনারেল ওয়াটার চাই। দুটো বালিশ চাই। মেনুতে প্রতিদিন মাছ থাকা চাই, চাল মোটা হলে চলবে না—কত রকমের ফিরিস্তি।
এদিকে প্রায়ই সময়ে বড়মামারা ভাগ্নের খোঁজখবর নিচ্ছে। তাঁর শরীর স্বাস্থ্যেরও কোনওরকম অবনতি ঘটছে কি না। তাঁর মন মানসিকতা সব ঠিকঠাক আছে কি না, জেলখানার স্টাফদের কাছ থেকে খবরাখবর নিচ্ছে। প্রয়োজনে নির্দেশ পাঠাচ্ছে। নীলু যেন ভি আই পিদেরও ভি আই পি গেস্ট।
অথচ নীলু কিন্তু এসব ব্যাপারে একেবারে চুপ। আপাতদৃষ্টিতে তাকে বেশ শান্ত স্বভাবের ছেলে বলে মনে হয়। পাঁচ ফুট চার ইঞ্চি উচ্চতা। মাথাভর্তি কোঁকড়ানো চুল। ফর্সা, রোগা চেহারার ছেলেটা প্রয়োজনের অতিরিক্ত একটা কথাও বলে না। জেলখানার অন্য আসামিদের থেকে ওর চলন-বলন একটু আলাদা ধরনের বলে মনে হয় মি. সেনের। উপর মহলের চাপ থাকার দরুণ সময়ে অসময়ে নীলুর খোঁজখবর নিতে হয় তাঁকে। প্রতিদিন তিনি নীলুর সঙ্গে কথা বলেন।
বেশ ধীর স্থির ভাবে কথা বলে নীলু। কথা বলার সময়ে তাঁর শরীরী ভাষায় একটা বিনম্র শ্রদ্ধা মেশানো থাকে। মাথা নিচু করে সে কথা বলে।
মি. সেন ভেবে পান না এই ছেলের নামে কী করে আঠারোটা কেস ঝুলছে! কোনওদিনই গলা উঁচু করে কথা বলে না নীলু। আগে কিছুদিন অন্য কয়েদিদের সঙ্গে একসঙ্গে থাকলেও তাদের রঙ্গ তামাশা, ঠাট্টা ইয়ার্কিতে কোনওদিন যোগ দিত না নীলু। নিজের মনে ঘরের এক কোণে বসে থাকত ঘণ্টার পর ঘণ্টা। দিনের নির্দিষ্ট সময়ে বাইরে এলে একা গাছের নীচে চুপচাপ বসে থাকত। মাটিতে পড়ে থাকা গাছের শুকনো ছোট ডাল দিয়ে কীসব আঁকিবুকি কাটত। কখনও উদাস দৃষ্টিতে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকত।
মি. সেন ভেবে পান না যার মাথা এতটা ঠান্ডা, সে কী করে এমন নিষ্ঠুর কাজ করতে পারে! একমাত্র ঈশ্বরই জানেন তিনি তাঁর সৃষ্টিকে নিয়ে কোন ধ্বংসের খেলা খেলছেন।
মি. সেন এখানে জয়েন করার পরে সিনিয়র জেলার মুকুল রায়ের মুখে জেনেছেন, নীলু খুব ঠান্ডা মাথার খুনি। পার্টির নেতারা নীলুকে দিয়ে এসব কাজ করায়। নীলু নাকি মোটা টাকার বিনিময়ে এসব কাজ করে। ও ভাড়াটে খুনি। ওর কোনও রাগ-দুঃখ, অভিমান, অনুরাগ-অনুশোচনা, বিচ্ছেদ-যন্ত্রণা, কোনওরকম সেন্টিমেন্ট, অপরাধবোধ—কিছুই নেই। শুধু সেই নির্দিষ্ট লোকটাকে চিনিয়ে দিতে হবে। কোথায় কোথায়, কাদের সঙ্গে তার ওঠাবসা, কখন সে একলা থাকে— ইত্যাদি জানা থাকলে নীলুর পক্ষে কাজটা করতে অনেকটা সহজ হয়ে যায়। একবার টাকা হাতে এলে কাজটা সারতে নীলুর বেশি সময় লাগে না। কাজটা হয়ে যাওয়ার পরে নীলু রুটিনমাফিক জেলে এসে ঢোকে। সেইরকমই নির্দেশ থাকে। কেননা, জেলই হচ্ছে ওর একমাত্র নিরাপদ আশ্রয়।

গতকাল রাতে তুতানের স্কুলের ইনচার্জ মিস জেসিকা রোজারিও ফোন করেছিলেন। আজ প্রায় পনেরো দিন হতে চলল তুতানকে নিয়ে পল্লবী ওর বাপের বাড়ি বর্ধমানে চলে গিয়েছে। চলে গিয়েছে বললে ভুল বলা হবে। মি. সেন নিজেই লোক দিয়ে ওদেরকে ওখানে রেখে আসতে বাধ্য হয়েছেন। তুতানের রেজাল্ট আউট হয়েছে, ও এবারেও ক্লাসে টপার হয়েছে, প্রায় প্রত্যেকটা সাবজেক্টেই ফুল মার্কস পেয়েছে। মিস তো তুতানের প্রশংসায় একেবারে গদগদ হয়ে পড়েছেন। এরকম ট্যালেন্টেড বাচ্চা খুব একটা নজরে পড়ে না।
মি. সেন চুপচাপ কথাগুলো শুনতে লাগলেন। বেশ কিছু সময় পরে মি. সেনের দিক থেকে কোনওরকম উচ্ছ্বাস দেখতে না পেয়ে তিনি অত্যন্ত আশাহত এবং লজ্জিত হয়ে বললেন,"সরি, আমি এইমুহূর্তে আপনার মনের অবস্থা বুঝতে পারছি। ফ্যামিলির জন্যে আপনি ভীষণ চিন্তিত। আসলে নেক্সট উইক থেকে স্কুল শুরু হচ্ছে তো, তাই খবরটা দেওয়ার জন্যে ফোন করলাম।"
তারপর একটু দম নিয়ে বললেন,"ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি শিগগির আপনি এই দুশ্চিন্তা থেকে রিলিফ পাবেন। ভাল থাকবেন, গুড নাইট।"
কথাটা বলে মিস ফোনটা কেটে দিলেন। মি. সেন ভদ্রতাসূচক উত্তরে শুধুমাত্র 'গুডনাইট' বলে সেই ভাবেই বসে রইলেন চেয়ারের উপরে। ভাবলেন প্রিন্সিপাল মিস মারিয়া গোমসের মুখ থেকে তাঁর এই বর্তমান অবস্থার কথা সবই মনে হয় জেনেছেন। অথচ মি. সেন এ ব্যাপারে তুতানের ইস্কুলের অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের কাউকেই জানাতে চাইছিলেন না। কিন্তু পামেলার কথায় তাকে সেদিন প্রিন্সিপালের কাছে সব কথা খুলে বলতে হল। আর না বলেও তো উপায় ছিল না। ফাইনাল

পরীক্ষার আগে এইভাবে হঠাৎ করে বাপের বাড়িতে চলে যাওয়া, তার উপর না বলে স্কুলে অ্যাবসেন্ট হচ্ছে দিনের পর দিন! আদৌ পরীক্ষা দিতে পারবে কি না, সে ব্যাপারেও যথেষ্ট টেনশনে ছিলেন মি. সেন। ভাবলেন তার চেয়ে সমস্যর কথা হেড অফ দ্য ইন্সটিটিউশনকে বলে দেওয়া ভাল।

সেইমতো একদিন সময় করে চলেও গেলেন তুতানের স্কুলে। গিয়ে প্রিন্সিপালের কাছে তাঁর বর্তমান অবস্থার কথা খুলে বললেন।

প্রিন্সিপাল মিস মারিয়া গোমস সব কথা শোনার পরে বললেন, "যদি সম্ভব হয়, শুধুমাত্র পরীক্ষার দিনগুলোতে এলেই হবে। তবে সেটাও সম্ভব হবে কি না আপনি বুঝে দেখুন। এইসব সমাজবিরোধীদের কথা কিছুমাত্র বোঝার উপায় নেই।"

মি. সেন বললেন, "সেরকম হলে ওদের বিশেষ প্রোটেকশন দিয়ে অফিসের গাড়িতে করে পাঠিয়ে দেব। তারপর পরীক্ষা হয়ে গেলে ওরা আবার চলে যাবে। আমি তো আমাকে নিয়ে কখনও ভাবি না। আমাকে তো চাকরি বজায় রাখতে গেলে এখানে থাকতে হবে। আর আমাদের প্রফেশনে এরকম হুমকি থাকেই, তার ভিতর দিয়েই কাজ করতে হয়।"

কথাগুলো বলার সময়ে বেশ একটা হতাশার সুর বেরিয়ে এল মি. সেনের গলা দিয়ে। সেটা মিস মারিয়া গোমসের চোখেও ধরা পড়েছে। তিনিও সেই কথার সমর্থনে ঈষৎ মাথা নাড়ালেন।

৩

কয়েকদিন আগে উপরমহল থেকে নির্দেশ এসেছিল নীলুকে আর সাধারণ কয়েদিদের সঙ্গে একসঙ্গে রাখা চলবে না। এবার থেকে তাকে সেলে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।

কথাটা সেদিন মি. সেন নীলুকে বলায় সে কিছুতেই রাজি হল না। মি. সেন অনেক বোঝালেন, কিন্তু তার কোনও কথাই নীলু শুনতে চাইছে না। কিছুতেই সে সেলের ভিতরে অন্যদের থেকে আলাদা থাকবে না। না পেরে মি. সেন নীলুর কাঁধে হাত রেখে বললেন, "শোনো বাবা, তোমার প্রোটেকশনের কথা ভেবেই এ কাজ করতে হচ্ছে। সাধারণ কয়েদিদের ভিতরে থাকাতে আমরা তোমার নিরাপত্তার অভাব বোধ করছি।"

"না স্যর, আমি কিছুতেই সেলে থাকবো না। সেলের ভিতরে থাকতে আমার ভাল লাগে না।"

নীলুর সাফ জবাব।

মি. সেন বললেন, "শোনো নীলু, এটা মানা না মানার প্রশ্ন নয়, সেলে তোমাকে যেতেই হবে। এটা উপরমহলের নির্দেশ। সেই নির্দেশ মানতে আমি বাধ্য। আর সেই নির্দেশ না মানলে আমার চাকরি নিয়ে টানাটানি পড়ে যাবে। তুমি কি সেটা চাও?"

নীলু মি. সেনের কথাগুলো চুপচাপ শোনার পরে বলল, "সে যে নির্দেশই থাকুক না কেন, আমি কিন্তু কিছুতেই সেলে থাকব না। আপনি আমাকে সবার ভিতরে থাকার ব্যবস্থা করুন, স্যর।"

নীলুর কথাগুলোর ভিতরে দৃঢ়তা ছিল।

মি. সেন ওর মাথায় হাত রেখে বললেন, "শোনো বাবা, এখানে থাকলে তোমাকে মার্ডার করে দিতে পারে এমন আশঙ্কা করছে সবাই।"

নিরুপায় হয়ে কথাটা তিনি বলেই দিলেন।

"আপনি অযথা ভয় পাচ্ছেন স্যর, আমার কিচ্ছু হবে না।"

মি. সেনের কথাটাকে একেবারে নস্যাৎ করে দিল নীলু। কোনওরকমভাবেই নীলুকে কথা শোনানো যাচ্ছে না দেখে মি. সেন এবারে ভিতরে ভিতরে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। ছেলেটা তাকে কী মনে করেছে? একজন কয়েদি তার সঙ্গে এইভাবে কথা বলার সাহস পায় কীভাবে? সীমাহীন প্রশ্রয় পেয়ে পেয়ে একেবারে মাথায় উঠে গিয়েছে, সবরকম আইনের বাইরে চলে গিয়েছে, এভাবে তো চলতে দেওয়া যাবে না।"

মি. সেন এবারে ধৈর্যহারা হয়ে বেশ গম্ভীর হয়ে বললেন, "শোনো নীলু, জেলের বাইরেটা তোমার রাজত্ব সেখানে তুমি যা খুশি তাই করতে পারো, কিন্তু জেলের ভিতরে ঢুকলে তোমাকে আমার কথা শুনে চলতে হবে। আমি যা বলব, তোমাকে তাই মেনে নিতে হবে।"

"আর যদি মেনে না নেই?"

নীলু তীক্ষ্ণ চাহনি আজ যেন অন্য কথা বলছে। কী স্পর্দ্ধা! মি. সেনের মাথার ভিতরে একটা আগুনের গোলা ছুটে গেল। তিনিও ছাড়বার পাত্র নন। পাশে দাঁড়িয়ে থাকা জেলার এবং সাব জেলারের সামনে এভাবে কথা বলতে দেখে তিনি ভিতরে ভিতরে অপমানিতবোধ করলেন। গম্ভীর স্বরে বললেন, "শুনতে তুমি বাধ্য। তুমি তো সেলের কয়েদি। এর আগেও তো তুমি সেলেই ছিলে। আমি তোমার সম্পর্কে কিছু জানি না বলে মনে করেছ?"

নীলু মুখে কিছুই বলল না। শুধু শীতল এক দৃষ্টি দিয়ে মি. সেনের দিকে তাকিয়ে রইল।

মি. সেন দেখলেন, সেই বরফ শীতল চাহনির দিকে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকা তাঁর মতো মানুষের পক্ষেও সম্ভব নয়। মনে হচ্ছে একটা বিষাক্ত কেউটে যেন হিলহিল করতে করতে তাঁর শিরদাঁড়া বেয়ে নীচের দিকে নেমে যাচ্ছে। কোনও ফোঁস নয়, ছোবল নয়, তবু যেন তাঁর বুকের ভিতরটা থিরথির করে কাঁপতে লাগল। ছোট ছোট দুটো চোখে ফুটে উঠছে কী ভীষণ ক্রূরতা!

কয়েক মুহূর্ত কেটে গেল চরম নিস্তব্ধতায়।

মি. সেন কথাটা বলে চলে আসছিলেন। হঠাৎ নীলুর গলার স্বর শুনে পিছন ফিরে তালালেন।

নীলু বেশ কঠিন গলায় বলল, "শুনুন স্যর, আগামী একমাসের ভিতরে আপনি যদি এই শহর ছেড়ে চলে না যান, হয় আপনি থাকবেন এই শহরে, নয় আমি।"

কথাটা বলে নীলু সামনের দিকে এগিয়ে গেল।

সাব-জেলার নিজের হাতে নীলুর হাতে হাতকড়া পরিয়ে সেলের কুঠুরির দিকে নিয়ে চললেন। দুইজন সেপাই ওঁর সঙ্গে সঙ্গে চলল। দোতলায় পরপর বেশ কয়েকটা সেল আছে। এক-দুই-তিন করে করে সাত নম্বরে ঢুকিয়ে দেওয়া হল নীলুকে। মি. সেন নীলুর যাত্রাপথের প্রতিটা পদক্ষেপ তাকিয়ে দেখতে লাগলেন। দোতলার সিঁড়ি ধরে উপরে ওঠার মুখে একবার ঘাড় ঘুরিয়ে নীলু মি. সেনকে দেখে নিল।

সাব-জেলার নিজের হাতে সেলের দরজায় ভারী লোহার তালা লাগিয়ে দিলেন।

যতবার নীলুর হুমকির কথাটা মনে পড়েছে ততবারই একটা হিংস্র সাপ যেন মি. সেনের গলার কাছে এসে ফণা তুলেছে। তবু কর্তব্যের খাতিরে প্রতিদিন তাকে নীলুর কাছে যেতে হয়। তার ভালমন্দ খবরাখবর নিতে হয়। নীলু বলেছিল, সেলের ভিতরে তার দমবন্ধ হয়ে আসে। আলো-বাতাসহীন এই পরিবেশে মনে হয় সে পাগল হয়ে যাবে।

মি. সেন নীলুর কথা ভেবে ওর খাওয়াদাওয়ার দিকে আরও বেশি যত্নবান হয়েছেন। গান শোনার জন্যে ছোট একটা রেডিও উপহার দিয়েছেন। ওকে পেপার এবং কিছু গল্পের বই পড়তে দেওয়া হয়। তবু দেখা হলেই ও একবার বাইরে আসার কথা বলবেই।

বাড়ি ফিরে সেই দিন কিছু না বললেও পামেলার চোখে কিছু একটা অস্বাভাবিকত্ব নজরে পড়েছিল। পরের দিন তুতান স্কুলে চলে গেলে তিনি পামেলাকে সব কথা বললেন। কথাটা শোনামাত্র পামেলার বুকের ভিতরটাতে মনে হল, কে যেন ধারালো ছুরি দিয়ে ফালাফালা করে কাটছে। এই অবস্থায় তাঁর কী করা উচিত কিছুই বুঝতে পারলেন না। একবার ভাবলেন তুতানকে ওর দিম্মার কাছে রেখে উনি এখানে হাজব্যান্ডের কাছে থেকে যাবেন। এইভাবে ওঁকে একা রেখে গেলে চিন্তায় চিন্তায় শেষ হয়ে যাবে।
কথাটা মি. সেনকে বলা মাত্র তিনি বললেন, "না না, তা কি করে সম্ভব? তুতান মা ছাড়া এইভাবে কতদিন কাটাবে? তা ছাড়া এটা প্রফেশানাল হ্যাজার্ড। আমার জন্যে কিচ্ছু ভাবতে হবে না।"
পামেলা আর বেশি ভয় পেয়ে যাবে তাই মুকুলের কথাগুলো আর বললেন না মি. সেন সেদিন নীলুর কথাটা শোনার পরে তিনি নিজের চেয়ারে এসে ধপ করে বসে পড়লেন। সাব-জেলারের মুখে অন্যরা সবাই শুনেছিল কথাটা। নীলুর কথাটা যে স্যরকে ভালরকম আঘাত দিয়েছে, সেটা তার মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে। নীলু জেলে থাকলে কী হবে, ওর তো আরও সাঙ্গপাঙ্গ বাইরে আছে। তাদেরকে কথাটা বলে দিলে রাতারাতি কাজটা হাসিল হয়ে যাবে। এসব কাজ তো ওদের কাছে নস্যি।
মুকুলবাবু একসময় মি. সেনকে একা পেয়ে চুপিচুপি বলল, "স্যর, ম্যাডাম আর ছেলেকে দেশের বাড়িতে না হয় অন্য কোথাও রেখে আসুন। নীলুর কথাটা ভাল মনে হচ্ছে না। ও ছেলে যা বলে তাই ও করে ছাড়ে। দেখলে শান্ত মনে হলে কী হবে, ও একটা জাত কেউটে। ওর ল্যাজে যে একবার পা দিয়েছে না, তার আর রক্ষে নেই।"
মি. সেনও এ যাবৎ লক্ষ করেছেন, যে যতবড়ো খুনি, তারা ততবেশি ধীর স্থির। কথা কম বলে, আর বললেও মেপে মেপে বলে।

৪

নিলয় সমাদ্দারের হাত যে ওর পাঁচ ফুট চার ইঞ্চি শরীরটার তুলনায় বহুদূর বিস্তৃত সে প্রমাণ মি. সেন এখানে আসার আগেই জেনেছিলেন। নীলুর একটা ফোনেই নাকি তৎকালীন জেলার তমলুক থেকে দার্জিলিং-এ বদলি হয়ে যান। মাত্র দিন সাতেকের ভিতরে সেই নির্দেশ আসায় তিনি তো অবাক। তার ছেলের তখন সামনেই বোর্ডের পরীক্ষা। এরপর পরেই জেলের ভিতরে একজন খুন হয়ে যায়। নীলুর দিকে আঙুল ওঠার সব সাক্ষ্য প্রমাণ একদিনের ভিতরে সব লোপাট হয়ে যায়। নীলু বহাল তবিয়তে জেলের ভিতরে ঘোরাফেরা করতে থাকে। নীলুর গায়ে তখন রাজনীতির রং লাগানো। তার টিকি ছোঁয়ার মতো সাহস কারও নেই।
কিন্তু এবারের ব্যাপারটা সম্পূর্ণ আলাদা। কয়েকদিন হল জেলের ভিতরে নীলুর বিপক্ষের কয়েকজন ঢোকায় নীলুর নিরাপত্তা নিয়ে নানান প্রশ্ন উঠছে। মি. সেন নিজেও সেটা বুঝতে পারছেন। কতক্ষণই বা আর তাদের চোখে চোখে রাখা যায়। যে কোনও সময়ে নীলুকে তারা মার্ডার করে দিতে পারে। কথাটা যতবার ভাবেন ততবারই তার অশীতিপর সেই বৃদ্ধের মুখটা মনে পড়ে যায়। উসকোখুসকো চুল, ঘোলাটে পীতবর্ণ চোখ, মেদবিহীন, শিরা ওঠা লোলচর্মসার সেই বুড়ো মানুষটার কথা, "একটু দেখবেন স্যর। ও ছাড়া এই পৃথিবীতে আমার আর কেউ নেই।"

কয়েকদিন অন্তর অন্তর নীলুকে আদালতে হাজিরা দিতে হয়। আদালত থেকে নোটিশ হাতে পেলে সেইদিন একটা প্রিজন ভ্যানে করে কয়েকজন রক্ষী-সহ নীলুকে নিয়ে যাওয়া হয়। গতকালই রাতে প্রায় এগারোটার দিকে মি. সেন ডিনার সেরে সবে উঠে হাত মুছছেন সেই সময় ফোন আসে। বেশ বড়মাপের একজন কর্তাব্যক্তির ফোন। তার নির্দেশ, নীলুকে যেন কোনওমতে বাইরে বার না করা হয়। এমনকী জেলের ভিতরেও যেন ওর নিরাপত্তাবলয় আরও বাড়িয়ে দেওয়া হয়। নীলুর যেন এই মুহূর্তে কোনওরকম ক্ষতি না হয়, সেইদিকে প্রত্যেককে কড়া নজর দিতে বলা হল। কথারা অনুরোধের সুরে বলা হলেও এটা তাঁর কাছে আদেশের মতোই, প্রতিটা কথা তাঁদেরকে মেনে চলতে হবে।
আজ কেন জানি বারেবারে নিলয়ের বাবার মুখটা তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠছে। অথচ সেদিন একবারের জন্যেও তিনি নীলুকে তাঁর বাবার কথা বলেননি। তার বাবা যে তাঁকে কীভাবে অনুরোধ করে গিয়েছেন, ছেলেকে নিয়ে তার যে কী গভীর দুশ্চিন্তা, সেসব নীলু হয়তো কিছুই জানে না।
পামেলা আর তুতান সেদিন বাড়িতে ছিল ন। মি. সেনের সময়টাও কাটছিল না। তাই সেদিন তিনি নিলয়ের বাবার কথাগুলো গভীর মন দিয়ে শুনতে লাগলেন। নীলা আর নিলয় পিঠোপিঠি ভাইবোন। মাত্র দেড়বছর বয়সের ব্যবধান তাদের ভিতরে। গ্রামের স্কুলে দুই ভাইবোন একই সঙ্গে স্কুলে যেত। নিলয়ের বাবার বাড়ি থেকে বেশ কিছুটা দূরে বাস স্টপেজে একটা চায়ের দোকান আছে। এটাই তার রোজগারের একমাত্র অবলম্বন। এই ইনকাম থেকেই তিনি ছেলেমেয়েকে মাধ্যমিক পর্যন্ত পড়িয়েছিলেন। এগারো ক্লাসে ওঠার পরে মেয়েটা শহরে একটা চাকরি পেয়ে গেল। একাটা এসটিডি বুথে কাজ করতে লাগল। বলল ভাই পড়ুক। ভাবলাম, সেই ভাল। আর কিছুদিন বাদে তো ওকে বিয়ে দিতেই হবে। নিলয় টিউশন থেকে ফেরার পথে প্রতিদিন দিদিকে নিয়েই বাড়ি ফিরত।
সেদিনটা ছিল ঘোর বর্ষার রাত। সন্ধে থেকে একেবারে মুষলধারায় বৃষ্টি নামল। রাত যত বাড়ে, বৃষ্টির বেগও তত বাড়ে। নিলয় সেদিন পড়তে যেতে পারেনি। ভাইয়ের আশায় থেকে থেকে একসময় নীলা বেরিয়ে পড়ে। এদিকে বৃষ্টি একটু কমে গেলে নিলয়ও বেরিয়ে যায় দিদিকে আনতে।
বাস স্টপেজ থেকে বাড়ি ফেরার পথে একটা বিল পড়ে। শুনশান চারিদিক। এই জায়গাটাতে দিনের বেলায় আসতেই গা ছমছম করে। নীলা একটা ভ্যান পেয়ে ছাতা মাথায় দিয়ে আসছিল। আর সেই সময়ে ঘটে গেল সেই দুর্ঘটনা। রাস্তার পাশে একটা ঝুপড়ি থেকে কয়েকজন ছেলে বেরিয়ে এসে ভ্যানটাকে দাঁড় করায়। তারপর মেয়েকে টানতে টানতে...।
শেষের দিকে কথাটা বলতে গিয়ে বৃদ্ধের গলার স্বর বুজে আসে। তিনি থরথর করে কাঁপতে থাকেন, তার দু'গাল বেয়ে জলের ধারা নামছে তখন।
মি. সেন চেয়ার ছেড়ে উঠে বৃদ্ধের কাছে এসে দাঁড়ান। বুকের ভিতর থেকে গভীর শ্বাস বেরিয়ে আসে। এর পরের ঘটনা তো তিনি পেপারেই পড়েছিলেন।
ভাইটা সেই সময়ে ঘটনাস্থলে এসে পরে এবং ছেলেগুলোকে বাধা দিতে গেলে তাকেও নির্মমভাবে ছুরি দিয়ে আঘাত করে গুণ্ডারা। মেয়েটাকে নৃশংসভাবে সকলে মিলে রেপ করে এবং ওড়না দিয়ে শ্বাসরোধ করে মেরেও ফেলে।
পরের ঘটনা সবই জানেন মি. সেন। ভাইটা বেশ কিছুদিন হাসপাতালে কাটিয়ে একটু সুস্থ হয়ে থানায় গিয়ে ছেলেগুলোকে চিনিয়ে দিলেও কিছুদিনের ভিতরে তারা বেকসুর খালাস পেয়ে গ্রামের ভিতরে বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগল। আর শাসানি

দিতে থাকল। সেই ভাইটাই যে নিলয় সমাদ্দার সেটা এই প্রথম জানলেন মি. সেন।
নীলু তখন দিদির খুনের অপরাধীদের সাজা দিতে নিজের হাতেই আইন তুলে নিল। আর সেটাই ওর জীবনের কাল হল।
মি. সেন চুপচাপ শুনে গেলেন বৃদ্ধের কথাগুলো। ভাবছেন, নীলুকে কীভাবে বাঁচাবেন তিনি? কীভাবে তিনি এই সরল, সাধাসিধে গ্রাম্য মানুষটাকে রাজনীতির জটিল পূতগন্ধময় ক্লেদাক্ত চক্রের কথা বোঝাবেন। এখানে তাঁরা সবাই অসহায়। সত্যি কথা বলতে গেলে তাদের হাতে সেরকম কোনও ক্ষমতাই নেই। তাঁরা পুতুলনাচের পুতুলমাত্র। সুতো ধরে তাঁদের খেলাচ্ছে অন্যজন।

৫

মিসেস এবং ছেলেকে শ্বশুরবাড়িতে পাঠিয়ে দিয়ে অনেকটা চিন্তামুক্ত লাগছে মি. সেনের। নিজের জন্যে আদৌ তার ভাবনা হয় না। তুতানকে সুস্থ পরিবেশে বড় করাটাই এখন ওঁর একমাত্র লক্ষ।
আজ দুপুরের পরে সেলগুলিতে ভিজিট করার সময়ে নীলুর সঙ্গে বেশ কিছুটা সময় কথাবার্তা বললেন তিনি। নীলু সেই আগের মতোই ধীর শান্ত ভাবে তার কথা বলল। মি. সেন তাকে এপথ থেকে আস্তে আস্তে সরে আসার কথা বললেন।
এও বললেন, তোমার এখন অল্প বয়স, চাইলে তুমি এরপরে ছাড়া পেয়ে যেকোনও কাজ করতে পার। বড় বড় মানুষের সঙ্গে তোমার পরিচয় আছে, চাইলে তারা তোমাকে কিছু না কিছু কাজ জোগাড় করে দিতে পারবেন।
কথাটা শুনে নীলু মৃদু হাসল। তারপর বলল,"এখান থেকে আর ফেরা সম্ভব নয়।"
"আমি তো তোমাকে ফেরার কথা বলছি না, বলছি জীবনের চলার পথের রাস্তাটা বদলাও। দেখো, ডাইনে-বাঁয়ে অনেক পথ খোলা আছে। হাঁটো, দেখবে হাঁটলেই পথ তৈরি হয়ে যাবে। আর সময় নষ্ট হওয়ার কথা বলছ, কতই বা বয়স তোমার?"
"সে হয় না স্যার, আমি ভাল হতে চাইলেও আমার নিয়তি আমার পিছু ছাড়বে না, আমাকে ভাল মানুষ হতে দেবে না। নইলে কবেই এসব ছেড়ে দিতাম। তবে স্যর আজ আপনার মুখে কথাগুলো শুনে আমার কেন জানি বারবার বাবার কথা মনে পড়ছে। আমার বাবাও ঠিক এইভাবে আমাকে বলতেন। আর কেউ কখনও এইভাবে আমাকে বলেনি। বাকি সবাই আমাকে তাদের কাজে ব্যবহার করে গিয়েছে।"
নীলুর কথাগুলোতে চূড়ান্ত হতাশা ঝরে পড়ে। আবার ঘুরেফিরে সে পুরনো প্রসঙ্গ তোলে,"স্যর, আমাকে একটু সেলের বাইরে বেরনোর অনুমতি দিন না। একটু আলো, এক চিলতে রোদ্দুর। কী স্যাঁতসেঁতে, নোংরা, গন্ধ এই ঘরগুলো। আমার গা'টা গুলিয়ে ওঠে স্যর। কতদিন আকাশ দেখি না, রাতের বেলায় নক্ষত্রে ভরা আকাশটা দেখতে বড় সাধ হয় স্যর।"
মি. সেন অবাক চোখে নীলুর দিকে তাকিয়ে থাকেন। ভাবেন, তাই তো, খুব অন্যায্য কিছু তো ও চায় নি। এক চিলতে রোদ্দুর, একটু বাতাস, আর এক উন্মুক্ত আকাশের নীচে ও শুধু দাঁড়াতে চায়। মাঝেমাঝে ছেলেটার জন্য তাঁর বুকের ভিতরটাও কেমন যেন হু হু করে ওঠে। তিনি আস্তে আস্তে বলেন, "সব বুঝি রে বাবা, কিন্তু আইনের হাতে যে আমাদেরও হাত-পা বাঁধা। এখানে আমার সবাই বন্দি। ল অ্যান্ড অর্ডারের বাইরে তো আমরা কিছু করতে পারি না।"
কথাটা বলে চলেই যাচ্ছিলেন। হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে যাওয়ায় পিছনের দিকে তাকালেন। ঘুরে দেখলেন, নীলু সেইভাবে গরাদ ধরে দাঁড়িয়ে আছে। ওর দুচোখে ফসল কাটা মাঠের ধূ ধূ শূন্যতা। সেই শূন্যতার ভিতর দিয়ে হু হু শব্দে ছুটে যাচ্ছে একরাশ ঠান্ডা বাতাস। মি. সেনের বুকের গভীর থেকে সহসা একটা কান্নার বুদবুদ উঠে আসছে। তিনি নিজেকে সংবরণ করে নিয়ে বললেন, "নীলু , পরশু সকালে আদালতে শমন আছে বুঝলে।"
কথাটা শোনা মাত্র নীলুর চোখ দুটোতে এক ঝলক খুশির রোদ্দুর ঝিলিক খেলে গেল, "সত্যি স্যর? কতদিন বাদে বাইরে বের হবো। এখানে আমার দম বন্ধ হয়ে আসে। বসে থাকতে থাকতে হাত-পাগুলো সব মনে হচ্ছে জং ধরে গেল।"

নীলু সেইভাবে গরাদ ধরে দাঁড়িয়ে আছে। ওর দু'চোখে ফসল কাটা মাঠের ধূ ধূ শূন্যতা। সেই শূন্যতার ভিতর দিয়ে ছুটে যাচ্ছে ঠান্ডা বাতাস।



কথাগুলো বলে ও একটু আড়মোড়া ভাঙে। তারপর আস্তে আস্তে বলে, "একটা ছোট রিকোয়েস্ট ছিল স্যর, রাখবেন?"
আবার কীসের রিকোয়েস্ট, বলো?"
মি. সেনের ভ্রূজোড়া সংকুচিত হয়।
"বলছিলাম কী স্যর, অনেকদিন বাবার সঙ্গে দেখা হয়নি, আমি একটা ফোন নাম্বার বলছি, যদি বাবাকে একবার খবরটা দেওয়া যায়। সেদিন বাবা আদালতে এলে আমার সঙ্গে একবার দেখা হতে পারে।"
নীলুর কথাগুলো কেমন অসহায়ের মতো শোনাল।
মি. সেন শোনামাত্র বললেন,"অবশ্যই খবরটা পৌঁছে দেব।"
ভিতরে মোবাইল নিয়ে ঢোকা নিষেধ। সেই মুহূর্তে তাঁর কাছে কোনও কাগজ না থাকায় মি. সেন তাই নিজের হাতের তালুতে ফোন নাম্বারটা লিখে নিলেন।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলেন পাঁচটা বাজতে চলেছে। সেল থেকে বেরিয়ে এলে ভোঁ-ও-ও করে সাইরেন বেজে উঠল। কয়েদিরা সবাই লাইন দিয়ে যে যার কক্ষে ঢুকে গেল।

৬

বিচারপতি মি. নীরজ মিশ্রের এজলাসে আজ হাজির থাকতে হবে নিলয় সমাদ্দারকে। পুরনো একটা মামলার শুনানি হবে। সেইমতো মি. সেনের কাছে আদালতের কপি পৌঁছে গিয়েছে কয়েকদিন আগেই।
মি. নীরজ মিশ্রের সেদিন আরও দু'টো কেস আছে। প্রথমে সেই কেস দুটোর ফয়সালা হবে আজ। তারপরে নিলয়ের কেসটা উঠবে। নিলয় সমাদ্দার যেহেতু একজন হাইপ্রোফাইল কয়েদি, তাই তাঁকে খুব বেশি সময় বাইরে যাতে না কাটাতে হয়, তাই বিচার প্রক্রিয়া শুরুর কিছুটা আগেই নিয়ে যাওয়া হবে।
সংশোধনাগার থেকে আদালত মিনিট পাঁচেকের পথ। আদালত চত্বর এখন জনাকীর্ণ। কলকাতার কোনো নামী পুজো প্যান্ডেলের

মতো গিজগিজ করছে লোক। বাইক, সাইকেল প্রাইভেট কার আর মানুষের ভিড়ে সারি সারি টেবিল পেতে বসা মুহুরিরা ঢাকা পড়ে গিয়েছে। ঝুরি নেমে আসা বিশাল বট গাছের বাঁধানো চাতালে এক চিলতে জায়গাও অবশিষ্ট নেই। সেই কোন সকাল থেকে দূর-দূরান্তের মানুষজন এসে বসে আছে বিচারের আশায়। বটের ছায়ায় আজ শতরঞ্চি বিছিয়ে বসেছে নিয়ামত আলি। হরেক রকমের গাছগাছড়ার শিকড়, জরি-বুটি, বহুমুখী রুদ্রাক্ষের মালা, পাহাড়ি গাছের বাকল, কিছু ভেষজ তেল, তাবিজ-কবজ আংটি নিয়ে সাজিয়ে বসে আছে। কিছু গ্রাম্য মহিলা ভিড় করে নিয়ামত আলির কথা শুনছে। কেউ কেউ ব্যথা উপশমের জন্যে মালিশের তেল, গৃহ বিবাদ থেকে মুক্তি পেতে কচ্ছপের হাড়ের টুকরো, স্বামীর পরনারীর প্রতি আসক্তি থেকে মুক্তি পেতে পাথরের আংটি কিনে নিল।
নিয়ামত আলির পাশেই একজন সাধু স্বপ্নে পাওয়া ওষুধ বিক্রি করছে। সেখানেও বেশ ভিড়। আদালতের পুবদিকের কোণে বৌদির হোটেলেও একতিল জায়গা নেই।
সকাল সকাল আদালতে চলে এসেছেন নিলয়ের বাবা। খামোখা দাঁড়িয়ে না থেকে এদিক সেদিক ঘোরাঘুরি করে দেখছেন আর একটু বসার জায়গার খোঁজ করছেন। কোমরে এখন আর সেই আগের মতো জোর নেই। একটুখানি বসতে না পারলে আর চলছে না। কাল সারাটা রাত দু'চোখের পাতা এক করতে পারেননি। কীসব হাবিজাবি চিন্তা ভিড় করেছিল মাথার ভিতরে। রাত থাকতে তাই তিনি বেরিয়ে পড়েছেন। নীলুকে না দেখা পর্যন্ত তাঁর মনটা কিছুতেই শান্ত হচ্ছে না। মাঝে একবার জেলের সামনে থেকে ঘুরেও এসেছেন। জেলখানার গেটের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা প্রহরী তাঁকে জানিয়েছে এখন পর্যন্ত কাউকে আদালতে নিয়ে যাওয়া হয়নি। গেটের বাইরে ছাতিমতলায় বেশ কিছু সময় বসে ছিলেন তিনি।
পরপর বেশ কিছু প্রিজ়ন ভ্যান ঢুকছে দেখে নীলুর বাবা কিছুটা প্রত্যাশা নিয়ে এগিয়ে গেলেন। কৌতূহলী হয়ে উঁকিঝুঁকি দিয়ে দেখলেন তিন ভ্যান ভর্তি নেপালি ছেলেমেয়ে। কানাঘুষোয় জানতে পারলেন পাহাড়ে নাকি বন্ধ-অবরোধ চলছে।
সামনের সাদা বিল্ডিংটার ভিতরে বিচারপর্ব চলছে। তিনি ফিরে এসে বটের ছায়ায় বসে অপেক্ষা করতে লাগলেন। এত বড় আদালত, এত লোকজন সবাই নিজের নিজের কাজে ভীষণ ব্যস্ত। কে জানে তার ছেলে কখন আসবে, কখন তাকে প্রিজ়ন ভ্যান থেকে নামানো হবে। সেই মাহেন্দ্রক্ষণের জন্যে তিনি বসে আছেন। কতদিন পরে একবার আত্মজকে নিজের চোখে তিনি দেখতে চান।

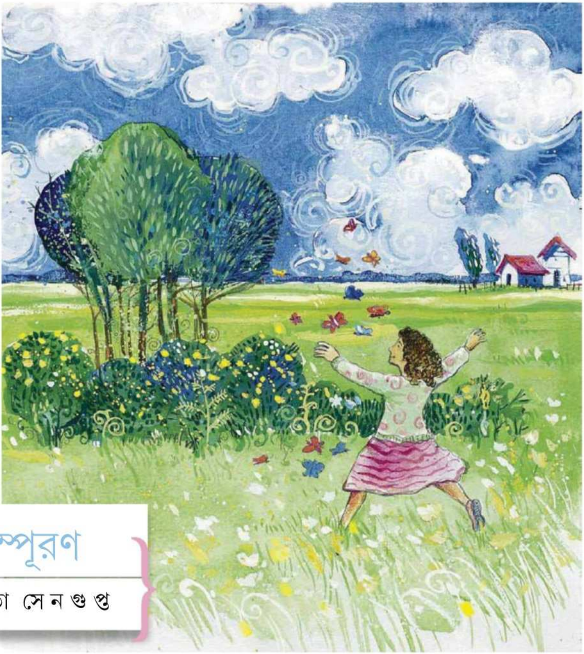
বেশ কিছুটা সময় কেটে গেল। এই দুপুর রোদে ঠায় দাঁড়িয়ে-বসে থাকতে থাকতে বৃদ্ধের চোখে একটা ঝিমুনি এসে গেল। তিনি চেষ্টা করেও ঠেকাতে পারছেন না। মনে হচ্ছে কোথাও একটু ঠেস দিতে পারলে বেশ হত। আবার সেই সঙ্গে মনের ভিতরের দারুণ উদ্বেগ তাঁকে ক্ষণে ক্ষণে জাগিয়ে দিচ্ছে, ভাবছেন ঘুমিয়ে পড়লে নীলুর সঙ্গে যদি আর দেখা না হয়। তবু কেন জানি হাজার বছরের ঘুম তাঁর দু'চোখে আজ নোঙর ফেলল।

হঠাৎ পরপর দু'বার গুলির শব্দে নীলুর বাবা চমকে উঠলেন। তাকিয়ে দেখলেন তাঁর আশেপাশের সবাই পড়িমরি করে ছুটছে। তিনিও সবার দেখাদেখি জনতার পিছু নিলেন। কিন্তু বয়সের ভারে তিনি ছুটতে পারলেন না। রাস্তার পাশে প্রায় ঝাঁপ বন্ধ হয়ে আসা একটা এসটিডি বুথে ঢুকে আশ্রয় নিলেন। মুহূর্তের ভিতরে জায়গাটা পুলিশে পুলিশে ছয়লাপ হয়ে গেল। পুলিশ আদালত চত্বর থেকে সকলকে বাইরে পাঠিয়ে দিচ্ছে। তিনি লোকমুখে শুনলেন, বিচার চলাকালীন একজন কয়েদি নাকি হাতকড়া পরা অবস্থাতে পালিয়েছে কাঠগড়া থেকে। রক্ষী তখন নাকি অন্য একজন কয়েদিকে নিয়ে ব্যস্ত ছিল। কেউ বলছেন, কোর্ট চত্বরে কাকে যেন গুলি করা হয়েছে।

৭

আদালত চত্বর এবং কোর্ট রোডে আজ ১৪৪ ধারা বলবৎ করা হয়েছে। পুলিশ পিকেটিং বসেছে। কর্তব্যরত পুলিশবাহিনি রাস্তায় টহল দিচ্ছে।
মি. সেন বেলাশেষে প্রতিদিনের মতো আজও বাড়ি ফিরছিলেন। তবে আজ সংশোধনাগার থেকে বের হতে একটু দেরি হয়ে গেল। নীলুর ব্যাপারে বেশ ব্যস্ত ছিলেন।
আজ তিনি জেলখানার পিছনের রাস্তা না ধরে কোর্ট রোড ধরলেন। এই রাস্তাটা যেখানে ডানদিকে বাঁক নিয়েছে সেই মোড়েই হাসপাতালের মর্গ। এখানে আপাতত পোস্টমর্টেমের জন্যে রাখা আছে নীলুর বডিটা।
দিন শেষ হয়ে গিয়েছে বেশ কিছুক্ষণ আগেই। দিনের শেষ আলোকবিন্দুটুকুও শুষে নিয়েছে রাতের আকাশ। শহরের ব্যস্ততম রাস্তাটা এখন শুনশান। আশপাশের দোকান সব বন্ধ। দু'-একজন পথচারী আর কয়েকটি কুকুর আপনমনে হেঁটে যাচ্ছে রাস্তা দিয়ে। রাস্তার পাশে নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে আছে কয়েকটা জারুল, অমলতাস আর বকুল গাছ। একটা বিষণ্ণ বাতাস ছুটে গেল সেই নির্জন পথ ধরে।
আজকের খবরটা মি. সেন জেলে বসেই শুনতে পান। প্রিজ়ন ভ্যান থেকে বেরিয়ে এজলাশে ঢোকার মুখে একজন আততায়ী খুব কাছ থেকে নীলুকে গুলি করে। প্রথমে মাথায়। তারপরে বুকে। সেই সময়ে একজন কয়েদি পালিয়ে যাওয়ায় সকলে সেই দিকে ব্যস্ত ছিল। কোর্টের ভিতরে একটা হুড়োহুড়ি পরিবেশ ছিল। আর আততায়ী সেই সুযোগটাকে কাজে লাগায়।
খবরটা শোনা মাত্র মুকুলবাবু এগিয়ে এসে বলেন, "স্যর, ছেলেটার কথার দামটা একবার লক্ষ করেছেন? আজ কিন্তু সেই পনেরোই মার্চ। গতমাসের এই তারিখে নীলু আপানাকে আল্টিমেটাম দিয়েছিল। আপনার চোখের ঘুম কেড়ে নিয়েছিল, স্যর। আজ আপনি একটু নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারবেন।"
মি. সেন ধূসরদৃষ্টিতে মুকুলবাবুর দিকে তাকালেন।
লজ্জায় মুকুলবাবু মাথা নত করলেন।
নক্ষত্রে ভরা রাতের আকাশ। মি. সেন হাঁটতে হাঁটতে আকাশের দিকে তাকালেন। এত নক্ষত্র বহুদিন তার নজরে পড়েনি। মর্গের সামনে আসতেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন মি. সেন। হলুদ রঙের একতলা ছোট ঘরটার সামনে একটা বাল্ব টিমটিম করে জ্বলছে। শুনশান চারিদিক। তিনি দেখলেন মর্গের বাইরে তালা লাগানো লোহার গেটটার ঠিক সামনে জনমানবহীন, কোলাহলশূন্য পথের ধারে মাটির উপরে দুই হাঁটুর ভিতরে মাথা ঢুকিয়ে বসে আছেন পুত্রশোকে কাতর এক বৃদ্ধ। আশপাশে কেউ কোথাও নেই। শুধু নক্ষত্রে ভরা নীরব আকাশ আজ ঝুঁকে পড়ে তাঁকে সান্ত্বনা দিচ্ছে।

অলংকরণ: শুভম দে সরকার



সম্পূরণ

জয়িতা সেনগুপ্ত

'মতিভ্রম!' এই শব্দ আর তার সাথে সঙ্গতি রেখে মুখ বাঁকানো, এই ক'দিনে দিব্যি অভ্যাস হয়ে গেছে রুচিরার। হালকা ক্লিকে সে পৌঁছল দিদির ই-মেলের দ্বিতীয় প্যারাগ্রাফে। বিষয়ের হেরফের খুব একটা নেই। বরাবরের মতোই জেদ ধরে বোকামি করার বয়স যে রুচিরা পার করে এসেছে, সেটা যেন এখন ভুলে না যায়। ইমনের যে বয়স, তাতে ওর আত্মসম্মানবোধকে আহত করা মা হিসেবে রুচিরার একেবারেই উচিত নয়। তাছাড়া অমিতাভ, তার মনের কথাটাও ভাবা উচিত এবং ইত্যাদি ইত্যাদি। পুরো চিঠিতে একবার চোখ বুলিয়ে পুরোটাই কপি করে ফেলল ওয়ার্ড-এ, ওয়ার্ডকাউন্ট চালিয়ে নিজেই হেসে ফেলল, একশো তিপ্পান্নটা শব্দ। গত ত্রিশ বছরে তার কানাডাবাসিনী দিদি এত কথা দিয়ে চিঠি লেখেনি আর একটাও।

ল্যাপটপ বন্ধ করে বারান্দায় এসে দাঁড়াল রুচিরা। শেষ বৈশাখের সময়ে আজ আচমকাই এক পশলা ঝড়বৃষ্টি স্বস্তি এনে দিয়েছে কলকাতাকে। বাড়ির সামনের গলি ঢেকে আছে ভেজা কৃষ্ণচূড়ার পাপড়ি আর পাতায়। আলতো বাতাসে তার টবের বেলফুলগুলো দুলে দুলে হাসছে। রোজকার মতোই একটা প্লেন চলে গেল দমদমের দিকে। অনেকদিন প্রবাস কাটিয়ে কেউ হয়তো বাড়ি ফিরল। আবার হয়তো বা অনেক ভয়, দুশ্চিন্তা নিয়ে কেউ এল অচেনা শহরে। এলোপাথারি ভাবনাগুলোকে গুছিয়ে নিয়ে সুগন্ধি বাতাসে প্রাণ ভরে শ্বাস নিল রুচিরা। এবার শুতে যাওয়া উচিত।

ভিতরে এসে ডাইনিং টেবলে রাখা একটা জলের বোতল নিয়ে ইমনের ঘরে ঢুকল। বিছানাময় বই, আইপড, হেডফোন ছড়িয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে ঘুমোচ্ছে মেয়ে। কোঁকড়া চুলের ঝাঁকে মুখ ঢেকে রয়েছে। চুলগুলো মুখের থেকে সরিয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে কয়েক পলক তাকিয়ে রইল রুচিরা। এই তো সেদিন সাদা তোয়ালে জড়িয়ে কোলে দিয়ে

গেল নার্স। বুকের মধ্যে চেপে ধরে প্রথম পাওয়া অভাবনীয় সুখ। প্রতিটা রোমকূপে চুঁইয়ে নামে ভাললাগার স্বাদ। কীভাবে যে সময় পেরিয়ে যায়! জলের বোতল মাথার ধারে রেখে ঘুমন্ত মেয়ের কপালে চুমু দিল একটা। তারপর দরজা টেনে নিজের ঘরে গেল। বেডসাইড ল্যাম্প জ্বালিয়ে রেখেই বাবু ঘুমিয়ে পড়েছেন আজ। হাতের পাশ থেকে খবরের কাগজ সরিয়ে রেখে লাইট নিভিয়ে শুয়ে পড়ল রুচিরা। খুব ভাল একটা ঘুম দরকার। দরকার একটা স্বপ্নও। স্বপ্নেই তো ও আসে, ওকে ছোঁওয়া যায়। আদর করা যায় প্রাণভরে।

"ইটস টু মাচ, বাপি। আই অ্যাম নট গোয়িং টু টলারেট অল দিজ়। বন্ধুদের কাছে আমি মুখ দেখাব কীভাবে? আমি বাড়ি ছেড়ে চলে যাব। জাস্ট মেক ইট ক্লিয়ার টু ইওর ডিয়ার ওয়াইফ।"
"মায়ের সম্পর্কে এভাবে কথা বলা উচিত নয়, ইমন।"
"ওহ, রিয়েলি? উচিত অনুচিত শুধু ছোটদের বেলাতেই, তাই না? তোমাদের জন্য সব ঠিক?"
ব্রেকফাস্টের প্লেট হাতে রুচিরা এসে পড়তেই দু'জনেই চুপ।
"পরোটার সঙ্গে আচার খাবি না টোম্যাটো কেচাপ দেব?" না তাকিয়েই ইমনকে জিজ্ঞেস করল।
"কিচ্ছু খাব না আমি", দুমদুম করে ঘরে চলে গেল সে।
অমিতাভ মুখ নামাল রোববারের পাতায়।
"তোমাকে দেব তো?"
"দাও।"
"ওর প্লেটটাও নাও বরং। ওর ঘরে গিয়েই খাও দু'জনে আর বাকি কথাগুলোও শেষ করে নাও।"
"ডোন্ট ব্লেম হার, রুচি। এতটা ইনসেন্সিটিভ হয়ো না।"
"ব্লেম কেন দেব ওকে? আমার নিজেরই আক্ষেপ হচ্ছে, উনিশ বছরের মেয়েকে নিজের বন্ধু করে তুলতে পারিনি।"

২

সবুজ ঘাসে ঢাকা একটা বিশাল মাঠের ধার ঘেঁষে বেড়ার মতো করে ক্যালেন্ডুলার বেড। ঘন নীল আকাশে ভেসে বেড়ানো সাদা ক্যান্ডি ফ্লসের মেলা। একটা ঝকঝকে সকাল। প্রজাপতির ঝাঁকের পিছনে ছুটে বেড়াচ্ছে যে, তার গায়ে হালকা গোলাপি আর পেস্তা সবুজ মিলিয়ে হানিকম্ব ডিজ়াইনের সোয়েটার। তাকে ধরতে গিয়ে হাল ছেড়ে বসে পড়ল রুচিরা। উফ, এত ছুটোছুটি এখন আর পারা যায়! বেতের বাস্কেট থেকে আখরোট আর কমলালেবু বার করে রাখতেই কোথা থেকে ছুটে এল দু'টো কাঠবেড়ালি। একটু আখরোট ওদের দিকে ছুড়ে দিল রুচিরা। কী সুন্দর হাত দিয়ে ধরে কুটকুট করে খাচ্ছে দেখো! এমন সময় কাঁধের কাছে আলতো ছোঁয়া। এক মাথা রেশমি চুলের ঘ্রাণে চোখ বুজে আসে রুচিরার। প্রতিবার এইখানে এসে ঘুম ভেঙে যায় ওর। মন ভার হয়ে আসে। আর একটু বেশি তো হলে পারে। আর একটু ওকে জড়িয়ে থাকা। আদরে আদরে ভরে দিতে ইচ্ছে করে যে।

"ভাল করে ভেবে দেখেছিস তো, রুচি? আমার নিজের বোন। আমি পারলাম না এত বড় রিস্ক নিতে।"
"আমার কোনও সমস্যা নেই, সেটা তো আমি অনেকবারই বলেছি তোকে এবং ওদেরও। আর এই নিয়ে কোনও দ্বিধা বিন্দুমাত্র নেই আমার মনে।"
"কীভাবে যে তোকে ধন্যবাদ দেব..."
"প্লিজ় সুমি, এই বস্তাপচা ডায়লগের ঝুড়ি খুলে বসিস না আর। আমি রাখছি রে এখন।"
"রাখ। ভাল থাকিস।"

ফোনের শব্দে তড়িঘড়ি স্নানঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিল রুচিরা। মাথাটাও ভাল করে মোছা হয়নি। দ্রুত হাতে অল্প করে ব্লো ড্রাই চালিয়ে নিল। এই গরমে চুল না বেঁধে বেরনোর উপায়ই নেই। একটা বাজে প্রায়। মনে মনে হিসেব করে নিল, আর আধ ঘণ্টার মধ্যে বেরতে পারলেই আরামসে আড়াইটেতে পৌঁছে যাবে। ঊর্মি আর সঞ্জয় ওই সময়েই আসবে বলেছে। ঘিয়ে আর মেরুনের কলমকারিতে গ্রীষ্ম দুপুরের সাজ কমপ্লিট করে ব্যাগ নিয়ে রওনা হতে গেল রুচিরা। দরজা অবধি গিয়ে আবার ফিরে এল। একটা ছোট্ট মেরুন টিপ পরলো দুই ভ্রু এর মাঝে।

দুপুরের খাওয়া সেরে শব্দছক নিয়ে বসেছিলেন দীপ্তি। দরজার আওয়াজে মুখ তুলে তাকালেন।
"আমি বেরোচ্ছি মা। ইমনের জন্য চাউমিন করে রেখেছি। একটু গরম করে দিলেই হবে।"
কিছু না বলে আবার কাগজে মুখ নামালেন দীপ্তি। একটু দাঁড়িয়ে দরজা টেনে বেরিয়ে পড়ল রুচিরা।

গড়িয়াহাটের সিগনালটা ঠিক খেয়েই গেল ট্যাক্সিটা। হাতে অনেকটাই সময় আছে অবশ্য। ফুটপাথে জোর দরাদরি চলছে বেডকভার, বালিশের ওয়ার, কুশন কভারের স্টলে। ওরই বয়সের দু'জন মহিলা। একবার চলে যাচ্ছে, হকারের ডাকে আবার ফিরে আসছে। হাসি এল ওর। এত মেহনত করে যে ঘর সাজাবেন ম্যাডাম, তা ঠিক কতটা আপনার নিজের? কতটা আপন? অনেকটাই কি নিয়মমাফিক পারিপাট্য বজায় রাখা নয়? সংসার আর তার সবকিছুকে, সবাইকে নিরন্তর সুচারু-শোভন রাখতে রাখতে নিজের একেবারে আপনার কোণটা ধূলিমলিন হয়ে পড়েছে, তার খোঁজ রাখা হয় কি? সমস্ত সম্পর্কের দায়িত্ব, ভালবাসা, টানের বাইরে একদম যে নিজের 'আমি'টা, তাকে ভালবাসার ফুরসত মেলে কই? ইচ্ছেডানা আর একমুঠো আকাশ—কবেকার ভুলে যাওয়া স্বপ্নের সেপিয়া টোন হয়েই থেকে যায় না কি শেষমেষ? অভিযোজন করে চলার এমন নিদর্শনের কথা ডারউইন সাহেবের ভাবনাতেও কি ছিল? মুঠোর মধ্যে ধরে রাখা ফোনটা হঠাৎ কেঁপে উঠতে হাবিজাবি ভাবনায় ছেদ পড়ল। ট্যাক্সিও চলতে শুরু করেছে।
"রুচিদি, আমরা এসে গেছি। তুমি কদ্দুর?"

৩

"Life is like a movie… keep believing, keep pretending"

ফ্লাইওভার দিয়ে আসার পথে আশপাশের চৌখুপি ফ্ল্যাটগুলো দেখতে দেখতে রুচিরা ভাবছিল কেমন দিব্যি চলছে ছকবাঁধা এই জীবনপালা। ওর নিজের জীবনই বা ব্যতিক্রম কই? ব্যতিক্রমী হওয়ার মেরুদণ্ডেই বাত ধরে গেছে।

বন্ধ দরজার বাইরে থেকে শুনতে পেল রুচিরা, "হোয়্যার হ্যাভ ইউ বিন, অল মাই লাইফ।" ফুল ভলিউমে মিউজ়িক সিস্টেম চলছে তার মেয়ের ঘরে। এত জোরে শব্দ ঘোরতর অপছন্দ রুচিরার সেটা খুব ভাল করেই জানে সে। ইচ্ছে করেই কথা না শোনা এগুলো। কিছু না বলে নিজের ঘরে ঢুকল ও। বিছানায় ফাইলপত্তর ছড়িয়ে কাজ করছে অমিতাভ। পাশে কাপ ভর্তি চা। কতক্ষণ পড়ে আছে কে জানে।
"তুমি কতক্ষণ এসেছ? চা ঠান্ডা হয়ে গেছে মনে হয়। আর এক কাপ করে দি?"
"আমার তো হঠাৎ করে নতুন কিছু এনগেজমেন্ট এসে পড়েনি।



ফুল ভলিউমে মিউজ়িক সিস্টেম চলছে তার মেয়ের ঘরে। এত জোরে শব্দ ঘোরতর অপছন্দ রুচিরার সেটা খুব ভালো করেই জানে সে।

স্বাভাবিক যে সময় বাড়ি ফেরার, তাই ফিরেছি।"
"বুঝলাম, বাবা। চা নিয়ে আসি।"
"না থাক। তার আর দরকার নেই।"
কথা না বাড়িয়ে বাথরুমের দিকে পা বাড়াল রুচিরা। ঠান্ডা জলে কয়েক ফোঁটা ল্যাভেন্ডারের তেল মেশাল। আহ...মাথা থেকে পায়ে নেমে আসতে লাগল সুগন্ধি জলের ধারা। সব ক্লান্তি, সব ভাবনা, গ্লানি ধুয়ে মুছে যাক। একটা টাটকা মানুষ হয়ে ওঠা দরকার এখন।

"মিসেস সেনগুপ্ত, ওয়েল, আই অ্যাপ্রিশিয়েট ইওর কাইন্ড জেশ্চার। তবে কী, এটা কিন্তু খুবই সিরিয়াস একটা ইস্যু। আপনার স্বামী, পরিবারের অন্যান্যরা কেউই রাজি নন বলছেন। শেষ পর্যন্ত আপনার মতামত অন্যরকম হবে না, সেটাই ধরব তো? এটা শিওর হয়ে নেওয়া খুবই দরকার। তাছাড়া একটা লিগ্যাল পার্টও আছে। ইট'স লাইক আ কন্ট্র্যাক্ট, ইউ মাস্ট নো।"
একটানা কথাগুলো বলে একটু থামলেন ডা. কাপুর, "মিসেস সেনগুপ্ত, আর ইউ লিসনিং?"
সম্বিত ফিরে পেয়ে একটু থতমত খেল রুচিরা। তিন জোড়া চোখ ওর দিকে উদগ্রীব দৃষ্টিতে তাকিয়ে।
"আমি আমার সিদ্ধান্তে স্থির। নিজের দায়িত্ব নেওয়ার মতো বয়স আমার নিশ্চয়ই হয়েছে, আপনি মানবেন, তাই না ডাক্তারবাবু? যা কিছু কাগজপত্র লাগবে, তাতে আমিই সই করব।"
"ওয়েল, ইউ সাউন্ড এক্সট্রিমলি কনফিডেন্ট। দ্যাট'স গুড। মাই সেশনস আর ওভার। এর পরদিন বাকি স্টেপগুলো বুঝিয়ে দেওয়া হবে। লিগ্যাল কনসালন্ট্যান্টও থাকবেন। মিনটাইম, আপনি আর একবার চেষ্টা করে দেখুন না, আপনার হাজ়ব্যান্ডের কনসেন্টটা পান যদি, খুবই ভাল হয়।"

আকাশটা লাল হয়ে আছে। বৃষ্টি বাদলা আসবে হয়তো। হালকা হাওয়ায় কৃষ্ণচূড়ার পাতাগুলো ঝুরঝুর করে ঝরে পড়ছে রাস্তায়। বিয়ের দিন ছিল আজ। দূর থেকে ভেসে আসা সানাই ভালো করে শুনে বোঝার চেষ্টা করলো রুচিরা। মধুবন্তী বাজছে। শেষ সন্ধ্যারাগের মনখারাপিয়া বাতাসের পাখনা মেলে ছড়িয়ে পড়ছে দূর থেকে কাছে। কতদিন গান গাওয়া হয়নি, মনে করতে পারে না রুচিরা।

"তাহলে ফাইনাল ডিসিশন নিয়েই ফেললে?"
অমিতাভ কখন এসে দাঁড়িয়েছে বারান্দায়, খেয়ালই করেনি।
"আমাদের কথা একবারও ভাবলে না রুচি?"
জোরে শ্বাস নিল রুচিরা।
"এতগুলো বছর তো ভাবলাম তোমাদের কথাই। শুধুই তোমাদের ভাললাগা, খারাপ লাগা। এবার একটু নিজেরটাও শুনি। প্লিজ়, এটুকু সুযোগ আমাকে দাও।"
"স্বার্থপরের মত কথা বলছ। আমাদের ভাললাগায় তোমার ভাললাগা জড়ায়নি কি কখনও? কোন জিনিসটা বাদ রেখেছি বলো। সুখে থাকা বলতে যা বোঝায় সবই তো দিয়েছি যথাসাধ্য। ফুটফুটে একটা মেয়ে রয়েছে। তবুও কী অতৃপ্তি তোমার এত যার জন্য এই বয়সে এসে এমন একটা কাজ করতে চলেছ তুমি?"

৪

"এসো এসো যদি কভু সুসময়/ নিয়ে আসে তার ভরা সঞ্চয়, চিরনবীনের যদি ঘটে জয় / সাজি ভরা হয় ধন/ নিয়ো না, নিয়ো না মোর পরিচয় / এ ছায়ার আবরণে / অবেলায় যদি এসেছ আমার বনে..."

নিমগ্ন হয়ে গান শুনছিল রুচিরা। কোনও নতুন শিল্পীর গলা। ওর শোনার জন্য সঞ্জয় এনে দিয়ে গেছে এসব।

"রুচিদি"... চোখ খুলতেই এক গোছা হলুদ গোলাপ হাতে উর্মি। শীর্ণ মেয়েটার চোখে মুখে আজ এক অন্য উদ্ভাস।
"কী মিষ্টি লাগছে রে তোকে!"
"তোর জন্য সারপ্রাইজ় আছে। দেখ তো কে এসেছে?"

কে এসেছে, অমিতাভ? ইমন? এক ঝলকা ভাবনাগুলো এসেই চলে গেল। দরজার দিকে তাকিয়ে আনন্দে বিহ্বল হয়ে গেল রুচিরা।

"বড়মা, তুমি? তুমি এসেছ!"

"কেন রে? আমি কোন এমন মঙ্গলগ্রহে থাকি যে আসতে পারি না। আর তোরা যতই বল, অত অথর্ব করে রাখতে আমাকে মোটেই পারবি না।"

পঁচাত্তরের বৃদ্ধা নিজের কোলে টেনে নিলেন রুচিরার মাথা। আঙুলগুলো বিলি কাটতে লাগল ওর চুলে।

"ওই দেখো, কাঁদিস কেন বোকা মেয়ে? আজ তো আনন্দের দিন রে মা। কালই তো ছেড়ে দেবে শুনছি। আমি কিছুদিন থাকব তোর কাছে?"

বিনা নোটিশে আচমকাই একদিন বাবা চলে গেলেন যখন, রুচিরার বয়স তিন, রুমকির দশ। বটগাছের মতন ছায়া দিলেন জেঠু আর মায়া দিলেন বড়মা। ঘটনার আকস্মিকতায় ভেঙে পড়েছিলেন ওদের মা। শরীরও তাঁর চিররুগ্ন ছিল। বছর ঘুরতে না ঘুরতেই তিনিও ছবির ফ্রেমে নিজের জায়গা করে নিলেন। জামশেদপুরে নিয়ে এসে এই দু'টি মেয়েকে নিজের সন্তানদের সঙ্গে বড় করে তুলেছেন বিজন আর প্রমীলা দত্তগুপ্ত। তাদের পড়ানো, নাচ-গান-রান্নাবান্না-ঘরের কাজ সব শিখিয়ে সুপাত্রস্থ করা পর্যন্ত সবই অত্যন্ত মমতায় নিঁখুতভাবে সামলেছেন তাঁরা। ওঁদের বড় মেয়ে শর্মির সঙ্গে রুমকি, রুচিরার সন্তান হওয়ার পরে বাপের বাড়ির দিকের যাবতীয় লৌকিকতা, কর্তব্য কোনও কিছুতেই ত্রুটি রাখেননি ওঁরা। বছরখানেক আগে এক দুশ্চিন্তা নিয়ে ঘুমের মধ্যেই চিরঘুমের দেশে চলে গেছেন বিজন। অনেক চিকিৎসা, ডাক্তার, কবিরাজি, আয়ুর্বেদিক করেও কিছুতেই মা হতে পারছিল না ওঁদের ছোট মেয়ে উর্মি। ডিপ্রেশন থেকে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছিল। অনেক ছোট বোনটার সবচেয়ে কাছে থাকত রুচিরাই। মেয়েটার মুখের দিকে তাকানো যেত না। কিছু একটা করে ওকে একটু আনন্দ দেওয়াটা নিজের দায়িত্বই মনে হতো রুচিরার। এইরকম একটা সময়ই আর্টিকলটা চোখে পড়েছিল ওর—'আনন্দ— দ্য স্ট্রিম অফ এনডিওরেন্স।' ঠিকানা জোগাড় করে নিজেই চলে গিয়েছিল। তার পরের সিদ্ধান্ত নিতে খুব বেশি দেরি লাগেনি।

ব্লেন্ডারে দুধ, ময়দা, ডিমের কুসুম মিশিয়ে ব্যাটার তৈরি করছিল রুচিরা। ভ্যানিলা ফ্লেভারের ঘরে বানানো কেক খুব প্রিয় ইমনের। স্টাডি লিভ চলছে এখন। বাড়ি থাকলেই তো খাওয়া নিয়ে হাজার বায়না। কেক বানিয়ে রেখে দিলে ক'দিনের জন্য নিশ্চিন্তি। এসেন্সের শিশিটা আনার জন্য উঠতেই আচমকা পৃথিবী দুলে উঠল যেন। কোনওক্রমে চেয়ার ধরে নিজেকে সামলাল রুচিরা। আনন্দ আর উৎকণ্ঠার দিন তাহলে এসেই গেল!

"হেন্সফোর্থ দুটো টার্ম ইউজ় করব আমরা, 'ইনটেন্ডেড মাদার' অর্থাৎ যিনি জিনগত মা এবং 'সারোগেট মাদার' অর্থাৎ 'বিকল্প মা'।"

বুঝিয়ে বলছিলেন ডা. সপ্তর্ষি অগ্নিহোত্রী, আনন্দ-এর চিফ মেডিকাল অফিসার। "সারোগেট মাকে কিছু ওষুধ খেতে হবে ইনটেন্ডেড মায়ের সঙ্গে তাঁর ঋতুচক্রের অ্যালাইনমেন্টের জন্য। সাধারণভাবে তিনরকম ওষুধ চলবে। একটিতে তাঁর নিজস্ব ওভ্যুলেশনকে সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা হবে, আর একটি তাঁর শরীরকে প্রস্তুত করে তুলবে আসন্ন মাতৃত্বের জন্য। অন্যটি যত্ন নেবে নতুন প্রাণটির সার্বিক ভাল থাকার উদ্দেশ্যে। নিয়মিত রক্ত ও আলট্রাসাউন্ড টেস্ট-এর মাধ্যমে আমরা দেখব কীভাবে তাঁর শরীর তৈরি হচ্ছে এক নতুন সম্ভাবনার জন্য। নির্দিষ্ট সময়ে অন্য মায়ের শরীর থেকে বিশেষ সিরিঞ্জের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হবে নিষিক্ত ভ্রূণটিকে এবং প্রতিস্থাপিত করা হবে সারোগেট মায়ের জরায়ুতে। সামান্য কয়েক ঘণ্টার ব্যাপার। শরীরের অবস্থা বুঝে আমরা সারোগেট মাকে দু'-চারদিন বেড রেস্ট রেকমেন্ড করি। তারপরই তিনি তাঁর স্বাভাবিক কাজকর্মে ফিরে যেতে পারেন। আ সাকসেসফুল প্রেগন্যান্সি ক্যান বি কনফার্মড ইন টু উইকস।"

অদ্ভুত এক উত্তেজনা টের পাচ্ছিল রুচিরা। গায়ে কাঁটা দিচ্ছিল ওর। প্রায় ভুলতেই বসা কোনও শিহরণ খেলা করে যাচ্ছিল ওর রক্তধারায়। আবার মা হবে ও, হলই না হয় 'বিকল্প।'

৫

"আর ইউ ক্রেজ়ি, মা! মাথা টাথা খারাপ হয়ে গেছে?"

ইমনের মুখভঙ্গি দেখে ঠাস করে একটা চড় মারতে ইচ্ছে করল রুচিরার। টেবিলের উলটো দিকে অমিতাভর চোয়াল শক্ত। বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে আছেন দীপ্তি।

"তুমি আন্দাজ করতে পারছ এর ইমপ্লিকেশনগুলো? আমরা সমাজে বাস করি রুচি। তুমি হঠাৎ করে এরকম একটা কথা ভাবলেই বা কীভাবে? আমার মতামত নেওয়ার কথা একবার মনেও এল না তোমার?"

"নিচ্ছি তো। এই যে, সকলের সামনে কথাটা বললাম তো সেই কারণেই। নাকি বলছ কী ভাবব, সেটা ভাবারও আগে তোমার পারমিশন নিতে হবে আমাকে?"

"বাজে তর্ক কোরো না। তুমি এটা করতে পারছ না, অ্যাজ় সিম্পল অ্যাজ় দ্যাট"।

"কারণটা ঠিক কী?"

"এসব নিয়ে পাঁচজনে পাঁচকথা বলবে না ভেবেছ? আত্মীয়স্বজন, পাড়া প্রতিবেশী...হাজারটা মন্তব্য। কেন, কেন এসব শুনতে যাব আমি, আমরা? আমাদের লাইফে তো কোনও প্রবলেম নেই। যেচে বাঁশ নেওয়া বলে একে।"

"আর আমার ইচ্ছে? আমার কমিটমেন্ট? কোনও দাম নেই তার?"

"কে বলেছে তোমাকে কমিট করতে? তুমি পাগলের মতো ইচ্ছে করবে, আর তাতে মত দিতেই হবে? ওহ্ মা, তুমি সত্যিই গন কেস।"

"ইমন?"

"ওকে ধমকাচ্ছ কেন? ভুলটা কী বলেছে ও?"

"মা, আপনার কিছু বলার আছে কী?"

"আমি আর কী বলব। বলেই বা লাভটা কী!"

"আজ এতগুলো বছর আপনাদের অনেক কথাই তো শুনে আছি। লাভ যে কখনওই হয়নি সেটা বলবেন না নিশ্চয়ই।"

"মাকে এর মধ্যে জড়িয়ো না। মনে হয় তুমি আমাদের মতামতটা খুব পরিষ্কার করেই জানলে। এই আলোচনার এখানেই ইতি।"

"ঠিক। আলোচনার এখানেই ইতি। আলোচনার আর দরকার

নেই। আমার যা করবার আমি সেটাই করব।"

"মিসেস সেনগুপ্তা, কাম ইনসাইড, প্লিজ়।"
আকাশি এপ্রনে দক্ষিণী সোনোগ্রাফার মেয়েটি হাসিমুখে উর্মিকে জিজ্ঞেস করল, "আর ইউ অ্যাওয়ার, মিসেস রয়, হোয়াট ইজ় গোয়িং টু হ্যাপন নাউ?"
কাপলিং জেল মাখতে মাখতে রুচিরা দেখল ওড়নার খুঁটটা মুঠোর মধ্যে চেপে ধরে আছে উর্মি।
"রিল্যাক্স মিসেস সেনগুপ্তা, ব্রিদিং নরমাল রাখবেন, কেমন?"
মুহূর্তের স্তব্ধতা। তারপর সেই শব্দ। দপ্ দপ্ দপ্ দপ্...অতি দ্রুত কাজ করছে একটা ছোট্ট হৃদয়। অনেক অনেক পথ যে সামনে, আলোর দিকে।
"ইট'স বিটিং। ক্যান ইউ হিয়ার ইট, মমস। ওহ হোয়াট আ লাকি বেবি ইউ আর, মাই ডার্লিং। দু'-দু'টো মা।"
সঞ্জয়ও এসে গেছে । চোখে মুখে আনন্দ উত্তেজনার বিন্দু বিন্দু ঘাম।
প্রাণ ভরে নিঃশ্বাস নিল রুচিরা।

ইমনের ঘরের দরজা খুলেই পাগল হয়ে যাওয়ার জোগাড়। কী অবস্থা করে রেখেছে ঘরটার! বেশ কিছুদিন আসা হয়নি এঘরে। বাড়িতে থাকলে এখন বেশিরভাগটাই দরজা বন্ধ করে রাখে মেয়ে। বেডকভারের অর্ধেক মাটিতে পড়ে আছে। পড়ার টেবিলের উপর ট্রেতে কফির কাপ উলটে রয়েছে। বিছানায় গড়াগড়ি যাচ্ছে ক্যামেরা, ডিও স্প্রে, মোবাইল চার্জার, জলের বোতল। একটা অদ্ভুত স্টিংকিং স্মেল। গা গুলিয়ে উঠল যেন। জানলা খুলে দিয়ে, বেডকভারটা টান দিতেই স্তম্ভিত হয়ে গেল রুচিরা। সেই সময়ই অ্যাটাচড বাথ থেকে বেরিয়ে এল ইমন। কয়েক সেকেন্ডের জন্য ফ্যাকাশে হয়ে যাওয়া মুখটা চোখ এড়াল না রুচিরার।
"হোয়াট ইজ় দিজ়? আমার জিনিসপত্রে হাত দিচ্ছ কেন তুমি? কোনও দরকার নেই। থ্যাঙ্কস আ লট।"
"ইমন, তুই! তুই স্মোক করছিস!"
"ইয়াহ। করছি। সো? তুমি তোমার যা খুশি করতে পারো। আমি পারি না?"
জীবনে প্রথমবার নিজেকে সংযত করতে পারল না রুচিরা।
" মা!!!" গাল চেপে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল ইমন।

৬

কয়েকটা দিন ধরে শরীরটা একেবারেই বশে নেই রুচিরার। মর্নিং সিকনেস তো আছেই, সারাদিন ধরেই অসম্ভব ক্লান্তি একটা। বড়মা ফিরে যাওয়ার সময় অনেক করে বলেছিলেন ওঁর সঙ্গে গিয়ে কয়েকটা দিন থেকে আসতে জামশেদপুরে। সেটা কি আর সম্ভব হয়! ইমনের পরীক্ষা, অমিতাভর অফিস, সংসারের আরও হাজারটা দায়িত্ব শাশুড়ি আর কাজের লোকের উপর ফেলে বাপের বাড়ির আহ্লাদ খাওয়ার বয়স আর এখন নেই। স্নানের পরে বিছানায় এলিয়ে ছিল রুচিরা। অনেকক্ষণ থেকেই রান্নাঘরে কীসব খুটখাট করছেন দীপ্তি। এমনিতে পারতপক্ষে রান্নাঘরের চৌকাঠ মাড়াতে চান না তিনি। কী করছেন কে জানে। ওহ, একটু আগে তো অলি ফোন করেছিল। আদরের মেয়ের কোনো ফরমাশ এসেছে বোধহয়। যাকগে, যা হোক করুন। রুচিরা বেডসাইড টেবিল থেকে আল্ট্রাসাউন্ডের রিপোর্টটা টেনে নিলো। চোখের সামনে তুলে ধরলো নীলচে কালো প্লেটটা। চৌকো চৌকো খোপে তার ইচ্ছেকুঁড়ি ফুটছে।
"এ এক দীর্ঘ যাত্রা, দ্য জার্নি টুওয়ার্ডস লাইফ। নিষিক্ত হওয়ার পরবর্তী ক্ষণ থেকেই প্রাণটির চলা শুরু। মায়ের ফ্যালোপিয়ান টিউবের পথে চারদিন ধরে সে আসে জরায়ুতে, যেখানে আগামী ন' মাস তাকে থাকতে হবে। পছন্দমতো একটা জায়গা বেছে নিয়ে ছয় থেকে সাতদিনের মধ্যে সেখানে পুরোপুরি প্রোথিত হয়ে যায় সে। শুরু হয় তার গড়ে ওঠা। হাড়, পেশি, রক্তনালী, চুল, দাঁত তৈরি হওয়ার কাজ শুরু হয়। শুরু হয় ফুসফুস ও হৃদযন্ত্র তৈরি হওয়ার কাজও। দ্য টাইনি হার্ট বিগিনস টু বিট বাই সিক্স উইকস। আপনারা তো শুনলেনই, তাই না? এবার আস্তে আস্তে তৈরি হবে হাত, পা, আঙুল। তৈরি হবে চোখের মণি, রেটিনা, চোখের পলক, কান। নয় সপ্তাহ থেকে সে তার শরীরের নানা অংশকে মুভ করাতে পারবে।"
গল্পের মতো বলছিলেন ডা. অগ্নিহোত্রী। ইমন আসার সময় এভাবে কিছুই জানা হয়নি, ভাবছিল রুচিরা।

"ও বউদি, না খেয়েই এই অবেলায় ঘুমিয়ে পড়লে নাকি? ওঠো ওঠো, খেতে যাও। মাসিমা ডাকছে।"
ডাইনিং টেবিলে অপেক্ষা করছেন দীপ্তি। খিদে তো পেয়েছে, কিন্তু মুখে কিচ্ছুই ভাল লাগছে না ওর। থালার দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেল রুচিরা। শিউলি পাতার বড়া আর সর্ষে দিয়ে কাঁচা টোম্যাটোর টক ঝাল চাটনি।
"মা, আপনি!"
"দেখছি তো রোজ ভাত নিয়ে নাড়াচাড়া করে উঠে পড়ছ। এসময় না খেলে চলবে?"
একটু আগের ভাবনার জন্য নিজেই লজ্জিত হল রুচিরা।
"খুব ভাল লাগছে মা। বড়া আর আছে?"

এতগুলো বছর হয়ে গেল, এই মানুষটির সঙ্গে তার সম্পর্কে একটা শীতলতা কোথায় যেন একটা রয়েই গেছে। কলকাতায় বিয়ে ঠিক হওয়ার সময় রুচিরার মনে অনেক ইচ্ছে ছিল। নিজে স্বাধীনভাবে কিছু উপার্জন করা, ক্ল্যাসিকাল মিউজ়িক নিয়ে আরও বেশি চর্চা এসবেরই সুযোগ পাবে ভেবেছিল। কিন্তু সে প্রস্তাবে অমিতাভ বা তার মা, কেউই খুব একটা সায় দেননি। চাকরিবাকরি করার কষ্ট নেওয়ার কোনও প্রয়োজন নেই, বরং ভালভাবে সংসার করাও একটা সফল কেরিয়ার এই কথাই তাকে বুঝিয়ে দিয়েছে অমিতাভ। ওদের বাড়ির নীচটায় একটা পরিত্যক্ত গ্যারাজ ছিল। সেখানে একটা ছোট্ট ফুড জয়েন্ট করার ইচ্ছে ছিল রুচিরার। বাড়ির বউ খাবারের দোকান দেবে, দীপ্তির ঘোরতর অপছন্দ ছিল সেসব। একদিন হঠাৎই এসে গেল ইমন। তারপর থেকে তো জীবনটাই পালটে গেল ওর। ইমনের বেড়ে ওঠা, প্রিপ্রেটরি থেকে শুরু করে বড় স্কুলে ভর্তি, তার নানান অনুষঙ্গ, নাচ, সাঁতার, আঁকার ক্লাস এসবের সঙ্গে সংসারের আরও লতায়-পাতায় কেমন জড়িয়ে গেল সে, মাঝে মাঝে নিজেই ভেবে অবাক হত। কিন্তু কোথায় একটা অপূর্ণতা, একটা ফাঁকা ফাঁকা ভাব যেন থেকেই যেত। অমিতাভ তাকে যথেষ্টই ভালবেসেছে, সেও। দু'জনের কেউ কাউকে অসম্মানও করেনি কখনও। কিন্তু তবুও একটা আক্ষেপ, একটা দীর্ঘশ্বাস ওর পিছু ছাড়েনি। ইমনের স্কুল শুরু হওয়ার পরে দ্বিতীয় সন্তানের ইচ্ছা করেছিল রুচিরা। একেবারেই রাজি হয়নি

অমিতাভ। দিনের পর দিন গেছে। রুচি থেকে ক্রমশ মিসেস রুচিরা সেনগুপ্ত হয়ে উঠেছে ও। খোলা ছাদে বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে গলা ছেড়ে গেয়ে ওঠা টুকরো বন্দিশ, ডিসেম্বরের দুপুরে সুবর্ণরেখার ধারে পিকনিক করতে গিয়ে কলেজবন্ধুদের সঙ্গে চুটিয়ে ব্যাডমিন্টন খেলা, এরকম আরও কত কিছু এখনও মনে হয় গতজন্মের কথা। একটা জীবনে মেয়েদের যে কতবার জন্ম হয়!

সামনে ইমনের জন্মদিন। ওর জন্য একটা ভাল সালোয়ার কামিজ় কিনবে ভেবে রেখেছে রুচিরা। ডাক্তারের কাছে অ্যাপয়েন্টমেন্ট আরো ঘণ্টাখানেক পরে। কাছের শপিং মলটা একবার দেখে যাওয়া যায়। লেডিজ় সেকশনটা খুঁজতে খুঁজতে ওর চোখ আটকালো একটা জায়গায়। এইটুকুন টুকুন দুধসাদা জামা, ছোট ছোট গোলাপি ফুলকাটা। কী সুন্দর সুন্দর পুঁচকি পুঁচকি বালিশ। বাঃ এই বেবি কটটাও কি সুন্দর! সত্যি কতকিছুই যে পাওয়া যায় এখন। পরম মমতায় ছোট্ট ছোট্ট জিনিসগুলো ছুঁয়ে যাচ্ছিল রুচিরা।

“আরে রুচিরা! কী খবর কী, হ্যাঁ?” মিসেস দত্ত, অমিতাভর কলিগের স্ত্রী। কৌতুক মেশানো চাউনি রুচিরার পুরো শরীরটাকে জরিপ করে মধ্যাংশের স্ফীত অঞ্চলে এসে থামল, “এত ভাল খবরটা খুব লুকিয়ে রাখা হয়েছিল, না!”

৭

“এগারো সপ্তাহ থেকে ওর ফুসফুস কাজ করা শুরু করে। যদিও এখন ওর নিজস্ব শ্বাসকার্যের দরকার নেই, আপনার থেকেই ও অক্সিজেন পেয়ে আসছে, তবু ফুসফুস তার কাজ প্র্যাকটিস করা শুরু করে। বারো সপ্তাহ থেকে ও নিজের হাতের আঙুল খোলা বন্ধ করতে পারে। এখন আল্ট্রাসাউন্ডের সময় ওকে পরিষ্কার দেখতে পাওয়া যাবে। আস্তে আস্তে এবার তৈরি হবে ওর লিঙ্গ। সব চুল, আইল্যাশ, ভ্রূ তৈরির কাজ শেষ হবে। চতুর্থ মাস থেকে ওর শরীর নিজের রক্ত বানানো শুরু করবে। ষোলো থেকে আঠেরো সপ্তাহে ও পা নাড়া শুরু করবে, এবং মা সেটা টেরও পাবেন। এইসময় থেকে ও চোখ মেলে চাইবে। বত্রিশ সপ্তাহের মধ্যে ওর শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলি নিখুঁত হয়ে উঠবে। মায়ের রক্তসঞ্চালন ও হৃদস্পন্দনকে ছাপিয়ে বাইরের অন্যান্য আওয়াজও ও মৃদুভাবে শুনতে পাবে। আস্তে আস্তে মায়ের গলার স্বরকে আলাদা করে চিনতে পারবে ও”, তন্ময় হয়ে শুনছিলো রুচিরা। ঊর্মির মুখটা দেখে কষ্টই হল ওর। এই অনুভব বেচারির পাওয়াই হল না। নিজের ভিতরে একটা প্রাণের তিল তিল করে বেড়ে ওঠা, নিজের রক্ত শ্বাস প্রশ্বাস দিয়ে তাকে গড়ে তোলার তৃপ্তি, শুধু এই সুখের জন্যই আরও অনেকবার মেয়ে হয়ে জন্মাতে রাজি রুচিরা।
“গর্ভে থাকা বাচ্চা আঙুল চুষছে, এরকম একটা ছবি খুবই দেখতে পাওয়া যায়। এটা শুরু হয় ছাব্বিশ সপ্তাহ থেকে। ওর ব্রেনের কোষগুলি পুরোপুরি কাজ করতে শুরু করে। কাজ করতে শুরু করে ওর স্মৃতি, সংবেদনশীলতার উপযোগী নার্ভগুলি। বত্রিশ সপ্তাহের মধ্যেই সে অত্যন্ত অ্যাক্টিভ হয়ে ওঠে। দিনের মধ্যে যে কোনও সময়ই মা টের পাবেন তার দৌরাত্ম্য। রিসার্চ বলে, তেত্রিশ সপ্তাহের গর্ভস্থ বাচ্চা স্বপ্নও দেখে। যদিও কী সেই স্বপ্ন, সেটা হয়তো চিরকাল অজানাই থেকে যাবে। সাধারণভাবে ছত্রিশ সপ্তাহ থেকেই সে তৈরি হয়ে যায় বাইরের আলো দেখার জন্য।”

ক্লিনিক থেকে ফিরে শরীরটা খুবই খারাপ লাগছিল রুচিরার। এক কাপ গরম দুধ খেলো সে। সাতটা বাজে। ইমন ফেরেনি এখনও।



ক্লিনিক থেকে ফিরে শরীরটা খুবই খারাপ লাগছিল রুচিরার। এক কাপ গরম দুধ খেল সে। সাতটা বাজে। ইমন ফেরেনি এখনও। তার বাবাও নয়। নিজের ঘরে টিভি দেখছেন দীপ্তি। রুচিরা শুল টানটান হয়ে। সাথে সাথে মনে পড়ায় বাঁ পাশ ফিরে শুল ও। নিজের পেটের উপর আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল, “কেমন আছিস সোনা? তুই নাকি শুনতে পাস? পাচ্ছিস শুনতে আমার কথা? হ্যাঁরে, তুই কী বলে ডাকবি আমাকে? মাসি না অন্য মা?” ছোট্ট শরীরটা কি একটু নড়ে উঠল ওর কথা শুনে? ওকে ছুঁয়ে থাকতে থাকতে সুখে ভিজে যেতে লাগলো সে।

খুব ঘুমিয়ে পড়েছিল রুচিরা। এরা সব কখন ফিরেছে টেরই পায় নি। তড়িঘড়ি উঠতে গিয়ে সামলাল নিজেকে। ড্রয়িংরুমে বসে টিভি দেখছে বাবা মেয়ে। সামনের টেবিলে কফির কাপ, মুড়ির বাটি, চিপসের কৌটো।
“ইশ, তোমরা কখন এসেছ? কী খেলে?”
দু’জনের কেউই কোনও উত্তর দিল না। অমিতাভ উঠে শোওয়ার ঘরের দিকে চলে গেল।
রুচিরা বসল ইমনের পাশে।
“কোচিং থেকে ফিরতে লেট হল আজ? কলেজ থেকে বেরিয়ে খেয়েছিলি কিছু?”
“হ্যাঁ। খেয়েছিলাম। এগ রোল।”
“অত জাঙ্ক ফুড খাস না। এরপর তো ফ্যাট হয়ে গেছে বলে বাড়ির খাবার খাওয়া কমিয়ে দিবি।”
উড়িয়ে দেওয়ার মতো করে কাঁধ ঝাঁকালো ইমন। অন্য সময় হলে এক ধমক দিত রুচিরা।
“তোর জন্য একটা ড্রেস কিনেছি। চল দেখবি।”
“ড্রেস? হঠাৎ?”
“হঠাৎ আবার কী? জন্মদিন ভুলে গেলি?”
“ওহ। থ্যাংকস।”
“কথায় কথায় এই থ্যাংকস বলার আর্টিফিশিয়ালিটি ছাড় তো। চল দেখাই জামাটা।”
“পরে দেখব। তবে এবার বার্থডেতে আমি বন্ধুদের বাইরেই ট্রিট দেব। বাপি স্পনসর করবে, বলে দিয়েছে।”
“সে কী? কেন? আমি তো ঠিক করে রেখেছিলাম কাবাব বানাব। ওয়ালনাট কেকের সব কিছুও কিনে আনলাম। বাইরে কেন আবার?”
“না তো কী? আমার বন্ধুদের সামনে তুমি এত বড় পেট নিয়ে ঘুরে বেড়াবে আর আমি সবার ঠাট্টার পাত্রী হব? হুহ!”
ঠকাস করে রিমোটটা ফেলে দিয়ে উঠে গেল ইমন।

রাতে খাওয়ার পরে ঘরে এসে দেখল অমিতাভ শুয়ে পড়েছে। খুব গম্ভীর হয়ে আছে কোনও কারণে। কপালে হাত রাখল রুচিরা।
"কী হয়েছে গো? শরীর ঠিক আছে তোমার?"
এক ঝটকায় হাত সরিয়ে দিল অমিতাভ।
"আমার শরীরে আবার হবেটা কী? বিরক্ত কোরো না।"
"বিরক্ত কোথায় করলাম? জানতে চাইলাম কী হয়েছে। এভাবে কথা বলছ কেন?"
"নিজের বুদ্ধিতে যা করার করেছ। আমাদের কথা তো ভাবনি।



ফোন আনতে যেতে গিয়ে আয়নায় নিজের দিকে চোখ পড়ল রুচিরার। চোখের নীচে কয়েক পোঁচ গাঢ় কালি। রাতে ঘুম হচ্ছে না একদম।

এখন ন্যাকামি করে কী হয়েছে বলতে এসো না। তোমার এই চেহারাটা দেখতেই বিরক্ত লাগছে আমার।"
রুচিরার মাথাটা যেন ঘুরে গেল। খাটের উপর বসে পড়লো ও।
"ছিঃ ছিঃ যেসব লোকজন সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলার সাহস পায় না, আজ তোমার জন্য এক অফিস লোকের সামনে দাঁত বের করে হেসে মিষ্টি খেতে চেয়ে গেল। আমার এলেমের তারিফ করে গেল। আমি কাকে বলব, এ আমার নিজের বাচ্চা নয়। আমার বউ সমাজকল্যাণ করছেন, পরোপকার করছেন। সারোগেট মাদার হয়েছেন তিনি। নিজের গর্ভ ধার দিয়েছেন অন্যকে। ক'জন মানবে এটা? লোকে বলবে পরে কার না কার দায় নিতে হচ্ছে আমার। দোহাই তোমাকে, বাইরে বেরিয়ে আর লোক হাসিয়ো না।"
"উফ মা গো। থামো তুমি।"
তীব্র ব্যথায় গলা কেঁপে গেলো রুচিরার। ভিতরেরটা খুব জোরে পা ছুড়ল।
সিগারেট ধরাল অমিতাভ।
"প্লিজ় বাইরে গিয়ে খাও।"
"ডিসগাস্টিং" বলে ব্যালকনির দরজা ঠেলে বাইরে বেরিয়ে গেলো অমিতাভ।
স্তব্ধ হয়ে বসে রইল রুচিরা। আস্তে আস্তে উঠে ব্যাগ থেকে মোবাইল বের করে ডায়াল করল। যেকোনও সময় যেকোনও দরকারে ফোন করতে বলেছেন ডা. অগ্নিহোত্রী।

৮

সকাল থেকেই আজ ইমনের জন্য বড্ড মনটা খারাপ করছে রুচিরার। জন্মের পর থেকে এতদিন ওকে ছেড়ে থাকেনি সে। কী জানি কেমন আছে। ব্রেকফাস্ট স্কিপ করে হাবিজাবি খাচ্ছে হয়তো। এরপর পেট ব্যথায় কষ্ট পাবে। এই সপ্তাহে ওর ক্লাস টেস্টও তো ছিল একটা, কেমন হল কে জানে! একটা ফোন পর্যন্ত করেনি ওরা কেউ। এতটাই অন্যায় করেছে সে? ও নিজেই ফোন করবে ভাবলো একটা। কিন্তু বিছানা থেকে উঠতে আর পারছে না যেন।
একটা সপ্তাহ হল আনন্দ-তে অ্যাডমিটেড হয়ে রয়েছে ও। সেইরাতে বাবা-মেয়ে দু'জনের কথার পরেই আর বেশি কিছু ভাবনার দরকার ছিল না ওর। পরদিন ব্রেকফাস্ট টেবিলেই বলে দিয়েছিল যা বলার। অমিতাভ, ইমন বেরিয়ে যাওয়ার পর সেও জামাকাপড় গুছিয়ে নিয়ে বেরিয়ে এসেছিল।
অনেক সারোগেট মাদার পুরো প্রেগন্যান্সি পিরিয়ডটাই এখানে কাটান। আর্থ-সামাজিক নানারকম বাধাই থাকে অনেকের। ডা. অগ্নিহোত্রীর সঙ্গে তাঁর টিমের একঝাঁক কুশলী ডাক্তার-নার্স এঁদের দেখভাল করেন অত্যন্ত যত্নসহকারে।
সমস্ত শরীরটা অসম্ভব ভার। পুরো পেটটাই নীচের দিকে চলে এসেছে যেন। অনেক কষ্টে নিজেকে টেনে তুললো রুচিরা। ফোন আনতে যেতে গিয়ে আয়নায় নিজের দিকে চোখ পড়ল ওর। চোখের নীচে কয়েক পোঁচ গাঢ় কালি। রাতে ঘুম হচ্ছে না একদম। বারবার করে বাথরুমে উঠতে হচ্ছে। লিগামেন্টের ব্যথাও খুব। কেমন একটা কুঁজো হয়ে গেছে যেন, "দ্য নাম্বার ইউ আর কলিং ইজ় নট রিচেবল। প্লিজ় ট্রাই এগেন।"
আবার শুয়ে পড়ল রুচিরা। কাল থেকে ছোট্টটাও বড্ড নড়াচড়া করছে। হয়তো তর সইছে না আর। নিজের মায়ের কাছে যাওয়ার জন্য অস্থির হয়ে গেছে। এক অজানা কষ্টের আশঙ্কায় বুক কেঁপে উঠলো রুচিরার। কীভাবে...কীভাবে। পরক্ষণেই সামলাল নিজেকে। সবকিছু জেনেই তো পা বাড়িয়েছে সে। এখন এমন করলে হবে নাকি।

"মিসেস সেনগুপ্ত, এগুলো খেয়ে নিন। তারপর চলুন, লনে হাঁটবেন একটু?"
"নাঃ লনে আর যাব না। আমি এই করিডোর দিয়েই হেঁটে নেব।"
"ওকে। খেয়ে নিন এগুলো।"
আপেলকুচি, আঙুর, বেদানা আর কলা দিয়ে ফ্রুট স্যালাড বানিয়ে এনেছে মেয়েটি। ফলগুলো শেষ করে বারান্দা ধরে হাঁটতে থাকলো রুচিরা। আজকে শরীর মন দুটোই খুব বেশি অস্থির লাগছে যেন। হাঁটাচলা করতে বলেছেন ডাক্তারবাবু, কিন্তু আজ যেন আর পারছে না ও। একটু হেঁটে এসেই আবার শুয়ে পড়লো। বাইরে রোদ্দুর নিভে এলো। একটু পরেই ঊর্মি

আসবে। চোখ আর খুলে রাখতে পারছে না। কী যে ছাই হল! রাতে ঘুম আসে না, দিনের বেলা এ কী যে যন্ত্রণা রে বাবা। লম্বা বারান্দার একেবারে শেষপ্রান্তে ওর ঘর। দরজার দিকে পিঠ করেই শুয়ে শুয়ে ও শুনতে পেলো উর্মির পায়ের আওয়াজ।
"আয়।"
"মা!"
চমকে ঘাড় ঘোরাতে দেখলো দরজায় ইমন।
"ইমন! তুই!"
প্রায় ছুটেই এসে মায়ের বুকে মুখ গুঁজে দিলো ইমন। ওর মাথায় গভীর চুমু দিলো রুচিরা।
"অ্যাম সো সরি, মা। মিসিং ইউ ব্যাডলি।"
"পাগলি কোথাকার। এই তো ক'টা দিন পরেই ফিরে যাব।" তোকে না বকুনি দিতে পেরে আমারও ভাল লাগছে নাকি?"
"জানো ঈশিতা, রূপসা, পায়েল আর আরো সব্বাই তোমাকে মিট করতে চায়। দে আর সো এক্সাইটেড!"
"সে কী রে! তোর এই বাজে মা'টা সাডেনলি এতো ফেমাস হয়ে গেলো কী করে?"
"লাভ ইউ মা। প্রাউড অফ ইউ।"
"ছাড় ছাড়। বন্ধুদের কথায় এখন প্রাউড অফ ইউ, না?"
"মা প্লিজ়, আর টিজ় করো না। হাউ ইজ় দ্য বেবি?"

ঘরে ঢুকতে ঢুকতে উর্মি দেখলো মা মেয়েতে খুব গল্প জমেছে।

আজ একদম খেতেই ইচ্ছে করছে না কিছু। স্যুপটাই শুধু খেল রুচিরা। ঘুম আসছে দেখে শুয়েও পড়ল। পেটে কেমন একটা ব্যথা মতো। এসময় খুবই কমন এ জিনিস। ডিপ ব্রিদ করলো ও। নাহ, ব্যাক পেইনও হচ্ছে খুব। না পারছে চিৎ হতে, না পারছে পাশ ফিরতে। "বড্ড জ্বালাচ্ছিস তো দুষ্টুটা," ফিসফিস করে বললো রুচিরা। ইমনের সময় এত কিছু সমস্যাই হয়নি, প্ল্যানড সিজ়ারিয়ান বেবি। অস্থির লাগছে, উঠে জল খেল ও। দুটো বাজে। বারান্দায় এল। সুন্দর একটা হাওয়া দিচ্ছে। কিন্তু না অস্বস্তি লাগছে। বিছানায় এসে বালিশ উঁচু করে আধশোয়া হলো। আর ঠিক তক্ষুনিই, অসহ্য ব্যাথায় চোখে অন্ধকার দেখলো যেন। কোনোক্রমে ইন্টারকম তুলল ও।

"মিসেস সেনগুপ্ত, একটা ইঞ্জেকশন দেব আপনাকে। এপিডুরাল, দেখবেন কষ্ট কম হবে। সোজা হয়ে একটু বসুন প্লিজ়।"
পুরো শরীরটা যেন ভেঙেচুরে চলে আসছে ওর। নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে যেন। এই ব্যথাকে কীভাবে অন্যের ভাববে রুচিরা? কোনোক্রমে উঠে সোজা হয়ে বসল ও।
"পা টা ঝুলিয়ে দিন। শরীরটা রিল্যাক্স করুন, মেরুদণ্ডের নীচে প্রবেশ করল ব্যথানিবারণী সূঁচ, "শুয়ে পড়ুন এবার।" অক্সিজেন মাস্ক পড়ানো হল ওকে। আগেই চালানো হয়েছে স্যালাইন।
দাঁতে দাঁত চেপে রাখল রুচিরা। পেটের পেশিতে অদ্ভুত সঞ্চালন। তোলপাড় সারা শরীর জুড়ে।
"পুশ করুন, পুশ করুন, মিসেস সেনগুপ্ত, বি স্টেডি। পৃথিবীর সবচেয়ে ভাল কাজটা করতে চলেছেন আপনি। আরও আরও, কাম অন, ভয় পাবেন না, পুশ করুন।"
চোখে অন্ধকার। এ বোধহয় ব্যথার চেয়েও তীব্র কোনও বোধ। চোখের জলে গাল, চুল ভিজে একসা ওর।
"এই তো এই তো, মিসেস সেনগুপ্ত, আর একটু, প্লিজ়। কাম, প্লিজ় কাম মাই ডিয়ার। ওয়েলকাম, ওয়েলকাম!"
সারা ওয়ার্ড জুড়ে ছড়িয়ে পড়লো সুতীক্ষ্ণ কান্না। শরীরটা আর আছে বলে মনে হচ্ছে না রুচিরার।
"লুক অ্যাট ইওর বয়, মিসেস সেনগুপ্ত। দেখুন দুষ্টু ছেলেটাকে।"
লাল টকটকে একরত্তি একতাল স্বপ্ন আর ইচ্ছে, পা ছুড়ছে প্রবল বিদ্রোহে। ঘামে আর ক্লান্তিভেজা শরীরটাকে অল্প টেনে একটু উঠে বসার চেষ্টা করলো ও। না, পারল না। ওই অবস্থাতেই হাত বাড়াল। ছোট্ট হাতের ছোট্ট আঙুল নিজের রক্তের ঘ্রাণ পেলো ও। হাতটা একবার ছুঁয়ে আবার শুয়ে পড়লো ও। বাইরে আকাশ মহা সমারোহে সাজছে, নতুন সূর্যোদয়ের লগ্ন সমাগত।
ঘুম, বড্ড ঘুম আসছে ওর। কেবিনের বেডটা উঁচু করে দিল নার্স মেয়েটি।

"নিন, ধরুন" হাসিমুখে ওর দিকে বাড়িয়ে দিল তোয়ালের মোড়কটাকে। পিটপিট করে তাকিয়ে আছে দুটো এত্তটুকুন চোখ। কোলে নিতেই শরীর পাকিয়ে কেঁদে উঠল। বাঁ কোলে মাথাটা নিয়ে ওর মুখে প্রথম অমৃতের স্বাদ দিল রুচিরা। বেঁচে থাক, সুস্থ সুন্দর একটা সত্যিকারের মানুষ হয়ে ওঠ।

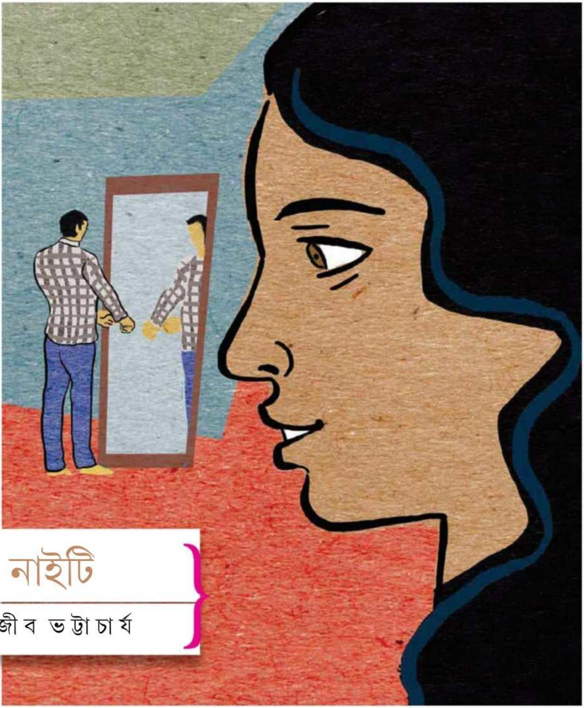
কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল টেরই পায়নি। ঘুম ভাঙতে দেখল ওর পাশে বেবিকট ধরে ঝুঁকে আছে নতুন বাবা-মা।
"উর্মি।"
"রুচিদি" ওকে জড়িয়ে কেঁদে ফেললো উর্মি, "ও কিন্তু তোরই"।
উঠে বসলো রুচিরা, "তাই? সত্যি? দিয়ে দিবি আমাকে?"
চমকে ফিরে তাকাল সঞ্জয়। রুচিরার দুই হাতের মধ্যে উর্মির শরীরও কি শক্ত হল একটু?
"বোকা মেয়ে। আমার আবার কী রে? তোদেরই তো। আমার কাজ শেষ, এবার তোদের। কনগ্র্যাচুলেশনস আর অল দ্য বেস্ট", উর্মির কপালে চুমু এঁকে চোখ ভরা গ্রীষ্ম নিয়ে পাশ ফিরল ও।

মাঝরাতে একটা অস্বস্তি নিয়ে ঘুম ভাঙলো। শরীরের স্বাভাবিক নিয়মে রাতপোশাক ভিজে চুপ্পুস। বুকের মধ্যে টনটনে ব্যথা। বারান্দায় এসে দাঁড়ালো ও। পেটের উপর হাতের তালু ছুঁয়ে আজ সাতদিন পরে প্রথম কান্না এল ওর পুরো শরীর, মন, সত্তা নিঙড়ে। চিৎকার করতে চাইল ও। গলা দিয়ে আওয়াজ বেরলো না। বারান্দার রেলিং ধরে বসে পড়ল ।

কাঁধে হাতের ছোঁয়া, "ঘরে চলো, রেস্ট আর ঘুম দরকার তোমার, রুচি"।

হ্যাঁ ঘুম, ঘুমই তো দরকার। আবার ফিরতে হবে ক্যালেন্ডুলার বাগানে। হানিকম্ব সোয়েটারের দুষ্টু প্রজাপতিটা একটুর জন্য হাত ফসকে পালিয়ে গেল। এবার ওকে ধরতেই হবে দু'হাতের মাঝখানে, বুকের কোণটায়।

অলংকরণ: তারকনাথ মুখোপাধ্যায়



নাইটি

রা জী ব ভ ট্টা চা র্য

নতুন কেনা জিনসের প্যান্টটা কোমরে টেনে ধরে প্রশ্ন করে অবিনাশ, "প্যান্টটা বেশি চাপা হয়ে গেছে। এটা পরে স্কুল যাওয়া কি ঠিক হবে?"

ব্যাগের ভেতর টিফিন ভরছিল যোগেশ্বরী। ব্যাগ হাতে নিয়েই ফিরে তাকায়, "ভালই তো লাগছে আপনাকে। যাওয়া যাবে না কেন, আপনি কি বুড়ো হয়ে গেছেন নাকি?"

"না, এটা পরে আমায় কেমন ছোকরা ছোকরা লাগছে না?"

"লাগছেই তো", ফিক করে হেসে ফেলে যোগেশ্বরী, "আজ ছাত্রীরা আপনাকে ঘিরে ধরবে।"

"বাজে কথা বোলো না। এখন বলো এর সঙ্গে কোন জামাটা পরব?"

"কালো চেক-চেক জামাটা পরুন, বেশ মানাবে।"

জামা-প্যান্ট পরে আয়নার সামনে দাঁড়ায় অবিনাশ। সত্যিই বেশ ভাল লাগছে তাকে।

ব্যাগ নিয়ে বেরোতে যাবে অবিনাশ।

যোগেশ্বরী ছুটে আসে, "দাঁড়ান, একটু সেন্ট দিয়ে নিন।"

"সেন্ট কেন? সেন্ট মেখে আমি স্কুলে যাই নাকি?" অবিনাশ বিরক্ত হয়।

"বাঃ রে, স্কুল থেকে আজ কোথায় যাওয়ার আছে, ভুলে গেছেন?"

তাই তো! মনে ছিল না একদম। কাল রাতেই তো ফোনে কথা হয়ে গেছে। আজ শনিবার। স্কুল টিফিনেই ছুটি হয়ে যাবে। সেখান থেকে সরাসরি পাত্রীর বাড়ি যাওয়ার কথা। বাসে করে আধঘণ্টার পথ। কী যেন নাম মেয়েটার? মহুয়া। মহুয়া চক্রবর্তী। বেশ নাম মেয়েটার।

অবিনাশ তবু আপত্তি করে, "এই গন্ধটা খুব উগ্র। আমার

ভাল লাগে না।"
"আপনার না লাগলে কী হবে, মেয়েদের ভাল লাগে। কিচ্ছু যদি বোঝে!"
এই 'কিচ্ছু যদি বোঝে' কথাটা যোগেশ্বরী মাঝে মাঝেই বলে, আর বলার সময় কী সুন্দর একটা ভঙ্গি করে নাক আর ঠোঁটটা কোঁচকায়, বেশ লাগে দেখতে।
রংটা চাপা হলেও মুখে লাবণ্য আছে যোগেশ্বরীর।
কাছে সরে এসে অবিনাশের বুকে স্প্রে করতে করতে যোগেশ্বরী চোখ নামিয়ে বলে, "আমায় কী দেখছেন? আজ তো কনে দেখতে যাচ্ছেন!"

গলাটা কি একটু কেঁপে যায় যোগেশ্বরীর? অবিনাশ কিছু বলে না।
যোগেশ্বরীর গালটা টিপে দিয়ে বেরিয়ে আসে। জুতো পরে। দরজায় তালা দেয়। পিছন পিছন যোগেশ্বরীও বেরিয়েছে। সিঁড়ি দিয়ে নামছে। অবিনাশ নীচের দিকে তাকায়। তাকাতেই হয়।
যোগেশ্বরী মুখ তোলে। তুলবেই। একটু হাসি দিয়ে বেরিয়ে যায়।
স্কুল থেকে মেয়ে দেখে ফিরতে ফিরতে আজ বেশ দেরিই হয়ে গেল। গলির মুখে ঢুকতে ঢুকতেই অন্ধকার নেমে এসেছে। বাড়ির নীচে এসে ওপরে তাকাতেই দেখল ঘরে আলো জ্বলছে। তার মানে যোগেশ্বরী এসে গেছে। ওর কাছে ঘরের আর একটা চাবি থাকে। যাক!

দোতলায় দু'টো ঘর ভাড়া নিয়ে থাকে অবিনাশ। দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকেই ডাইনিং রুম, আর পাশেই রান্নাঘর। ছোট হলেও সুন্দর। টাইলস বসানো দেওয়ালে।
রান্নাঘরের কল খুলে যোগেশ্বরী থালা বাসন মাজছে। কালো ব্লাউজ় আর হলুদ পাড়ের শাড়িটা পরেছে আজ।
যোগেশ্বরীর ছিপছিপে শরীরে একটু চাপা ব্লাউজ়, শাড়ি বেশ মানায়।
অবিনাশ যে ঘরে ঢুকল যোগেশ্বরী বুঝতে পারেনি। ও কানে একটু কম শোনে। ছোটোবেলায় খেলতে খেলতে চৌবাচ্চায় পড়ে গিয়েছিল। কানে জল ঢুকে গিয়েছিল। ডানকানে এখনও মাঝে মাঝেই পুঁজ জমে। তখন একটু গন্ধও বের হয়। হাসপাতালে গিয়ে ডাক্তার দেখিয়েছে। কানে ড্রপ নিয়েছে। কিছুদিন ভাল থাকে, তারপর আবার আগের মতোই। কিন্তু যোগেশ্বরী তেমন গা করে না। কোনও ব্যাপার নিয়েই সে বেশি ভাবতে ভালবাসে না। শুধু আজকাল মাঝে মাঝেই তার হাসিখুশি মুখটায় কীসের ছায়া পড়ে।
অবিনাশ পা টিপে টিপে রান্নাঘরে ঢোকে। পিছন থেকে যোগেশ্বরীর চোখ চেপে ধরে। তার হাত দু'টো ধরে যোগেশ্বরী ঘুরে দাঁড়ায়। হাসে, "খালি চমকে দেওয়া, তাই না? বলুন মেয়ে কেমন দেখলেন? পছন্দ হয়েছে?"
কোনও উত্তর না দিয়ে রান্নাঘর ছেড়ে শোওয়ার ঘরে আসে অবিনাশ। ব্যাগ রেখে চেয়ারে বসে। পিছন পিছন যোগেশ্বরীও আসে। অবিনাশের গাল ছুঁয়ে বলে, "বেচারা, ক্লান্ত হয়ে গেছে একদম। খুব দৌড়াদৌড়ি হয়েছে আজ, তাই না?"
ক্লান্তভাবে ঘাড় নাড়ে অবিনাশ। আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ায়।
"উঠলেন কেন আবার? একটু বসে নেন না।"
"নাঃ, সন্ধে দিতে দেরি হয়ে যাচ্ছে।"
"সেই ভাল। চট করে হাতমুখ ধুয়ে পুজো দিয়ে নেন। চা খেতে খেতে পরে আপনার গল্প শুনব।"
পুজো-টুজো দেওয়ার অভ্যেস কোনওদিনই ছিল না অবিনাশের। বাবা-মা মারা যাওয়ার পর থেকেই এই বাতিকটা হয়েছে। ওঁরা দিতেন বলেই কি?

প্রদীপ জ্বালাতে জ্বালাতেই সুন্দর গন্ধটা নাকে ভেসে আসে, যোগেশ্বরী লুচি ভাজছে। ভালই হল। খিদেটা ভালই পেয়েছে। পাত্রীর বাড়ি যেতে যেতেই একথালা মিষ্টি ধরিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু অবিনাশ শুধু একটা কালোজাম হাতে তুলে নিয়েছিল। এই মেয়ে দেখতে গিয়ে খাবার ব্যাপারটা তার একদমই পছন্দ নয়। ফোনে সে বলেও দেয়, "আমার জন্য আলাদা কোনও ব্যবস্থা করবেন না।"

"আর কত দেরি করবেন? লুচি যে ঠান্ডা হয়ে গেল।" রান্নাঘর থেকে যোগেশ্বরীর গলা ভেসে আসে।
পুজোর থালা দু'টো ঝট করে মেজে নিয়ে, ঠাকুরকে দেওয়া সন্দেশটা নিজে একটু খেল অবিনাশ, যোগেশ্বরীকে দিল আর বাকিটা জানলা দিয়ে ফেলে দিল। পাখিরা খাবে।
খেতে বসে একটু নিবেদন করে অবিনাশ। এতে আরও এক-দু'মিনিট চলে যায়। তারপর লুচি বেগুনভাজায় হাত দিল। যোগেশ্বরী চায়ের কাপ ও খাবারের প্লেট নিয়ে মেঝেতেই বসে।
"গরম গরম লুচি খাওয়া কোনওদিন আপনার ভাগ্যে জুটবে না।"
"যেমন বউ জুটবে না কোনওদিন", বিরস মুখে বলে অবিনাশ।
"এমন কেন বলছেন? এই তো যেই মেয়েটা দেখে এলেন তাকেই বিয়ে করে ফেলুন। কেমন দেখলেন, বললেন না তো?"
"তুমি নিজেই দেখে নাও, ব্যাগের ভেতর মেয়েটার ছবি আছে।"
যোগেশ্বরী তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে ছবিটা নিয়ে আসে। ভাল করে দেখে। তারপর ভ্রূ কুঁচকে বলে, "ভালই তো দেখতে, ফর্সা আছে, তাই না?"
"ফর্সা না হাতি! একগাদা রং মেখে এসে বসেছিল, মনে হচ্ছিল মুখে জল ঢেলে দিই।"
"রং এখন সব মেয়েই মাখে। পরিষ্কার মেয়েদের রং মাখলে আরও ভাল লাগে। আপনার বউ ফর্সাই হবে দেখবেন। মেয়েটার ফিগারটাও তো ভাল?"
"ফিগার ভাল? মোটা কেমন দেখছ না?"
"বেশি বাড়িয়ে বলবেন না তো! মেয়েদের এটুকু স্বাস্থ্য তো ভালই লাগে। আমার মত পাটকাঠি হলে মানায় নাকি?"
"তুমি পাটকাঠি? তোমার যাকে বলে একেবারে সুঠাম শরীর, পারফেক্ট ফিগার, সব ঠিকঠাক", ঝট করে একবার যোগেশ্বরীকে দেখে নেয় অবিনাশ।
"অনেক হয়েছে। এবার বলুন একে বিয়ে করছেন তো?"
"কক্ষনও না। এই মেয়ে বিয়ের পর আরও মোটা হবে।"
"হ্যাঁ, আপনি সব জেনে বসে আছেন তো! আর হলেই বা কী? একসঙ্গে থাকতে থাকতে দেখবেন ওকেই ভাল লাগছে।" ফিক করে হেসে ফেলে যোগেশ্বরী, "মোটা বউকে জড়িয়ে ধরে শুলে আপনার খুব আরাম হবে, বুঝেছেন?"
"ঠাট্টা করছ, তাই না? আমার ভাল তো তুমি চাও না,"
অবিনাশ গুম হয়ে বসে থাকে।
যোগেশ্বরী আবার শুধোয়,"ওদের আপনাকে নিশ্চয়ই পছন্দ

হয়েছে?”
“তা হয়েছে। রবিবাবু তো বললেন, বাবা-মার তো একটাই মেয়ে, কোনও ছেলে নেই। জামাইকে ওরা টাউনের বুকে জায়গা-জমি কিনে বাড়ি তৈরি করে দেবে।”
“তাহলে আর ভাবছেন কেন? আপনি যা কিপটে, নিজের টাকায় তো আর বাড়ি তৈরি করবেন না। এই সুযোগে সেটা হয়ে যাবে।” কথাটা কানে নেয় না অবিনাশ, লুচি চিবোতে চিবোতে গজগজ করে, “মাঝখান থেকে দু'শোটা টাকা গচ্চা গেল।”
“দু'শো টাকা আবার কীসে খরচ করলেন?”
“তোমার জন্যই তো”, অবিনাশ ফুঁসিয়ে ওঠে, “তুমিই তো বলেছিলে, মেয়ে দেখতে গেলে মেয়ের হাতে টাকা দিতে হয়!”
“হয়ই তো। তাই বুঝি আপনার বুক জ্বলে যাচ্ছে? এত কিপটে কেন বলুন তো? ব্যাঙ্কে তো আপনার এত টাকা পচছে, একটু না হয় দিলেনই।”
“একটু না হয় দিলামই! আরও যদি দশটা মেয়ে দেখি, তবে দু'শো দু'হাজার টাকা এমনিই বেরিয়ে যাবে...”
“আরও দশটা মেয়ে দেখতে যাবেন কেন? এত বাছতে গেলে আপনার আর সত্যি বিয়ে করা হবে না।”
আর বেশি কথা হয় না। যোগেশ্বরী চলে গেলে অবিনাশ আবার ছবিটা নিয়ে দেখতে বসে।

বিয়ের কথা আগে সে কখনও সেভাবে ভাবেনি। কিন্তু এখন তার খুব একা লাগে। বাবা-মা দু'জনেই পর পর চলে যাওয়ার পর থেকেই এটা হয়েছে।



স্কুলে চাকরি করে অবিনাশ। একাই থাকে। বয়স চল্লিশ পেরিয়েছে। কিন্তু দেখে বোঝা যায় না। বিয়ের কথা আগে সে কখনও সেভাবে ভাবেনি। কিন্তু এখন ভাবে। এখন তার খুব একা একা লাগে। বাবা-মা দু'জনেই পর পর চলে যাওয়ার পর থেকেই এটা হয়েছে। এমনি বই পড়ে, কম্পিউটার নিয়ে সময় কেটে যায়। কিন্তু কতক্ষণ? হঠাৎ করে যখন রাস্তায় বা বাসে-ট্রেনে কোনও নবদম্পতিকে দেখে, বিশেষ করে তাদের সঙ্গে কোনও মিষ্টি দেখতে বাচ্চা থাকলে, তার মনটা হু হু করে ওঠে। তার হিংসে হয়। ওই বাচ্চা নিয়ে বর-বউয়ের হাতে হাত ধরা হাসিখুশি পরিতৃপ্ত মুখ, বাচ্চাটা কেমন আঁকড়ে ধরেছে তার বাবাকে। এর পাশে নিজেকে কেমন বড্ড ফ্যাকাশে মনে হয়, রিক্ত মনে হয়। তখন মনে হয়, তার এই ব্যাচেলর জীবনটা স্বাভাবিক নয়, এ জীবন শূন্যতায় ভরা।

এখন অবিনাশ চেষ্টা করছে, পেপারে বিজ্ঞাপন দিয়েছে, একজন ঘটককেও লাগিয়েছে, কিন্তু লাভ হচ্ছে কই! পাত্রী মনে ধরছে না, পাত্রীকে পছন্দ হলেও তার বাড়ির লোককে পছন্দ হচ্ছে না। কোথাও হয়তো মেয়ের বাবা জিজ্ঞেস করে বসলেন, “আপনাদের স্যালারি স্কেলটা কত, মানে কত টাকা ড্র করছেন এখন?” কোনও মানে হয়! কোথাও আবার চায়ের সঙ্গে দিল দু'দিনের বাসি মিষ্টি ও ঠান্ডা সিঙাড়া, মুখ মন দু'টোই টকে গেল।
ঘটক রবিবাবু নতুন একটা সম্বন্ধ এনেছেন।
যোগেশ্বরী জিজ্ঞেস করে, “যাচ্ছেন তো?”
“দেখি”, দায়সারা উত্তর দেয় অবিনাশ। বিশেষ উৎসাহ না দেখালেও, নির্দিষ্ট দিনেই অবশ্য রওনা দিয়েছে অবিনাশ। সেন্ট মেখে, নতুন কেনা জিনসের প্যান্টটা পরেই। সন্ধে হয় ফিরতে।
“কেমন দেখলেন?” যোগেশ্বরী বলে।
“মেয়েটা বাংলা সাহিত্যের ছাত্রী, অথচ তালনবমী গল্পটা পড়েনি।”
“তালনবমী? আমায় সেদিন যেটা বললেন? কী ভাল গল্পটা!”
“হ্যাঁ, ওকেও গল্পটা বললাম। ওর ভাল লাগল না। ভাল করে শুনলই না।”
“তাতে কী? সব গল্প কি সবার ভাল লাগে?”
“সে যাই বলো, বিভূতিভূষণের গল্প যার ভাল লাগে না, তাকে আমি বিয়ে করতে পারব না।”
“অ।”
দু'জনে চা খায়। কিছুক্ষণ কেউই কথা বলে না। অবিনাশই হঠাৎ করে বলে, “আমি আর মেয়ে দেখতে যাচ্ছি না।”
“কেন, কী হল আবার?”
“ধুস! শুধু যাওয়া আর আসা, কোনও লাভ হচ্ছে না। বিয়ে করা আমার ভাগ্যে নেই। একটা শুধু সুন্দরী বউ চাই, সেটাও জুটবে না।”
“বেচারা”, যোগেশ্বরী হাসে।
“একটা বাচ্চা হবে আমার, একটু ছটফটে, কিন্তু খুব দুষ্টু না। আমার কোলের কাছে এসে বলবে, বাবা চকোলেট দাও,” অবিনাশ নিজের মনেই বলে চলে।
যোগেশ্বরী ওর দিকে তাকিয়ে থাকে কিছুক্ষণ। তারপর বলে,
“মউ আর এখন আপনাকে ফোন করে না?”
“কেন হঠাৎ ওর কথা জিজ্ঞেস করছো?”
“না, এমনিই মনে হল। করে?”
“হ্যাঁ, করে মাঝে মাঝে।”
“আপনি করেন?”
“করি।”
“তো মউকেই বিয়ে করে ফেলুন না। ওকে তো আপনার বেশ পছন্দই ছিল, ওর বাড়ির লোকদেরও।”
“হ্যাঁ, শুধু ওর বাবাকে ছাড়া, কেমন যেন দেখতে।”
“তা হোক, আপনি তো আর ওর বাবাকে বিয়ে করতে যাচ্ছেন না।”

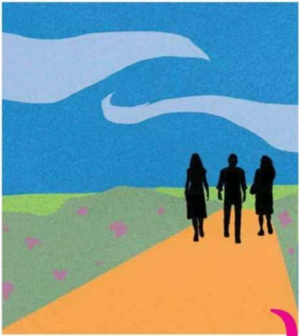
একটু অন্যমনস্ক হয় অবিনাশ। হ্যাঁ, মউকে তার প্রথম দেখাতেই পছন্দ হয়েছিল। পরিষ্কার রং, ছোট্ট মুখটা, উজ্জ্বল তীব্র দু'টো চোখ ওর দিকে চুরি করে তাকাচ্ছিল। কেমন সুন্দর ভঙ্গিটা। শহরেই ওর এক আত্মীয়ের বাড়িতে প্রথম দেখাশোনা। অবিনাশ বলেছিল, “মেয়ে তো আপনাদের কোনও কথাই বলছে না।” মউয়ের বিবাহিত বান্ধবী পাশেই বসে ছিল, একটু বড় হবে বয়সে, সে ফুট কেটেছিল, “এখন দেখছেন এরকম, বাড়িতে নিয়ে গিয়ে তুলুন, তখন দেখবেন এই মউমাছির গুঞ্জন শুনতে শুনতেই আপনার সারাদিন কেটে যাচ্ছে।”
শুনে মউয়ের মুখ লাল, ফর্সা মুখে আবির, সেই রং অবিনাশেরও বুকে লেগেছিল।
আর বলতে নেই আদরযত্নও খুব করেছিল ওরা। এত ভাল

আপ্যায়ন ও কোথাও পায়নি। কফির সঙ্গে কাজুবাদাম, উৎকৃষ্ট চানাচুর, তিন-চার রকমের মিষ্টি, তারপর যখন ওর গ্রামের বাড়িতে গেল, একেবারে জামাই-আদর। মাছের কালিয়া, ঝাল ঝাল মাংস, বাড়ির পাতা দই, পোস্ত দিয়ে পনির, খুব তৃপ্তি করে খেয়েছিল অবিনাশ। সেও তো আজ ছ'মাস হয়ে গেল। হ্যাঁ-না কিছুই বলতে পারেনি অবিনাশ।

"শেষ কবে ফোন করেছিল ও?" আবার শুধোয় যোগেশ্বরী।
"দু'দিন আগেই করেছে।"
"কী কথা বললেন?"
"কেন, তুমি শুনে কী করবে?"
"আঃ, বলেন না।"
"একটা ধাঁধা জিজ্ঞেস করেছিলাম।"
"ধাঁধা?"
"হ্যাঁ।"
"পারেনও আপনি। কোন ধাঁধাটা শোনালেন, আমাকে শুনিয়েছেন?"
"হ্যাঁ, ওই দেশলাই কাঠির ধাঁধাটা। মনে পড়ছে?"
"হ্যাঁ, ওই তো একটা দেশলাই বাক্সে ২৪টা কাঠি আছে। সেগুলোকে দু'টো সারিতে সাজানো হল। এবার দ্বিতীয় সারিতে যে ক'টা কাঠি আছে, ঠিক ততগুলো কাঠি প্রথম সারি থেকে তুলে নিয়ে দ্বিতীয় সারিতে রাখা হল। রাখার পর প্রথম সারিতে এখন যে ক'টা কাঠি পড়ে আছে, দ্বিতীয় সারি থেকে তুলে নিয়ে আবার প্রথম সারিতে রাখা হল। এবার দু'টো সারিতেই সমান সমান কাঠি হল। তাহলে প্রথমে প্রত্যেক সারিতে ক'টা করে কাঠি ছিল, এটাই তো? এটা তো আমি পেরেছিলাম। ও পারেনি?"
"না।"
"সে ঠিক আছে। সবাই সব ধাঁধা পারে না। আমিও পারি না।"
"হতে পারে। কিন্তু ওর ধাঁধা শুনতে ভালই লাগে না। অঙ্কের ধাঁধা দিলে তো আরও রেগে যায়। ও বলে আমি মাস্টারি করছি, ওকে জব্দ করার জন্য এসব বলছি।"
"ওঃ", যোগেশ্বরী মুচকি হাসে, "আপনাদের মধ্যে তাহলে ফোনে ফোনে ঝগড়াও হয় দেখছি।"
অবিনাশ চুপ করে থাকে।
যোগেশ্বরী হঠাৎ বলে, "ওকে একবার এখানে ডাকুন, আপনার সঙ্গে দেখা করতে বলুন।"
"মানে? পাগল হলে নাকি!"
"পাগলের কী আছে? ওকে বলুন পার্কে নিয়ে যাবেন, ঘোরাবেন, কথা বলবেন। তখন ওকে আবার একবার ভাল করে দেখবেন, আমিও দেখব।"
"তুমি?"
"হ্যাঁ, ওকে একবার বাড়ির সামনে দিয়ে নিয়ে যাবেন, আমি জানলা দিয়ে দেখে নেব।"
"তুমি দেখে কী করবে?"
"কী আবার করব? পছন্দ করব। আপনার তো মনের ঠিক নেই। আমি যদি বলি ওকে ভাল লেগেছে, তবে আপনি ওর বাড়িতে বিয়ের কথা বলে দেবেন। ঠিক আছে?"
"ঠিক আছে", অবিনাশ হাসে।
"তাহলে এখনই ফোন করুন।"
"এক্ষুণি?"
"হ্যাঁ, এখুনি করে বলুন, কালকেই আপনি ওর সঙ্গে দেখা করতে চান।"
"না, এটা আমি বলতে পারব না।"
"কেন পারবেন না?"
"ও আমার সঙ্গে এইভাবে দেখা করতে চাইবে না।"
"চাইবে। ও তো আপনাকে পছন্দ করে।"
"তা হোক, তুমি বুঝছ না। বাড়ি থেকে ওকে ছাড়বে কেন? আর বাড়ির লোককে না জানিয়ে ও আমার সঙ্গে আলাদা করে দেখা করবে কেন? তাছাড়া ওর বাড়ি থেকে মালদা আসতেও তো অনেকক্ষণ সময় লাগে।"
"এত ভাববেন না। ফোনটা করেই দেখুন না।"
কী মনে করে ফোন লাগাল অবিনাশ। যোগেশ্বরী বলল, "আওয়াজটা জোরে করে দিন, আমি শুনব", স্পিকারটা অন করে দিল অবিনাশ।
কয়েকবার রিং হওয়ার পর মউ ধরল।
"হ্যালো.."
"হ্যালো, আমি অবিনাশ বলছি। কাল তুমি একবার মালদায় আসতে পারবে? দেখা করতে চাই," যোগেশ্বরীর দিকে তাকাল অবিনাশ। যোগেশ্বরী মাথা নাড়ল।
"মালদায় কেন আসব হঠাৎ?"
"ওই যে বললাম, তোমাকে দেখতে ইচ্ছে করছে। অনেকদিন দেখা হয়নি। এখানে পার্কে গিয়ে বসব, গল্প করব।"
"এটা কেমন কথা? দেখতে চাইলে আমার বাড়ি চলে আসুন।"
"না। ওই দেখা আর এই দেখা এক নয়।"
"আমি আসতে পারব না", একটু থেমে আবার বলে মউ, "বাড়ি থেকে আমায় ছাড়বে না। তোমার সঙ্গে দেখা করছি বললে..."
"আমার সঙ্গে দেখা করার কথা কেন বলবে?"
"বলব না?"
"তোমার তো বান্ধবীর বাড়ি মালদাতেই আছে। বলবে তার কাছে ঘুরতে যাচ্ছ।"
"এটা হয় না।"
"বেশ রাখছি।"
"রেখে দিলেন?" যোগেশ্বরী বলল।
"হ্যাঁ, ও আসবে না, তোমায় বলেছিলাম।"
হঠাৎ করেই ফোন বাজল।
ফোন তুলতেই মউয়ের গলা, "আমি এলেও কিন্তু বেশিক্ষণ থাকতে পারব না।"
"বেশ, তোমার যেরকম সময় হয়।"
"পরে জানাচ্ছি তোমাকে", ফোনটা কেটে গেল। যোগেশ্বরী জিজ্ঞেস করে, "কী বলল?"
"আসবে মনে হয় কাল..."
"আমার কথাই ঠিক হল তো? এবার আমি যাই, দরজাটা বন্ধ করে দিন।"
উঠে দাঁড়াতে গিয়ে মুখ বিকৃত করে আবার বসে পড়ে অবিনাশ।
"কী হল?" যোগেশ্বরীর গলায় উৎকণ্ঠা।
"আজ তাড়াহুড়ো করে বাস থেকে নামতে গিয়ে পায়ে লেগেছে। গোড়ালিটা মচকে গেছে মনে হয়।"
"কী যে করেন, খুব ব্যথা হচ্ছে? কোন পায়ে?"
ডান পা-টা তুলে দেখায় অবিনাশ।
নিচু হয়ে পা টেনে নেয় যোগেশ্বরী।
"একটু ফুলেছে দেখছি, দাঁড়ান তেল গরম করে মালিশ করে দিচ্ছি। ভাল হয়ে যাবে।"
যোগেশ্বরী রান্নাঘর থেকে আসে। তেল লাগিয়ে আস্তে আস্তে

মালিশ করে।

ওর দিকে তাকিয়ে অবিনাশ একটু অন্যমনস্ক হয়ে যায়। তিনবছর হল তার বাড়িতে কাজ করছে যোগেশ্বরী। ওর সবদিকে কেমন খেয়াল রাখে।
মোটে ক্লাস সিক্স পাশ, তাও কেমন বুদ্ধিমতী। আর জানার আগ্রহ খুব। কাজের ফাঁকে হাতের কাছে যা পায়, পেপার, ম্যাগাজ়িন টেনে নিয়ে পড়তে বসে যায়। এরকম যোগেশ্বরী হয়তো আরও অনেক আছে, যারা একটু সুযোগ পেলে, ভাল পরিবেশ পেলে অনেক কিছু করতে পারত। ওকে যদি আরও একটু পড়াশোনা করানো যেত, কিন্তু লাভ কী? সেই তো কাজ



তিনজনে মিলে টিকিট কেটে পার্কে ঢোকে। নুড়ি বিছানো রাস্তা ধরে হাঁটে। দু'পাশে ফুলের কেয়ারি। বেশ লাগছে। এভাবে আগে কোনও মেয়ের সঙ্গে সে পার্কে ঢোকেনি।

করেই খেতে হবে ওকে।
অবিনাশ বলে, "তুমিও এবার বিয়েটা করে নাও যোগেশ্বরী।"
"করব। আপনি তো আমাকে তাড়াতে পারলেই বাঁচেন।"
"নতুন কোনও সম্বন্ধ আসেনি?"
"এসেছে, তো?"
"তোমার পছন্দ হয়নি?"
"আমি তো আপনার মতো সম্বন্ধ করে বিয়ে করব না", হেসে দেয় যোগেশ্বরী, "আমি প্রেম করে বিয়ে করব, যেমন আমার বরকে করেছিলাম।"
"তোমার বরের গল্পটা আবার বলো না! কীভাবে যেন প্রথম আলাপ হয়েছিল তোমাদের?"
"কতবার তো শুনেছেন।"
"আবার শুনব।"

পালিয়ে বিয়ে করেছিল যোগেশ্বরী। বিয়ের দু'বছর পরেই তার বর মারা যায়। একটা মেয়ে হয়েছিল, শ্বশুরবাড়িতে ওকে নেয়নি।
যেই একটা বছর ও ওর বরের সঙ্গে ঘুরেছিল, প্রেম করেছিল, সেই ক'টা দিনই ওর জীবনের শ্রেষ্ঠ সুখের সময়।
ওই দিনগুলোর কথা বলতে বলতে যোগেশ্বরীর মুখটা আশ্চর্য নরম হয়ে যায়। কেমন একটা আলো খেলা করে ওর মুখে, এটা দেখার জন্যই হয়তো অবিনাশ বারবার গল্পটা শুনতে চায়...

পরদিন দুপুর দেড়টা নাগাদ মউয়ের ফোন আসে, "আমি বাসে উঠছি। তিনটের মধ্যেই আশা করি পৌঁছে যাব,"
"তুমি সত্যিই আসছ নাকি?"
"হ্যাঁ, কেন?"
"না, মানে, এই দুপুর রোদে কষ্ট করে আসবে?"
"তাতে কী হয়েছে?"
"আজ না হয় থাক, অন্য একদিন..."
"আমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছি, আর আপনি ফিরে যেতে বলছেন? অদ্ভুত মানুষ তো আপনি? আমি আসছি। আপনার দেখা করার ইচ্ছে না থাকলে করবেন না," ফোন কেটে দেয় মউ।
অবিনাশ ভাবে, ব্যাপারটা ঠিক হল না।
তিনটের কিছু পরেই মউয়ের ফোন আসে আবার, "আমি এসে গেছি। বান্ধবীর বাড়িতে আছি। একটু বিশ্রাম নিয়ে চারটের দিকে বেরোচ্ছি। দেখা করার ইচ্ছে আছে কি?"
"থাকবে না কেন? চিলড্রেনস পার্কে এসো। আমি গেটের সামনেই থাকব। তুমি বান্ধবীর সঙ্গে চলে এসো। চারটের সময় বললে তো?"

অবিনাশ একটু আগেই পৌঁছে যায়। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর দূর থেকে মউদের আসতে দেখে। একটা উজ্জ্বল লাল-সবুজ সালোয়ার পরেছে মউ। দেখতে বেশ লাগছে। ওর স্বাস্থ্যটা কি এই ক'দিনে আরও একটু ভাল হয়েছে? কাছে এসে দাঁড়াতেই হালকা একটা সুগন্ধ পায়, পারফিউমের? না মউয়ের শরীরের
নিজস্ব সুরভি?
তিনজনে মিলে টিকিট কেটে পার্কে ঢোকে। নুড়ি বিছানো রাস্তা ধরে হাঁটে। দু'পাশে ফুলের কেয়ারি। বেশ লাগছে। এভাবে আগে কোনও মেয়ের সঙ্গে সে পার্কে ঢোকেনি। মউয়ের বান্ধবী ফোনে কার সঙ্গে কথা বলতে বলতে ইচ্ছে করেই বোধ হয় একটু পিছিয়ে যায়। ওদের দু'জনকে একা ছেড়ে দেয়।
পার্কে এখনও বেশি কেউ আসেনি। একটু নিরালা দেখে একটা বেঞ্চে এসে মউকে নিয়ে বসে অবিনাশ। বান্ধবী দূর থেকে বলে, "আমি আমার বরের সঙ্গে কথা বলছি। তোদের হয়ে গেলে ডাকিস আমায়।"
হয়ে গেলে মানে? কী হওয়ার আছে? অবিনাশের একটু অস্বস্তি হয়। কথা খুঁজে পায় না। মউ অন্যদিকে তাকিয়ে আছে। আসতে বারণ করেছিল বলে এখনও রেগে আছে নাকি?
অবিনাশ প্রশ্ন করে, "তোমার আসতে অসুবিধে হয়নি তো?"
"না।"
"তোমাকে দেখতে ভাল লাগছে।"
"ও।"

শীতকাল। এখনই একটু একটু অন্ধকার নেমে এসেছে। আজ

সন্ধে দেওয়া হল না। না হোক। একটা-দু'টো বাতি জ্বলে উঠেছে পার্কের। মউয়ের গালের একপাশে হলুদ আলো এসে পড়েছে। মউয়ের একটা হাত কোলের উপর রাখা। ছোট ছোট নিটোল আঙুল। হাতটা তুলে ধরে নিজের হাতের মুঠোয় চেপে ধরে অবিনাশ।
মউ কিছু বলে না। ফিরে তাকায় না। হাত ছাড়িয়েও নেয় না। একটা ঘণ্টা সময় কোথা দিয়ে যে কেটে যায়। এর মধ্যে খুব অল্পই কথা হয়েছে দু'জনের। সাধারণ কিছু কথা। কিন্তু কেমন যেন নেশা লেগে গেছে অবিনাশের। মউয়ের হাতটা ছাড়তেই ইচ্ছে করছে না।
"এবার তাড়াতাড়ি বিয়েটা করে ফেলুন", পার্ক থেকে বেরিয়ে রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে হাসতে হাসতে বান্ধবী বলে। মউ তীব্র চোখে তার বান্ধবীর দিকে তাকায়। বেশ লাগে অবিনাশের। আগেও তো সে প্রেম করেছে। কলেজ লাইফে। মেয়েদের সঙ্গে ঘুরেছে। কিন্তু এই অনুভূতিটা একদম অন্যরকম, পাশে যে আছে, এই যার শরীরের ছোঁয়া মাঝে মাঝে পাচ্ছে, এ এখনও পর্যন্ত তার কেউ নয়, কিন্তু সে চাইলে হয়তো একদিন এই মেয়েটি তার সন্তানের মা হতে পারে।
পথের পাশে দাঁড়িয়ে কুলফিওয়ালার কাছ থেকে কুলফি নিল ওরা। শালপাতা দিয়ে ঠান্ডা দুধ গড়িয়ে নামছে। মউয়ের কুলফির অর্ধেকটা ভেঙে পড়ে গেল। নিজের কুলফি থেকে বেশিটাই ভেঙে ওর পাতায় তুলে দিল অবিনাশ। "দেখছিস, এখন থেকেই কেমন খেয়াল রাখছে তোর," বান্ধবী পাশ থেকে বলে। কুলফির মধ্যে মউয়ের হাসি ডুবে যায়। শুধু দু'চোখ ঝিলিক দিয়ে ওঠে।
ওদের দু'জনকে আরও একটা করে কুলফি মালাই দিতে বলে অবিনাশ। বান্ধবী নেয়। কিন্তু মউ না করে, "আমি ঠান্ডা বেশি খেতে পারি না।"

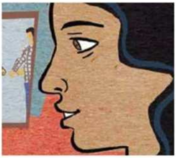
এবার ফেরার পালা। বান্ধবীটির বাড়ি পুলিশ লাইনে। ওর বর পুলিশে চাকরি করে। আজ রাতটা মউ ওখানেই থেকে যাবে। ওরা হাঁটতে থাকে। মেডিক্যাল সেন্টারের সামনে এসে দাঁড়ায়। এখান থেকে সোজা চলে গেলেই পুলিশ লাইন। আর বাঁদিকের পথটা ধরলে অবিনাশের বাড়ি। একটু ভাবে অবিনাশ। তার বাড়ির সামনে দিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে যাবে? জানলায় দাঁড়িয়ে আছে যোগেশ্বরী?
"আপনার বাড়িটা তো এদিকেই বলেছিলেন?" মউয়ের বান্ধবী বলে। অবিনাশ চমকে তাকায়, "হ্যাঁ, এই তো বাঁদিকে একটু হাঁটলেই..."
"চল মউ, তোর বরের বাড়িটা দেখে আসি। কী মশাই, আপত্তি নেই তো? চুপ করে রইলেন যে? বর বললাম বলে রাগ করলেন না তো?"
অবিনাশ হাসে, "আপত্তি কীসের? চলুন না।"
কথাটা বলে ফেলেই অবিনাশ নিজের ভুল বুঝতে পারে। ঝামেলায় পড়ল সে। যোগেশ্বরীর এতক্ষণে এসে যাওয়ার কথা। হয়তো বাড়ির ভেতর আছে। এদের নিয়ে সে ঢুকবে কী করে? কী পরিচয় সে দেবে যোগেশ্বরীর? রাত হয়ে এসেছে। এই সময় তার ঘরে একটা একা মেয়েমানুষ...হঠাৎ এরা তার ঘরে যেতে চাইছে কেন?

অবিনাশের বাড়িটা বড় রাস্তার উপরেই। তবে বাড়ির সিঁড়ির দরজাটা গলির ভেতরে। গলিটার মুখে এসে থমকে দাঁড়ায় অবিনাশ।
"মনে হচ্ছে তোমাদের নিয়ে যাওয়াটা ঠিক হচ্ছে না।"
"কেন?" বান্ধবীটি প্রশ্ন করে।
"বাড়িওয়ালা কী ভাববে? দু'জন অপরিচিত মেয়েকে নিয়ে এত রাতে বাড়ি ঢুকছি দেখলে, বুঝতেই পারছেন, একা থাকি।"
"তাতে কী হয়েছে? কিছু একটা বানিয়ে বলে দেবেন। বলবেন, আমরা আপনার ছাত্রী, পড়তে এসেছি। কি রে মউ, ঠিক বলছি না?" মৌয়ের দিকে ফিরে বান্ধবী হেসে উঠল। মউয়ের মুখ গম্ভীর।
এ তো ছাড়বেই না দেখছি...
"ঠিক আছে, এখানে একটু দাঁড়ান। আমি উপরে গিয়ে দেখে আসি বাড়িওয়ালা কী করছে," কথাটা বলেই আর দাঁড়াল না অবিনাশ। গলিতে ঢুকে পড়ল।
সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে এসে দেখে দরজা খোলা। ঘরে আলো জ্বলছে। আলোটা বাইরে থেকেও দেখা যায়। ওরা কি দেখেছে? শোবার ঘরে ঢুকে দেখল যোগেশ্বরী বিছানায় বসে আছে। অবিনাশকে দেখে উঠে দাঁড়ায়। ভয় পাওয়া গলায় বলে,
"আপনাদের আসতে দেখলাম। বাড়ির কাছে এসে ওদের নিয়ে দাঁড়ালেন, কী ব্যাপার, ওরা ঘরে ঢুকবে নাকি?"
"ঠিক তাই। আমার ঘর দেখতে চায়।"
"তাহলে? এখন আমি কোথায় যাই?"
"তুমি আস্তে আস্তে বেরিয়ে যাও! না, না, দাঁড়াও। ওরা দেখলে সন্দেহ করতে পারে। তুমি বরং বাথরুমে ঢুকে যাও।"
"বাথরুমে? ওরা যদি বাথরুমে ঢোকে?"
"আহ! কী মুশকিল, বাথরুমে ঢুকবে কেন?"
"না, যদি ওদের বাথরুম পায়..."
"হঠাৎ করে বাথরুম পাবে কেন? আর পেলেই বা। অন্যের বাড়িতে গিয়ে কেউ বাথরুম ইউজ় করে নাকি?"
"যদি করে?"
অবিনাশ কিছু ভেবে পায় না।
"তার চেয়ে আমি বরং ছাদের সিঁড়িটায় গিয়ে দাঁড়াই। ওরা বুঝতে পারবে না। ওরা ঘরে ঢুকলে না হয় বেরিয়ে যাব।"
"তাই করো," আর দাঁড়ায় না অবিনাশ। মাথা নেড়ে বেরিয়ে যায়। নীচে এসে দেখে ওরা দু'জন গল্প করছে।
"চলুন উপরে যাওয়া যাক। বাড়িওয়ালার দরজা বন্ধ আছে, কেউ দেখবে না।"
"কী অন্ধকার এই গলির ভেতরটায়!" মউয়ের বান্ধবী বলে, "মউ তোর মোবাইলের টর্চটা জ্বাল তো।"
একতলার দরজা দিয়ে ঢুকেই ডাইনিং কাম ড্রয়িং রুম। এখানে শুধু একটা বড় খাবার টেবল আর একটাই চেয়ার। এখানে দু'জনকে বসানো যায় না। তাই শোবার ঘরেই ওদের নিয়ে আসতে হল।
"আপনি মাথায় মেয়েদের তেল মাখেন নাকি?" শোবার ঘরে ঢুকেই প্রশ্নটা করে মউ।
মউয়ের চোখ জানলার দিকে। জানলার ধাপে দশ টাকার জবাকুসুম তেলের শিশিটা রাখা। পরদাটা সামান্য সরানো।
"ওহ, ওটা? ওই, মানে, মাখি মাঝে মাঝে..." ঢোঁক গিলে বলে অবিনাশ, "আসলে গন্ধটা আমার ভাল লাগে, মা এটা মাখতেন তো।"
শিশির পাশে চিরুনিটাও আছে। চিরুনির দাঁড়ায় দু'-একটা লম্বা চুলও কি আটকে নেই?
মউয়ের চোখ দু'টো হঠাৎ চঞ্চল হয়ে উঠেছে।
বিছানাতেই ওদের বসতে দেয় অবিনাশ।
"পাশের ঘরের দেওয়ালে ঠাকুরের সিংহাসন দেখলাম",

মউয়ের বান্ধবী বলে,"পুজো দেন নাকি?"
"ওই আর কী!"
"খুব ভাল। এবার পুজো দেবার জন্য একটা লক্ষ্মী বউ আনুন। আমার এই বোনটা তো পথ চেয়েই আছে," মউয়ের চিবুক ধরে হাসে বান্ধবী। মউয়ের মুখ লাল হয়। মুখ ফিরিয়ে নেয়।
"তোমরা একটু বসো", অবিনাশ বলে, "আমি রান্নাঘর থেকে আসছি।"

অবিনাশ বাইরের ঘরে আসে। দরজা খুলে উপরে তাকায়, না, যোগেশ্বরী যায়নি এখনও। অন্ধকার সিঁড়ির উপরে জড়োসড়ো হয়ে বসে আছে।
রান্নাঘরে এসে চা বসাল অবিনাশ। কড়াইতে তেল দিল। পাঁউরুটি ছিল ঘরে, দু'টো ডিম ছিল। ঝট করে ডিম ফেটিয়ে, পাঁউরুটি ডিমে ডুবিয়ে কয়েকটা ফ্রেঞ্চ টোস্ট বানিয়ে নিল। দুই পিস সরিয়ে রাখল। তারপর একটা থালায় সব সাজিয়ে, উপরে টোম্যাটো সস দিয়ে থালার উপরেই তিনকাপ চা নিয়ে শোবার ঘরে এল।
"ওহ, এতসব কী করেছেন?"
"কী আবার। প্রথমবার ঘরে এলেন, চায়ে কিন্তু দুধ দিইনি, দুধ নেই ঘরে।"
পাঁউরুটির পিস মুখে দিয়ে বান্ধবী বলল, "ভাল করেছেন তো—বেশ লাগছে খেতে।"
"এটা আমার মা করতেন।"
"দেখ মউ, তোর বর কত কাজের! কী মশাই, বিয়ের পরও বৌকে চা করে খাওয়াবেন তো?"
অবিনাশ বোকার মতো হাসে। বারবার এই 'বর' বলা কেন?
"দাঁড়িয়ে আছেন কেন? বসুন না।"
তার ঘরে তাকেই বসতে বলছে। অবিনাশ বিছানার একপাশে দূরত্ব বজায় রেখে বসল। ওরা চা খেতে খেতে ঘর দেখছিল। সংকুচিত গলায় অবিনাশ বলে, "ব্যাচেলরের ঘর তো, একটু অগোছালো।" মেঝের উপর ডাঁই হয়ে অনেকগুলো বই পড়ে আছে। মশারিটা লাট হয়ে বিছানার একপাশে পড়ে আছে।
তবু ভাল, যোগেশ্বরী উপরে যাওয়ার আগে তাড়াতাড়ি একটু গুছিয়ে দিয়ে গেছে। চাদরটা টান টান করে পাতা, বিছানার উপর জামা-প্যান্ট ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছিল, এখন নেই।
"আপনি বুঝি দাবা খেলেন?"
চমকে ওঠে অবিনাশ।
"আপনার ঘরে দাবার বোর্ড দেখছি। কার সঙ্গে খেলেন?"
"সেরকম কিছু নয়। কোনও বন্ধু-টন্ধু এলে..." অবিনাশ হাসার চেষ্টা করে।
"আপনি যে বলেছিলেন আপনার কোনও বন্ধু নেই এখানে।"
সেরেছে। এ যে সব মনে রাখে দেখছি! অবিনাশ কথা ঘোরায়, "তুমি দাবা খেলতে জানো?"
"না।"
"আমি শিখিয়ে দেব। খুব মজার খেলা।"
"ধুর! এ তো বুড়োদের খেলা। আমি শিখতে চাই না।"
বান্ধবী হেসে বলে, "বিয়ের পর ওইসব খেলতে আর আপনারও মন চাইবে না। তখন শুধু অন্য খেলা। তাই না মউ?" মউ তার বান্ধবীকে একটা চিমটি কেটে দেয়।

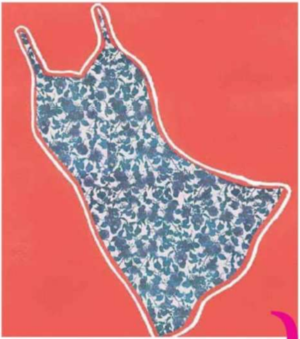
পাখার হাওয়ায় বসে বসে ওরা গল্প করছে, আর এখানে যোগেশ্বরী অন্ধকারে একা চুপ করে বসে আছে, ভয় পাওয়া বেড়ালছানার মতো।



আচ্ছা, যোগেশ্বরী কি এখনও বসে আছে? বাড়িওয়ালা যদি ওকে দেখতে পায়? দোতলার দরজা খুললেই তো... মউরা যদি বাইরে বেরোনোর সময় উপরে তাকায়? তাকাতেই পারে।
"তোমরা একটু বসো, আমি একটু আসছি।"
দরজা খুলে আবার উপরে তাকায় অবিনাশ।
বড় অন্ধকার ওই সিঁড়ির উপরটায়। অস্পষ্ট দেখতে পায়, এখনও একইভাবে যোগেশ্বরী বসে আছে। ওকে কি চলে যেতে বলবে? অবিনাশ চাপা গলায় ডাকে, "এই শুনছ?"
কোনও উত্তর আসে না। কানে কম শোনে যে!
ঘরের ভেতর পাখার হাওয়ায় বসে বসে ওরা গল্প করছে, আর এখানে যোগেশ্বরী অন্ধকারে একা একা চুপ করে একটা ভয় পাওয়া বেড়ালছানার মতো, নড়ছে না একটুকুও।
ধীর পায়ে ঘরে ঢোকে অবিনাশ। ঢুকে দেখে, মউরা উঠে দাঁড়িয়েছে, ওদের দু'জনেরই মুখ গম্ভীর।
"এবার আমরা যাচ্ছি।"
"আচ্ছা, চলো তোমাদের এগিয়ে দিই।"
"না থাক, আপনাকে আসতে হবে না।"

আর একটা কথাও না বলে ওরা বেরিয়ে যায়।
ঘরে ঢুকে অবিনাশ দেখে খাটের উপর যোগেশ্বরী বসে আছে।
তাকে দেখেই হাসতে হাসতে বলল, "আপনার মউকে দেখলাম। সিঁড়ি দিয়ে যখন উঠছিল, পুরোটা দেখিনি যদিও, বেশ ভালই তো মনে হল। মাথায় অনেক চুল আছে, ফরসা। নিন, এবার তাড়াতাড়ি হ্যাঁ বলে দিন।"
যোগেশ্বরীর হাসিখুশি মুখ দেখে অবিনাশের মনের মেঘটা কেটে গেল।
"মউ আপনার প্রেমে পড়েছে। যেভাবে আপনার দিকে তাকাচ্ছিল!"
"বাজে বোলো না..."
"আচ্ছা, আমি এবার তবে যাই। আপনি বসে বসে মউয়ের কথা ভাবুন।"
"এখুনি যাবে? ডিম পাঁউরুটি ভেজেছিলাম, তোমার জন্য দু'টো রেখেছি।"
"রাত আটটা বেজে গেছে। বাড়ি গিয়ে আজ মায়ের বকুনি খেতে হবে।"
"তাহলে যেও না, আজ থেকে যাও।"
"হ্যাঁ, যেও না, আপনি বিয়ে করবেন, আর আমি শুধু বকুনি খেয়ে মরি।"
"থেকে যাও না...", অবিনাশের গলায় অনুনয়, "তুমি চলে গেলে এখন খুব একা একা লাগবে।"
"আসলে মউ চলে যাওয়ায় আপনার মনটা খারাপ হয়ে গেছে, তাই না?"
অবিনাশ কোনও উত্তর দেয় না।
"তাড়াতাড়ি ওকে এবার বিয়ে করে ঘরে আনুন, তাহলে আর একা একা লাগবে না।"
অবিনাশ যোগেশ্বরীর দিকে তাকায়। যোগেশ্বরীর ঠোঁটে হাসি, কিন্তু চোখে চিকচিক করছে জল। কতদিন আগে একবার, শুধু একবার, যোগেশ্বরী বলেছিল, "আমায় রেখে দিন না।"
হাত ধরে ওকে টেনে পাশে বসায় অবিনাশ।

"না, তোমাকে আজ যেতে দেব না।"
কিছু বলে না যোগেশ্বরী, অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে বসে।
"চলো, একদান দাবা খেলি।"
"না।"
"গান চালাই তাহলে? গান শোনো।"
"না।"
"জানো, মউ বলেছে, দাবা হল বুড়োদের খেলা।"
"সবার তো সব জিনিস পছন্দ হয় না।"
দাবার বোর্ডটা খুলে বসে অবিনাশ। না না করতে করতে যোগেশ্বরীও বসে খেলতে। কিছুক্ষণের মধ্যেই দু'জনে খেলায় ডুবে যায়। এই ছ'মাসেই যোগেশ্বরী চমৎকার শিখে নিয়েছে।



বিছানার একপাশে লাট করা মশারির তলা দিয়ে সসংকোচে উঁকি মারছে নাইটিটা। মোলায়েম দামি সিল্কের শৌখিন নীল নাইটি। গত পুজোয় এটা সে কিনেছিল।

এখন তো মাঝে মাঝে এমন দান দেয়, অবিনাশও বুঝতে পারে না।
খেলতে খেলতেই যোগেশ্বরী বলে, "মউকে তাহলে বিয়ে করছেন তো?"
"হুঁ।"
"হুঁ কেন? একটু ভাল করে বলুন।"
বিছানার উপর পা তুলে বসেছে যোগেশ্বরী। এমনভাবে বসে, যেন ওর নিজের ঘর, নিজের বিছানা, অবশ্য আর কিছুদিন পরেই এসব মউয়ের হবে।
তখন কী করবে যোগেশ্বরী? কী আবার? নতুন কোনও বাড়িতে কাজ ধরবে।
ভাবতে ভাবতেই অবিনাশ যোগেশ্বরীর একটা হাত নিজের হাতে তুলে নেয়।
"আহ, খেলতে দাও না, " মুখ না ঘুরিয়েই বলে যোগেশ্বরী। গালে একটা হাত দিয়ে, ভুরু কুঁচকে দান ভাবছে। খেলার মধ্যে এত ডুবে যায় ও, বেচারি!
ও জানেই না খেলাটা ও হেরে গেছে। যোগেশ্বরীরা হারার জন্যই জন্মায়।

যোগেশ্বরীর হাতে ধীরে ধীরে হাত বুলিয়ে দেয় অবিনাশ। সাবানজল ঘেঁটে ঘেঁটে কেমন খরখরে শক্ত হয়ে গেছে ওর আঙ্গুলগুলো। আর মউয়েরে আঙুলগুলো কী নরম, ফরসা, কেমন মসৃণ...
মউয়ের চোখদু'টো কী উজ্জ্বল!
নাহ, মউকে সে না বলতে পারবে না কিছুতেই!
"নিন, এবার চেক বাঁচান।"
ঘোড়া একঘর সরিয়েছে যোগেশ্বরী। আর তার ফলে ঘোড়া ও গজের ডাবল চেকে পড়ে গেছে অবিনাশের রাজা। চেক বাঁচাবার কোনও উপায় নেই।
"তুমি আবার জিতে গেলে?" অবিনাশের গলায় হতাশার সুর। যোগেশ্বরীর ঠোঁটে মিটিমিটি হাসি।
রাত দশটা বাজে। যোগেশ্বরী খাবার গরম করে দিয়ে। দু'জন খেতে বসে। মাছের বড় মাথাটা কে খাবে, এই নিয়ে একটু ঝগড়া হয়।
"না, না এটা আপনি খাবেন।"
"তুমি খাবে। তুমি মাথা খেতে বেশি ভালবাসো।"
"তাতে কী হয়েছে? এটা আজ আপনি খাবেন।"
"তুমি খেলেই আমার ভাল লাগবে।"
"বেশি বেশি করবেন না তো!"
একটু পরে ভাত খাওয়া শেষ হলে যোগেশ্বরী মাথাটা নিয়ে বসে। একটু একটু করে কাঁটা বেছে চুষে চুষে খায়। অবিনাশ তৃপ্তির চোখে দেখে।
খাবার পর থালাবাসন মেজে বাথরুমে যায় যোগেশ্বরী। অবিনাশ একটা সিগারেট ধরিয়ে বিছানায় এসে বসে। আর তারপরেই জিনিসটা তার চোখে পড়ে।
বিছানার একপাশে লাট করা মশারির তলা দিয়ে সসংকোচে উঁকি মারছে নাইটিটা। মোলায়েম দামি সিল্কের শৌখিন নীল নাইটিটা। গত পুজোয় এটা সে কিনেছিল।
"মিছিমিছি এত খরচ করলেন", বলেছিল যোগেশ্বরী। বলেছিল, আবার বুকে জড়িয়েও ধরেছিল। বলেছিল "বড়লোকের বউরা এমন জিনিস পরে, সিনেমায় দেখেছি।"
যেদিন যেদিন এখানে থেকে যায়, এটা পরেই সে ঘুমোতে আসে। নাইটির ভেতর নরম শরীরটা তখন তার আরও নরম হয়ে যায়, মোম হয়ে গলে যায়, ঢেউ হয়ে ভেঙ্গে পড়ে, নোনা সুখের আবেশে ভরিয়ে দেয় অবিনাশকে, আশ্চর্য!
বিছানাটা গুছিয়েছিল যোগেশ্বরী, তখন এটা সে দেখতে পায়নি? "কী এত ভাবছেন বসে বসে?"
কখন পাশে এসে দাঁড়িয়েছে যোগেশ্বরী। কানে একটা পরিচিত কটু গন্ধ এসে ঠেকে। কানটা আবার পেঁকেছে যোগেশ্বরীর। বেচারা!
হাত ধরে যোগেশ্বরীকে পাশে বসায় অবিনাশ।
নাইটিটা কি দেখতে পেয়েছে মউ? যাওয়ার সময় কথা বলল না। দেখেছে নিশ্চয়ই।

দেখেছে তো?

অলংকরণ: রৌদ্র মিত্র


ইন্ডিয়ার পুরানো অভ্যাস
@indiagatefoods
@indiagatefoods
@indiagatefoods
INDIA GATE
BASMATI RICE
2 YEARS AGED RICE